জেলের দারোগা
জেল আভিভ

কমল চৌধুরী

যামিনী প্রকাশ ভবন
১০৬/১, আমহার্স্ট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

অগ্রজ

শ্রীযুক্ত নির্মলকান্তি মল্লিক চৌধুরী

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

বিষয়-পরিক্রমা

বর্তমান গ্রন্থ দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা অবলম্বনে রচিত। স্থানাভাব বসত নামোল্লেখ করা সম্ভব হল না। সুতরাং গ্রন্থের বক্তব্য বিষয়ের সম্পূর্ণ মৌলিকত্ব লেখক দাবী করেন না।

বইখানি রচনায় বহু শুভানুধ্যায়ী নানাভাবে সাহায্য করেছেন; বিশেষভাবে শ্রীদীপক দে, শ্রীরবীন বসু, শ্রীপরিমল চৌধুরীর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

গ্রন্থের নামাকরণ করেছেন শ্রদ্ধেয় কবি শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র রায়।

দুনিয়াজোড়া সব হারানো ইহুদিদের বাসভূমি নির্দিষ্ট হয়েছিল ইজরায়েলে। মূলত এটা ছিল আরব প্রধান অঞ্চল। তাদের বাস্তু-চ্যুত করে, নির্মম অত্যাচার চালিয়ে ইহুদিদের এনে বসান হল পছন্দ মত জায়গা থেকে। কোটিপতি ইহুদিরা বিরাট বিরাট ভূখণ্ডের মালিক হয়ে বসল ইজরায়েলে। গড়ে উঠল সেই একই সমাজ জীবন—যা ছড়িয়ে আছে দুনিয়ার ছোট বড় পুঁজিবাদী দেশে। যারা এসেছিল অনেক আশা নিয়ে, স্বপ্ন দেখেছিল নিজের জন্য মাটি আর ঘরের, ভূমধ্যসাগরের নীলজলে ঘটল তার সমাধি। মরুভূমির মরীচিকার মত তার সোনালী হাতছানি আজ সর্বস্বান্ত ইহুদিদের জীবনেও যেন বহু দুঃস্বপ্নের রাত।

যারা ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারা এক সময় ছিলেন দুনিয়ার কর্তা। তাদের অস্ত্রের জোরে ছোট বড় সব রাষ্ট্র উঠত বসত। ইজরায়েল প্রতিষ্ঠা করেই মুরুব্বিরা অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাজাল দেশটিকে। দেশটার চরিত্রটাই রূপ পেল সর্বক্ষণের যুদ্ধ-বাজদের মত। আশপাশের আরব রাষ্ট্রগুলিতে নিয়মিত হামলা চালিয়ে তাদের জোত জমি কেড়ে নিতে থাকল। আরবরা বাধা দিতে গিয়ে মার খেল শিশু দানবের হাতে। এই ভাবেই চলছে বিগত পঁচিশ বছর ধরে।

ইহুদি রাষ্ট্র ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার মত ভূখণ্ড পৃথিবীর বহু স্থানেই ছিল। সেখানে না করে, মধ্যপ্রাচ্যে করা হল কেন? পৃথিবীর ব্যবহৃত তেলের একটা বিরাট ভাণ্ডার রয়েছে এই অঞ্চলে। দুনিয়া

জুড়ে তেলের চাহিদা বেড়ে গেছে প্রচণ্ড ।সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য তেলের ওপর নির্ভরশীল। ওদের নিজেদের একটা রাষ্ট্র এখানে চাই, যে আরব দেশগুলির প্রগতির পথে হবে প্রতিবন্ধক এবং সব সময়ের জন্য তাদের বিব্রত করে রাখবে; সমাজতান্ত্রিক চিন্তার কোন রকম অনুপ্রবেশ ঘটতে দেওয়া হবে না। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে আরব দেশগুলিতে শোষণ চালাবে অনন্তকাল। জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি, শোষণ ও নিপীড়নমুক্ত নতুন জীবন গঠনের সংগ্রাম, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে সুগভীর পরিবর্তন সাধনে আরব রাষ্ট্রগুলির প্রয়াসে ইজরায়েলী সামরিক তৎপরতা চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে।

আফ্রিকা ও এশিয়ার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদে প্রলুব্ধ সাম্রাজ্যবাদীরা ইজরায়েলে প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা যার সঙ্গে জনজীবনের নেই সংযোগ; স্বার্থগত বিরোধ, দলাদলি আর নোংরামিতে পঙ্কিল। পৃথিবীতে এমন কোন রাষ্ট্র নেই, যেখানে সামরিক বাহিনীর প্রধানরা পরস্পরের প্রতি এমন কাদা ছোঁড়াছুড়ি করেন। আছে একমাত্র ইজরায়েলে। শ্রেণীভেদ আর বর্ণবৈষম্যে এই নবগঠিত রাষ্ট্রের প্রগতিশীল জনমানস বিক্ষুব্ধ।

বারবার প্রমাণিত হয়েছে, ইতিহাস মানুষের স্বপক্ষে। মানববিদ্বেষী কোন শাসক বা সভ্যতার স্থান হয়নি ইতিহাসে। একদিন তার পতন অনিবার্য। মনুষ্যত্বকে পদদলিত করে, দুনিয়ায় খবরদারীর বাসনা আজও যাদের মধ্যে সক্রিয়, ইতিহাসের সঙ্কেত তারা অস্বীকার করছে।

ইজরায়েল চলেছে সেই একই পথে! ধর্ম কখনও মনুষ্যত্বের মুক্তি দিতে পারে না; তা, সে যে পথেরই অনুসারী হোক না কেন। ধর্মকে হাতিয়ার করে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির কদর্য নোংরামিতে পশ্চিম এশিয়ার সম্প্রতিকালের ইতিহাস উত্তপ্ত। আর ইজরায়েল হল তার অন্যতম ঘাঁটি।

এক ॥ সংকটের জন্ম

ধর্মীয় উপাখ্যানের ভিত্তিতে দাবী করা হয়ে থাকে, প্যালেস্টাইন ছিল ইহুদিদের বাসভূমি। সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়ায় বিভিন্ন দেশে গিয়ে তারা আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। ইহুদিদের অন্যতম পূর্বপুরুষ মোজেশ ইহুদিদের মুক্ত করে জেরিকোতে নিয়ে যান। এই জেরিকো বর্তমান ইজরায়েল রাষ্ট্রের বা প্যালেস্টাইনের ধারে কাছে নয়। খৃষ্টজন্মের অন্তত এক হাজার বছর আগে প্যালেস্টাইনে যে ইহুদিদের বাস ছিল না তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। এই অঞ্চলটি তখন ছিল মিশরের অধীন। এখানকার দুর্ধর্ষ অধিবাসী ফিলিস্টাইনরা ছিল ইহুদি বিদ্বেষী। পুরাণ বা গাথায় উল্লিখিত বিবরণের ভিত্তিতে কোন দাবী স্থাপন গ্রহণযোগ্য হতে পার না। তাহলে ভারত তার ভূমি অধিকারকে পূর্ব ও মধ্য এশিয়ায় অনেকখানি বিস্তৃত করতে পারে।

বারটি ইহুদি উপজাতি তের শতকে প্যালেস্টাইনে মিশরের আনুকূল্যে আধিপত্য করত। ৫৮৭ খৃঃ পূ তারা বিতাড়িত হওয়ার পর পুনরায় এখানে কর্তৃত্ব করলেও ১৩৫খৃঃ তাদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৯১৮ খৃঃ সুদীর্ঘ কয়েক বৎসর পর প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের দাবী পুনঃউত্থাপিত হয়।

পৃথিবীতে ইহুদিদের মোট সংখ্যা হোল এক কোটি ষাট লক্ষ। এর মধ্যে ষাট লক্ষেব বাস আমেরিকায়। রাশিয়ায় বাস করে পঁচিশ লক্ষ। পশ্চিম য়ুরোপে ত্রিশ লক্ষ। পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে আরও বেশ কিছু সংখ্যক বাস করে। ইহুদিরা একজাতি বলে যে দাবী করা

হয়ে থাকে, তাও ভ্রান্ত। কারণ এদের নানান শ্রেণী ও সম্প্রদায় বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়

ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বে আরব ও ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল অটুট। কোন বিদ্বেষ বা সংঘর্ষ ছিল না। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পব বাইরের দেশ থেকে ইহুদিরা প্যালেস্টাইন অঞ্চলে এসে জমায়েত হতে থাকে। আরবদের জমি কিনে নিতে থাকে তাবা। ফলে বিরাট সংখ্যক আরব বস্তুচ্যুত হয়ে পড়ে। অথচ এই আরবই ইহুদিদের সঙ্গে পবম বন্ধুর মত ব্যবহার করে এসেছে এতদিন। এমন কি দূর অতীতে বিতাড়িত ইহুদিদের প্যালেস্টাইনে এনে জায়গা করে দিয়েছিল আরবরাই—তারও ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব পর লয়েড জর্জ বলেছিলেন, 'প্যালেস্টাইনে ইহুদি বাসভূমি হল সুয়েজ খাল সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা।' তাই আরব নৃপতি ও জনসাধারণকে অসন্তুষ্ট করে, ইজরায়েল রাষ্ট্র সৃষ্টির পিছনে ছিল নবজাগ্রত আরব জাতীয়তাবোধকে প্রতিবোধ এবং এই অঞ্চলে পশ্চিম বাষ্ট্রেব স্বার্থ সংবক্ষণ। আমেরিকার ইহুদি সম্প্রদায় ইজ-রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানিয়েছিল বিপুলভাবে। তবে আরব অঞ্চলে ইহুদিবা এ ব্যাপাবে বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করেনি।

কিন্তু দ্বিতায় বিশ্বযুদ্ধেব পর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটে। ইহুদিদের ওপব হিটলারের অমানুষিক অত্যাচার বিশ্বব্যাপী সঞ্চার করে সমবেদনাব। তখন বৃটেন বা আমেরিকার বিত্তশালী ইহুদিরা নিজে-দের দেশে নির্যাতিত ইহুদিদের জায়গা দিতে পারল না। অথচ নির্যাতিতদের প্রতি করুণায় তারা তখন উচ্ছ্বলিত। তাই অত্যাচারিত ইহুদিদেব জন্য জায়গা নির্দিষ্ট হোল প্যালেস্টাইনে। আরবভূমিতে ইহুদিদের বসতি না দিয়ে বৃটেন বা আমেরিকায় সহজেই স্থান দেওয়া যেত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের সংখ্যা ভয়ংকর ভাবে বেড়ে যেতে থাকে। তাদের স্থান করে দিতে হোল আরবদের। ইহুদিদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে আরবরা নিজেদের অবস্থা

বুঝতে পারল। তারা বুঝতে পারল আমেরিকা ও বৃটেনের ইহুদি সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্যে তাদের জমি নেওয়া হচ্ছে। ক্রমশঃ তাদের মধ্যে ইহুদি বিদ্বেষ দানা বাঁধতে থাকে। তা একসময় সম্প্রদায়িকতার রূপ নেয় এবং বীভৎস দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

তাই দশ বার লক্ষ আরবকে উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আজ তারা জীবনযাপন করছে অসহায়ভাবে। আরবদের তাড়ান হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে চরম অত্যাচার ও নৃশংসতার পথে। বহু সংখ্যক আরবকে হত্যা করা হয়েছে, সম্পত্তি লুঠ করা হয়েছে। ভয়ে পালিয়ে গেছে আরবরা। ইজরায়েলে আরবদের এক-তৃতীয়াংশ ভূমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এইভাবে। আরবদের মূল্যবান সম্পত্তি ব্যবসা-বাণিজ্য বিনা ক্ষতি পূরণে দখল করে নেওয়া হয়েছে।

আরব উদ্বাস্তুদের শতকরা আশীজনই নিরক্ষর-কৃষক, শ্রমিক শ্রেণীর লোক, বাকি অংশ হোল ব্যবসায়ী, কারিগর এবং স্বল্প শিক্ষিত কর্মী। এরা আশ্রয় নিয়েছিল গাজা অঞ্চল, জর্ডান, সিরিয়া,লেবাননে। মিশর, সৌদি আরব, ইরাক ও পারস্যে চলে যায় কেউ কেউ। শিক্ষিত এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেরা বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করলেও শতকরা আশিভাগই ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দেয় নিজেদের জীবন। ১৯৫৪ খৃঃ একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে গাজা এলাকায় ২ লক্ষ ৭৯ হাজার, জর্ডানে ৬ লক্ষ ৫৪ হাজার, লেবাননে ১ লক্ষ ২৬ হাজার উদ্বাস্তু স্থান করে নেয়। কিন্তু এই সমস্ত রাষ্ট্রে অনুর্বর জমির পরিমাণই বেশী। ফলে উদ্বাস্তুদের একমাত্র রাষ্ট্রসংঘের সাপ্তাহিক রেশনের ওপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে হচ্ছে।

প্যালেস্টাইনের বাস্তুচ্যুত আরবদের শোচনীয় দূরাবস্থার জন্য ইজরায়েলই মূলত দায়ী—একথা কোন আরব রাষ্ট্রই ভুলতে পারে না। সাতষট্টির যুদ্ধের আগে প্যালেস্টাইনের বাস্তুচ্যুত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল দশ লক্ষাধিক। এদের বেশীর ভাগই অল্প বয়স্ক। যুদ্ধের পর জর্ডান

নদীর পশ্চিম তীর থেকে অন্তত দুই লক্ষ আরবকে নানাভাবে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী অশান্তির মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে উদ্বাস্তু সমস্যা। এই উদ্বাস্তুদের মধ্য থেকে যে প্যালেস্টাইন মুক্তি বাহিনী গঠিত হয়েছে উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী ইজরায়েল রাষ্ট্রের ধ্বংস না করা পর্যন্ত তাদের সংগ্রামের বিরাম নেই। আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী আছে তাদের পিছনে। আজ তারা বিপর্যস্ত বিতাড়িত হলেও আগুন যেন আরো জ্বলবার মুখে। ইজরায়েলী ঔদ্ধত্য আগ্নেয়-গিরির আগুন নিয়ে যে খেলায় মেতেছে তার ভয়ঙ্কর পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তার করছে এক অশুভ ভবিষ্যৎ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১৯১৪ খৃঃ। শেষ হয় ১৯১৮ খৃঃ। আরব ভূখণ্ড তখন ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক ছিল জার্মানীর পক্ষে। এই সুযোগে অসন্তুষ্ট আরবদের স্বার্থ সিদ্ধির কাজে লাগায় ইংরেজ। হেজাজের গভর্ণর শরিফ হোসেন তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

তুরস্কবাহিনীর আক্রমণ শক্তি তখন ভেঙ্গে পড়বার মুখে। ১৯১৭ খৃঃ প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ বাহিনীর ভার নিলেন অ্যালেন বি। ব্রিটিশ বাহিনী ছিল আরবদের তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী। ১৬ নভেম্বর জাফা এবং ৯ ডিসেম্বর জেরুজালেমের পতন ঘটে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে। কিন্তু প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্নটি জরুরী হয়ে দেখা দেয়। ১৯১৫ খৃ; ম্যাকমোহন হোসেন চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ প্যালেস্টাইনকে আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দেয়! আবার ১৯১৬ খৃঃ রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি অনুসারে প্যালেস্টাইনকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু প্যালেস্টাইন দখলের পর, আগেকার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে, দেশটিকে নিজেদের দখলে রাখার চেষ্টা করে।

পূর্ব প্রতিশ্রুতিকে ভাঙবার উদ্দেশ্যে ব্রিটেন, আন্তর্জাতিক জিওনিস্ট আন্দোলনের সুযোগ নেয়। উনিশ শতকের শেষে এই

আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে। একদল রুশ ইহুদি ১৮৮২খৃঃ জাফার কাছে ইহুদি কৃষি কলোনি প্রতিষ্ঠা করে। বিভিন্ন জিওনিস্ট সংস্থা প্রেরিত শরণার্থীদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১৯০৮ খৃঃ জাফায় একটি ইহুদি এজেন্সীর কর্মকেন্দ্র খোলা হয়। রথস্চাইল্ড ও বিবিধ ইহুদি-ফাণ্ড থেকে নিয়মিত অর্থ আসতে থাকে। তুরস্ক সরকারেব নিরপেক্ষ নীতির জন্য ইহুদি উপনিবেশ নিরাপদে গড়ে ওঠে। যুদ্ধের আগে এইসব উপনিবেশের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যুদ্ধ শেষে প্যালেস্টাইনে তের হাজার জনসংখ্যা সমন্বিত মাত্র তেতাল্লিশটি ইহুদি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৮২ খৃঃ থেকে ১৯৪৪ খৃঃ মধ্যে প্রায় পয়তাল্লিশ হাজার শরণার্থী আসে। সমগ্র প্যালেস্টাইনে ১৯৪৪ খৃঃ খুব বেশী হলেও নববই হাজারের মত ইহুদি ছিল।

বিশ্ব ইহুদি সংস্থা ১৮৯৮ খৃঃ জিওনিস্ট আন্দোলনের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার জন্য সংস্থা কয়েকটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেব আগে জিওনিস্টরা কাইজারের জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলে। উদ্দেশ্য, তাব সহায়তায় প্যালেস্টাইনে ইহুদি উপ-নিবেশ স্থাপন। ডঃ ওয়াইজমানের নেতৃত্বে একদল ইহুদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আঁতাত গড়ে তোলে।

ব্রিটিশ সরকার প্রথমে ১৯১৭ খৃঃ প্যালেস্টাইন দখলের পরিকল্পনা কালে ইহুদিদের দাবী স্বীকার করে। এবং প্যালেস্টাইনকে আরব রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন কবার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯১৭ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে সাইকস্ জিওনিষ্ট নেতাদের সংগে যোগাযোগ স্থাপন কবেন। উভয় পক্ষে আলোচনা সুরু হয়ে যায়। ১৯১৭ খৃঃ ২ নভেম্বর ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন সম্পর্কে তার নীতি ঘোষণা করে। ব্রিটিশ বিদেশ সেক্রেটারী লর্ড বালফুর অ্যাঙলো-জিউস্ ব্যাঙ্কার রথস্চাইল্ডকে লিখলেন: "ব্রিটিশ সরকার প্যালে-স্টাইনে ইহুদি জনগণের বাসভূমি গড়ে তোলাকে সমর্থন করে।

এই লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তার পক্ষে যতদূর যা করা সম্ভব তা করবে। এটা অবশ্যই বুঝতে হবে, প্যালেস্টাইনের স্থায়ী ইহুদি অধিবাসীদের নাগরিক ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ঘটবে না, অথবা অন্যদেশে ইহুদিরা যে অধিকার বা রাজনৈতিক মর্যাদা ভোগ করছেন তা ক্ষুণ্ণ হবে না।" কিন্তু ১৯১৬ খৃঃ মিশরে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যর হেনরী ম্যাকমোহন মক্কায় শরীফ আমীর হোসেনের কাছে প্রতিশ্রুতি দেন, তুরস্কের বিরুদ্ধে ইংরেজদের সাহায্য করার বিনিময়ে আরব রাষ্ট্রগুলিকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ম্যাকমোহনের প্রতিশ্রুতি উড়িয়ে দেন বালফুর।

বালফুর ঘোষণাকে মার্কিন সরকার সমর্থন জানান। ব্রিটিশ ইহুদি আলোচনা সুফলপ্রসূ হাওয়ার পিছনে মার্কিন প্রয়াস ছিল আন্তরিক। ১৯১৮ খৃঃ ফরাসী ও ইতালি সরকার বালফুর ঘোষণাকে স্বাগত জানায়।

ব্রিটেনের এই বিশ্বাসঘাতক আচরণে আরব রাষ্ট্রগুলি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। আরব রাষ্ট্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ বিরোধী মনোভার প্রবল রূপ নিতে থাকে। এ সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯১৭ খৃঃ নভেম্বর, ওটোমান সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করবার ষড়যন্ত্রমূলক গোপন চুক্তি ও সাইকস্-পিকট্ চুক্তি প্রকাশ করে দেয়। ডিসেম্বরের তিন তারিখ সোভিয়েত সরকার "রাশিয়া ও পূর্বাঞ্চলের সমগ্র মুসলিম জনগণের প্রতি আবেদনে," পূর্বাঞ্চলের মুসলমান ঐতিহ্য ও আরব ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার আহ্বান জানায়।

বিব্রত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে অক্স্ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব বিষয়ের অধ্যাপক হোগার্থ জিদ্দায় এসে হোসেনের সঙ্গে মিলিত হন ব্রিটিশ নীতির ব্যাখ্যা করতে। হোগার্থ রাজা হোসেনকে ইহুদিদের সঙ্গে সহযোগিতার অনুরোধ জানিয়ে বলেন যে,

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ স্থানীয় জনগণের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে ইহুদি শরনার্থীদের এনে বসাবে না।

সিরিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা ১৯১৮ খৃঃ কায়রোতে সম্মিলিত হয়ে আরব রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সুস্পষ্ট ঘোষণার দাবী জানান। বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার পূর্ব আরব রাষ্ট্রগুলি সম্পর্কে নীতি ঘোষণা করে ১৯১৮ খৃঃ ১৬ জুন। আরব ভূখণ্ডকে তারা তিনটি ভাগ করে: ১)-আরবদের দ্বারা মুক্ত অঞ্চল, ২) ব্রিটিশ বাহিনীর দ্বারা মুক্ত আরব অঞ্চল (দক্ষিণ প্যালেস্টাইন এবং ইরাক) এবং ৩) তুরস্কের অধিকৃত অঞ্চল (সিরিয়া লেবানন এবং উত্তর ইরাক)। ব্রিটিশ সরকার প্রথম পর্যায়ের অঞ্চলের স্বাধীনতাকে মেনে নেবে, দ্বিতীয় পর্যায়ের অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছানুসারে এই অঞ্চলের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে এবং তৃতীয় পর্যায়ের অঞ্চলকে মুক্ত করার প্রয়াস চালাবে। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ সরকার তার অধিকৃত আরব ভূখণ্ডের ঐক্য ও স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পালন করবে না।

মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সম্পদ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে ছিল গভীর তাৎপর্যময় এবং প্যালেস্টাইনকে একটি উপনিবেশ হিসাবে টিকিয়ে রাখার ষড়যন্ত্রের অর্থ এখানেই নিহীত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভের আগে পর্যন্ত ব্রিটেন ছিল এই অঞ্চলের প্রধান উপনিবেশিক শক্তি। তাছাড়া আরব জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমনের কেন্দ্র হিসাবে প্যালেস্টাইনকে ব্যবহার করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দেখতে পায়। তার চোখও এসে পড়েছে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলসম্পদের ওপর। নিজের স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনকে প্যালেস্টাইনে 'ইহুদিদের জাতীয় ভূমি' গঠনে সমর্থন জানাতে থাকে। তাদের ইচ্ছা ব্রিটিশ শক্তি সরে গেলে, শূন্যস্থান পূরণ করবে প্যালেস্টাইনের উগ্র-ইহুদি নেতারা। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ব্রিটিশ মার্কিন দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। ব্রিটিশ সরকারও আপ্রাণ চেষ্টা চালায় প্যালেস্টাইনকে নিজে-

দের অধিকারে রাখবার। বালফুর ঘোষণার পর থেকে ১৯২৪ খৃঃ পর্যন্ত দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘর্ষে মার্কিন প্রভুত্ব প্রবল হয়ে উঠেছিল এবং ব্রিটিশ আধিপত্যের দুর্বলতম অবস্থান স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়।

প্যালেস্টাইনে ব্রিটশ শাসন কালে 'বিভেদ ও শাসন' নীতি অনুসরণ করে আরবদের বিরুদ্ধে ইহুদিদের এবং ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদের প্ররোচিত করা হয়েছে বারবার। স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার দেওয়া হতে থাকে। জিওনিস্ট বুর্জোয়া এবং আরব সামন্ততন্ত্র ও বুর্জোয়া সমাজকে শক্তিশালী করে আরবদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আঘাত সৃষ্টি করা হতে থাকে।

ইহুদি শরণার্থী আগমনের সীমা বছরে ষোল হাজার ছয়শত নির্ধারণ করে ব্রিটিশ সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে ১৯২০ খৃঃ সেপ্টেম্বরে। সঙ্গে সঙ্গে আরব ইহুদি সাম্প্রদায়িক সংঘাত শুরু হয়। সংঘর্ষ ব্যাপক হতে থাকে; ১৯২১ খৃঃ মে মাসে চরম আকার নেয়। একমাত্র জাফায় পাঁচশরও বেশী আবব ও ইহুদি নিহত হয়। সামরিক আইন জারী করে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। প্যালেস্টাইনের অধিকার নিয়ে ব্রিটিশ সরকার আরব জাতীয়তাবাদীদের সংগে দরকষাকষি সুরু করে। একমাত্র লক্ষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অনুপ্রবেশে যে কোন প্রকারে বাধা সৃষ্টি করা।

১৯১৮ খৃঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অফ নেশনস ব্রিটিশ সরকারকে দায়িত্ব দিয়েছিল প্যালেস্টাইন সম্পর্কে স্থায়ী ব্যবস্থার জন্য। কিন্তু ইংরেজরা আগেই ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র হবে। ফলে প্যালেস্টাইনে আসতে থাকে ইহুদিরা। প্রতিবাদে আরবরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই অসন্তোষ চলে দশ বৎসর। ১৯৩০ খৃঃ সিম্পসন এবং পামফিল্ড তদন্ত কমিশন রিপোর্ট দিল প্যালেস্টাইনে ইহুদি প্রবেশ বন্ধ কর; সেখানে আরব সংখ্যাধিক্যে গঠিত হবে আইন পরিষদ এবং তারাই প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ

করবে। ইহুদিরা ক্ষেপে উঠবে সেই আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার এই রিপোর্ট গোপন করে যায়।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্ররোচনায় ১৯২৮ খৃঃ সেপ্টেম্বরে আরব ইহুদি সংঘর্ষ সুরু হয়ে যায়। ১৯২৯ খৃঃ আগস্টে হাইফা, জাফা এবং জেরুজালেমে সংঘর্ষ বীভৎসরূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। তদন্ত কমিশন বসিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের অ-ইহুদি অধিবাসিদের ভূমি-অধিকার স্বীকার করে, ইহুদি শরণার্থী আগমনের ওপর কড়াকড়ি করা এবং ভূমি ক্রয়ে বিধিনিষেধ আরোপ করে। ইতিমধ্যে প্যালে-স্টাইনে ব্রিটিশ পদাতিক ও নৌবাহিনী ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়।

ব্রিটিশ প্ররোচনায় ১৯৩৩ খৃঃ অক্টোবরে আর একটি বড় আকারের আরব ইহুদি সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু ততদিনে আরবরা এই সংঘর্ষ সৃষ্টির কারণ উপলব্ধি করেছে। ইহুদি বিদ্বেষ থেকে, তাদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ১৯৩৬ খৃঃ এপ্রিল-মে মাসে আরব জাতীয় মুক্তিআন্দোলনকারীদের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নির্মম নির্যাতন চালিয়ে বহু নরনারীকে হত্যা করে। দশ হাজার ব্রিটিশ সৈন্য বাড়িয়ে করা হয় তিরিশ হাজার।

ব্রিটিশ সরকার ডবলু আর পিলের নেতৃত্বে এই অশান্তির কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের জন্য একটি কমিশন পাঠায়। কমিশন প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করার সুপারিশ করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, বেথেলহেম ও জেরুজালেম ঘিরে নিরপেক্ষ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং অন্য অঞ্চলকে ট্রান্সজর্ডানে সম্মিলিত করার সুপাবিশ করে। কিন্তু এও ছিল আরব ইহুদি সংঘাত জীইয়ে রেখে নিজেদের অধিকার অক্ষুন্ন রাখার আর এক কৌশল।

অবশেষে ১৯৩৯ খৃঃ ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার প্যালেস্টাইন নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে লণ্ডনে একটি সম্মেলন আহ্বান করে। ঐ সম্মেলনে উপস্থিত ছিল প্যালেস্টাইন আরব, মিশর, ইরাক

সৌদিআরব, ইয়েমেন, ট্রান্সজর্ডান এবং ইহুদি এজেন্সির প্রতিনিধিরা। ইহুদি প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিল প্যালেস্টাইনের ইহুদিরা এবং বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের, বিশেষ করে আমেরিকার ইহুদিরা। ওয়াইজমানের নেতৃত্ব ইহুদি প্রতিনিধিরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। আরব প্রতিনিধিরা তাদের ঐতিহাসিক অধিকারের দাবী তুলে, প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা দাবী করে। কিন্তু লণ্ডনের এই সম্মেলনে সমস্যা সমাধানের কোন সূত্র পাওয়া যায়নি। সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলবার জন্য ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে, "আরব জনগনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্যালেস্টাইনকে একটি ইহুদি রাষ্ট্র রূপান্তরের" ইচ্ছা তাদের নেই। আরবদের সম্মতিতেই কেবলমাত্র ইহুদিদের নিজস্ব ভূমি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এইসঙ্গে আবার প্যালেস্টা-ইনকে আরব রাষ্ট্রে পরিণত করার বাসনাও ছিল না ব্রিটেনের।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাকালে আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেশ প্রবল হয়ে উঠছিল। সে কারণে ব্রিটিশ সরকার 'আরব ঘেঁষা' নীতি অনুসরণ করতে থাকে। কিন্তু ততদিনে প্যালেস্টাইন দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে : ইসহুব (ইহুদি প্রধান) ও আরব প্রধান অঞ্চল।

ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্যালেস্টাইন ইসহুবে জনপ্রতিনিধি-দের নিয়ে একটি প্রতিনিধি সভা এবং একটি জেনারেল কাউনসিল গঠিত হয়। অবশ্য এটি গঠিত হয়েছিল প্যালেস্টাইন ইহুদি বুর্জো-য়াদের উদ্যোগে ব্রিটিশকর্তৃপক্ষকে পরামর্শ ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে। বিশ্ব জিওনিস্ট সংস্থা একটি ইহুদি জাতীয় ভাণ্ডার গঠন করে আরবদের ভূখণ্ড ক্রয়ের জন্য। প্যালেস্টাইন ফাউণ্ডেশন ফাণ্ড গঠিত হয় কৃষিব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য। জিওনিস্ট এজেন্সী প্যালেস্টাইনের ইহুদিনেতা এবং মার্কিন ইহুদি বুর্জোয়াদের মধ্যে সংযোগ রেখে চল-ছিল। মার্কিন ইহুদি বুর্জোয়ারা প্রচুর পরিমাণ অর্থ পাঠাতে থাকে প্যালেস্টাইনে। তাছাড়া আসতে থাকে "বিশেষ দান":

যা প্যালেস্টাইনে ব্যক্তিগত মার্কিন পুঁজি অনুপ্রবেশের সূচনা করে। মার্কিন কোটিপতি ও প্যালেস্টাইন ইহুদি কর্তৃপক্ষের মিত্রতাই ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং দেশটিকে নিয়ে যায় পরিণতিতে সম্পূর্ণ মার্কিন নিয়ন্ত্রণে।

প্যালেস্টাইন ইসহুবে কয়েকটি সুগঠিত রাজনৈতিক দলও ছিল। এর মধ্যে বৃহত্তম দল হল দক্ষিণপন্থীসংস্করবাদী মাপাই পার্টি। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্যালেস্টাইন ইহুদিদের নেতা ডেভিড বেন গুরিয়ন। এই বুর্জোয়া দলটি প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। আর এদের গভীর যোগাযোগ ছিল মার্কিন পুঁজি-পতিদের সঙ্গে।

বৃহৎ ও মাঝারি বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক দল জেনারেল জিওনিস্ট পার্টি। মাপাই এর মৌলিক দাবীগুলির সঙ্গে এদের কোন পার্থক্যই ছিল না। পরে ওয়াল ষ্ট্রীটের সঙ্গে এদের মিত্রতা গভীর হয়। বিশ্ব জিওনিস্ট সংস্থার চেয়ারম্যান এবং ইহুদি এজেন্সীর কর্তা ওয়াইজমান ছিলেন এই পার্টির নেতা। সংশোধনবাদী আগ্রাসী পার্টি হেরুটের দাবী ছিল সমগ্র প্যালেস্টাইন এবং ট্রান্সজর্ডান জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হবে ইহুদি রাষ্ট্র। মাপাই এর পর বৃহত্তম দল আধা বুর্জোয়া মাপাম ছিল আরব ইহুদি দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে। এরা ছিল সংশোধনবাদীদের আক্রমণকারী ও বিরোধীদল। তাছাড়া ছিল কয়েকটি বুর্জোয়া ইহুদি পার্টি।

আরব ও ইহুদি শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র স্বার্থরক্ষক রাজনৈতিক সংগঠন ছিল কমিউনিস্ট পার্টি অফ্ প্যালেস্টাইন। ১৯১৯ খৃঃ এই পার্টি প্রতিষ্ঠিত হলেও, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞার জন্য গোপনে রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে এবং ইহুদি বুর্জোয়াদের ক্ষমতা দখল সময়ে ইহুদি রাজনৈতিক সংগঠন ও পার্টি-গুলির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেস্টাইন ইসহুবের ক্রমবৃদ্ধির

পরিচয় দেওয়া হল :—১৯২২ খৃঃ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ মধ্যে ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৮৩,৭০০-থেকে—৫৫৪,০০ অর্থাৎ ৬'৬। ১৯০১খৃঃ প্যালেস্টাইনে জিওনিস্ট ফাউণ্ডেশনের জমির পরিমাণ ছিল ২২৫'০০০ ডুয়াম (১ডুয়াম=০'১ হেক্টর।) সেই জমি ১৯৪৫ খৃঃ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৮০০,০০১ ডুয়াম। পঞ্চাশ বছরে ইহুদি বুর্জোয়াদের জমির পরিমাণ বেড়ে যায় আটগুণ। অছি শাসনের শেষে কুড়ি বছরে বৃদ্ধির পরিমাণ ১'৮। ইহুদিদের কেনা জমির বেশীর ভাগই হল উর্বর-অঞ্চল সমুদ্র উপকূল বরাবর, এসড্রাএলন ও জর্ডান উপত্যকায়। প্যালেস্টাইনে বহু ইহুদি জমি সংগ্রহ করে দ্রুত বেশী লাভের জন্য। উপনিবেশে নবাগত ইহুদিদের প্রয়োজন মেটান তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাছাড়া এমন বহু ইহুদি জমি কেনে, যারা সব সময়ই বিদেশে বাস করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ইহুদি কোটিপতি ব্যারন রথস্চাইল্ডের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কেনা জমির এক তৃতীয়াংশের মালিক তিনি। কিন্তু প্যারিসে বাস করাই তিনি পছন্দ করেন বেশী।

জিওনিস্ট ফাউণ্ডেশন এবং সংস্থাগুলি থেকে দান ও উপহার হিসাবে ১৯১৭ খৃঃ থেকে ১৯৪৫ খৃঃ মধ্যে আসে চার কোটি কুড়ি লক্ষ প্যালেস্টাইন পাউণ্ড। এসব অর্থ ব্যয় হয় আরবদের কাছ থেকে জমি কেনার জন্য। পিতৃভূমিকে জিওনিস্ট সংস্থার কাছে হস্তান্তরের বিরুদ্ধে আরবরা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরাধীনতা এবং বারবার আগ্রাসী অভিযানের শিকার হয়ে তাদের পক্ষে ইহুদি পুঁজিপতিদের এই আক্রমণ প্রতিহত করা ছিল সম্পূর্ণ অসম্ভব। ব্রিটিশ অছি শাসনে ইহুদি বুর্জোয়াদের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আরবরা সংঘবদ্ধ হতে থাকে। কিন্তু আরব সামন্ততন্ত্র ও অভিজাত সমাজের ঐতিহ্যময় পশ্চাদমুখীন নীতি ও নৃশংস আচরণের মধ্যে আরবদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠতে পারে নি। তাছাড়া এই বিশেষ সুবিধা-ভোগী শ্রেণীকে ব্রিটিশ বারবার নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

সে কারণে এই অঞ্চলে কখনই আরবদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি। প্যালেস্টাইনের আরবরা ছিল সুপ্রিম মোসলেম কাউন্সিলের অধীন। এই কাউন্সিলের সদস্যরা ১৯২৬ খৃঃ থেকে ব্রিটিশ হাইকমিশনের দ্বারা মনোনীত হতেন। ফলে সদস্যরাও ব্রিটিশের স্বার্থ দেখেই চলতেন। একটি অভ্যুত্থান ঘটাবার চেষ্টায় লিপ্ত এই অজুহাতে ১৯৩৭ খৃঃ কাউন্সিলকে ভেঙে দেওয়া হয়।

প্যালেস্টাইনে ১৯৩৫ খৃঃ আরবদের এইসব রাজনৈতিক দল ছিল প্যালেস্টাইন আরব পার্টি, ন্যাশনাল ডিফেন্স পার্টি, রিফর্ম পার্টি, ন্যাশনাল ব্লক, কংগ্রেস এক্সিকিউটিভ অফ দি ন্যাশনালিস্ট ইয়ুথ এবং ইস্‌তিক্‌লাল (স্বাধীনতা) পার্টি। এদের প্রত্যেকেরই ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচী। কিন্তু এরা যে ভাবেই হোক প্যালেস্টাইন ও পূর্ব আরব অঞ্চলে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যুক্ত ছিল। আরবরা ব্রিটিশ অছি শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা দাবী করে। তারা দেশের মধ্যে ইহুদিদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, ইহুদি শরণার্থীদের আগমন এবং গরীব আরবদের কাছ থেকে ইহুদিদের জমি দখল প্রচেষ্টার প্রবল বিরোধিতা করে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদিদের নিজেদের বাসভূমি গড়ে দিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সেখানে নিজেদের ক্ষমতা করায়ত্ব রাখবার চেষ্টা চালিয়েও ১৯৩০ খৃঃ শেষে আরবদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপকতায় শঙ্কিত হয়ে ওঠে! তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরবদের সাহায্যও তাদের ছিল নিতান্তই দরকার। ইহুদি নেতারা বুঝলেন, আরবদের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে যাওয়ার এই হল উপযুক্ত মুহূর্ত। আরবদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল জিওনিস্ট নীতি অনুসরণ করা হতে থাকে চরম নৃশংসতা ও বর্বরতার পথে। ১৯৪২ খৃঃ কয়েকটি সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে তোলা হয় এই উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর, ইহুদি এজেন্সির কার্যকরী

কমিটি একটি ইহুদি সেনা বাহিনী গঠন করে জাতীয় নাম ও পতাকার নীচে ব্রিটিশ বাহিনীর অধীনে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে—এই স্বীকৃতি আদায়ের জন্য অছি শাসকের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ইহুদি বুর্জোয়ারা এইভাবে একটি সেনাবাহিনী গঠন করে আরবদের বিরুদ্ধে উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ইহুদি ব্রিগেড সৃষ্টির অনুমতি দিলেও, আরবদের ক্রোধের আশংকায় তাদের বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অনুমতি দেয় নি।

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ করে প্যালেস্টাইন ব্যাপারে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত ব্রিটিশ ও আমেরিকার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম প্রতি-দ্বন্দ্বিতা চলছিল। ১৯২৪ খৃঃ যদিও উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, কিন্তু আমেরিকা এই তৈল সমুদ্রে নিজেকে শক্তিশালী করবার পথটি খুবই সতর্কতার সঙ্গে অনুসরণ করতে থাকে। সে উদ্দেশ্যে ১৯৪২ খৃঃ বাহেরিণের তৈল নিষ্কাষণ ও ব্যবসাক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। ১৯৩৩ খৃঃ সৌদি আরবের তৈল ব্যবসায়ে (১৯৪৯ খৃঃ পর্যন্ত) আমেরিকার একচেটিয়া অধিকার মেলে। সুবৃহৎ আরাবিয়ান-আমেরিকান অয়েল কোম্পানি ১৯৩৯ খৃঃ থেকে সৌদি আরবে কাজ শুরু করে। এ থেকে বোঝা যায় আমেরিকা কেন আরব রাষ্ট্রগুলিকে শত্রুতে পরিণত করেনি। বরং ব্রিটেনের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহুদি বুর্জোয়াদের পথ অবলম্বন করে মধ্য-প্রাচ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য নষ্ট করার উদ্দেশ্যে। ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃষ্টির জন্য আমেরিকার ইহুদি সংগঠনগুলিকে ব্যবহার করা হতে থাকে। ব্রিটেনের ষড়যন্ত্রে ১৯২৯ খৃঃ অনুষ্ঠিত আরব-ইহুদি হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আমেরিকা নীরব থাকলেও মার্কিন নাগরিকদের রক্ষার জন্য প্যালেস্টাইনের কাছাকাছি আমেরিকার ক্রুজার পাঠা-বার কথা ঘোষণা করে। আমেরিকার ইহুদি সংস্থাগুলি, প্যালে-স্টাইনে ইহুদি শরণার্থী সম্পর্কে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। ১৯৩৬-৩৭ খৃঃ প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির

সময়ে সাতটি আমেরিকান ইহুদি সংস্থা প্যালেস্টাইনে পীল কমিশন পাঠায় সেখানকার মার্কিন স্বার্থ সম্পর্কে অবহিত করতে। ঠিক সেই সময়, তৎকালীন ব্রিটিশ বিদেশ সেক্রেটারী অ্যান্টনি ইডেনকে মার্কিন দূত রবার্ট ডব্লু বিংহাম মার্কিন স্বার্থের দিকটি সম্পর্কে জানান। তার একটি চিঠিতে প্যালেস্টাইনে মার্কিন স্বার্থ রক্ষায় প্যালেস্টাইন সনদের যে কোন ধরণের সংশোধন বিষয়ে উল্লেখ ছিল। তা সত্ত্বেও আমেরিকার আচরণে একটা বাহ্যিক "নিরপেক্ষতার" ভাব তখনও পর্যন্ত ছিল। এই ভাবটা বজায় ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েও।

বালফুর ঘোষণাকে অমান্য করে, ১৯৪২ খৃঃ মে মাসে আমেরিকার ইহুদি সংস্থাগুলি বালটিমোর প্রোগ্রামে ঘোষণা করেঃ প্যালেস্টাইনে অনিয়ন্ত্রিত ইহুদি পুনর্বাসন, প্যালেস্টাইনকে ইহুদি রাষ্ট্র ঘোষণা এবং একটি ইহুদি সেনাবাহিনী গঠন। ১৯৪৩ খৃঃ মার্কিন সরকারী কর্তাদের ভাষণে স্পষ্টভাবেই প্যালেস্টাইনে মার্কিন স্বার্থ সম্পর্কে উল্লেখ করা হতে থাকে। তাছাড়া ইহুদিদের সমর্থনে ব্যাপকভাবে জনমত গড়ে তোলা হতে থাকে। পত্র পত্রিকায় লেখা ও গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ক্ষতদগ্ধ চেহারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উপনিবেশিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের তখন অস্তায়মান অবস্থা। আমেরিকা বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের কৌশলী নীতি গ্রহণ করে। প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের দাবী সম্পর্কে প্রকাশ্যে সমর্থন জানাতে থাকে এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। ১৯৪৫ খৃঃ আগস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুমান ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলিকে চিঠিতে লেখেন, অবিলম্বে যেন এক লক্ষ ইহুদি শরণার্থী প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটেন "প্যালেস্টাইনে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির" জন্য এই প্রস্তাব বাতিল করে দেয়। তাসত্ত্বেও প্যালেস্টাইনে একটি অ্যাংলো-আমেরিকান কমিটি গঠনের জন্য আমেরিকার সঙ্গে আলোচনা শুরু করে।

১৯৪৫ খৃঃ নভেম্বরে গঠিত হয় কমিটি ; য়ুরোপে ইহুদি সমস্যা এবং অ-য়ুরোপীয় রাষ্ট্র থেকে ইহুদি শরণার্থী সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায়। ঘোরা পথে রাষ্ট্রসংঘকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশ ও আমেরিকা প্যালেস্টাইন সমস্যাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে। কমিটির ওপর নির্দেশ ছিল সোভিয়েত আক্রমণকে গুরুত্ব দিয়ে যেন মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক সমাধান হয়। এইভাবে প্যালেস্টাইন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আমেরিকা ও ব্রিটিশ তার সম্প্রসারণমূলক কার্যাবলী আড়ালের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের উভয়ের মত পার্থক্য প্রবল হয়ে উঠলেও, সোভিয়েত বিরোধিতার প্লাটফর্মে তারা একসূত্রে বাধা পড়ে

অ্যাঙলো—আমেরিকান কমিটি ১৯৪৬ খৃঃ এপ্রিলে প্রকাশিত রিপোর্টে প্যালেস্টাইনে একলক্ষ ইহুদি-শরণার্থী প্রবেশের অনুমতি দেয় এবং সেখানে ইহুদিদের জমি ক্রয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়ার তদ্বির করে। রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত অপেক্ষা করার আকাঙ্খা ছিল ব্রিটেনের। কিন্তু মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ ১৯৪৬ খৃঃ মে মাসে আরব রাষ্ট্রগুলি ও ইহুদি সংস্থাসমূহে স্মারকলিপি ও কমিটি রিপোর্টের অনুলিপি পাঠিয়ে দেয়। এইভাবে আমেরিকা প্যালেস্টাইন সমস্যার ওপর স্বীয় ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টা সুরু করে। ১৯৪৬ খৃঃ জুনে আর একটি অ্যাঙলো আমেরিকান কমিটি গঠিত হয়। প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদি দুটি স্বতন্ত্র অঞ্চলে বিভক্ত করানোর প্রস্তাব দেয় আমেরিকা। ব্রিটেন চেয়েছিল চারটি প্রদেশের একটি ফেডারেশন—আরব, ইহুদি (যাদের স্বায়ত্বশাসনের বাহ্যিক অবরণ থাকবে) এবং নেগেভ ও জেরুজালেম (যা থাকবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে)।

ব্রিটশ ও আমেরিকার কূটনৈতিক লড়াই চলছিল সমানে। ১৯৪৬ খৃঃ আমেরিকায় কংগ্রেস নির্বাচনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল-ইহুদি ভোটের জন্য প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের দাবী সম্পর্কে

তাদের সমর্থনের কথা প্রচার করতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ট্রুমাণ অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে একলক্ষ ইহুদি প্রবেশের অনুমতি দানের দাবী জানান এবং এজন্য মার্কিন আর্থিক সাহায্যের কথাও ঘোষণা করেন।

প্যালেস্টাইনে কর্তৃত্ব রক্ষায় ব্যর্থ হয়ে এবং মার্কিন সম্প্রসারণে ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘে প্যালেস্টাইন সমস্যাকে উত্থাপন করে ১৯৪৭ খৃঃ এপ্রিলে। তার উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে প্যালেস্টাইন ও সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সম্প্রসারণ রোধ করা ।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৪৭ খৃঃ দুটি অধিবেশনে প্যালেস্টাইন সমস্যা আলোচিত হয়। রাষ্ট্রসংঘে প্রস্তাব নিয়ে আসায় দুটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লড়াই-এর কেন্দ্র লণ্ডন থেকে চলে আসে নিউইয়র্কে।

আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ প্যালেস্টাইনে অধিকার টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালালেও, আরব রাষ্ট্রগুলি অছি শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীন প্যালেস্টাইনের দাবী জানান। আরব ও ইহুদি দুটি স্বতন্ত্র স্বশাসিত অঞ্চলের অস্তিত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না তাদের পক্ষে।

সাধারণ পরিষদে আলোচনাকালে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বেশ পরিষ্কার। প্রথমে আলোচনায় প্যালেস্টাইনের ইহুদি প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণের বিরোধিতা করলেও, পরে সম্মত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্যালেস্টাইনের সংগঠন ও উন্নয়ণ সম্পর্কে বিবিধ প্রস্তাব পেশ করলেও, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধিই ছিল মার্কিণ সরকারের লক্ষ্য। ইহুদি এজেন্সীর উগ্র স্বাতন্ত্রবাদী প্রতিনিধিরা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দাবী জানাতে থাকে।

রাষ্ট্রসংঘে প্যালেস্টাইন জাতি-সমূহের সমস্যা সমাধানে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষার নীতির আদর্শে সোভিয়েত

ইউনিয়ন স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। আরব ও ইহুদিদের সমানাধিকার দানের ভিত্তিতে প্যালেস্টাইনকে একটি ফেডারেল হিসাবে গড়ে তোলার দাবী জানায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে বলা হল আরব ও ইহুদিদের পক্ষে একত্র বসবাস অসম্ভব। সুতরাং ধর্মের ভিত্তিতে প্যালেস্টাইনকে দুটি ভাগ করতে হবে। প্যালেস্টাইন পরিস্থিতি অনুসন্ধানের জন্য একটি রাষ্ট্রসংঘে কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটি সাধারণ সভায় তাদের রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে দ্রুত অছি শাসনের অবসান ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতা দানের সুপারিশ করা হয়; স্বাধীনতা লাভের প্রাক্‌কালে একটি রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষক দল পাঠানো হবে; কমিটির অধিকাংশের সুপারিশে ছিল প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করে আরব ও ইহুদি অঞ্চলে স্বাধীনতা দান এবং জেরুজালেম থাকবে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে। ইহুদি সংস্থা-গুলি এই সিদ্ধান্তে সমর্থন জানায়। সুপারিশের দ্বাদশ ধারায় ছিল প্যালেস্টাইন সমস্যাকে একমাত্র ইহুদি সমস্যা হিসাবে বিচার করা চলবে না। কমিটির স্বল্প সংখ্যক সদস্যের সিদ্ধান্ত ছিল জেরুজালেমকে রাজধানী করে দুটি স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা সম্পন্ন আরব ও ইহুদি অঞ্চল মিলে একটি ফেডারেশন গঠন। আরব দেশগুলি ছিল এর পক্ষে।

সাধারণ সভায় ১৯৪৭ খৃঃ সেপ্টেম্বর ও নভেম্বরের আলোচনা দুটি স্বতন্ত্র পথের নির্দেশ করে—একটি হল সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থরক্ষক এবং অপরটি সোভিয়েত ইউনিয়নের নীতির দ্বারা অনুসৃত। ব্রিটেন সব সময় আলোচনার সিদ্ধান্তকে জটিল করে তোলার চেষ্টা চালায়। দুটি পক্ষকে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সজাগ করে, তারা নিজেদের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী করবার সুযোগ নেয়। কিন্তু আমেরিকা সব সময় প্যালেস্টাইনে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়েছিল। আলোচনার শেষ দিকে আমেরিকা একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করে। ঐ প্রস্তাবে বলা হয়, :যতক্ষণ আরব ও ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হচ্ছে, ততক্ষণ

প্যালেস্টাইনে ব্রিটিশ অছি শাসন বলবৎ থাকবে। প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার সঠিক তারিখ নির্দেশ না হওয়ায়, সমস্যা সমাধানের প্রয়াস বিঘ্নিত হতে থাকে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ পূরণের সুযোগ দেখা দিতে থাকে। তারপর রাষ্ট্রগুলি সে সময় এই প্রয়াসকে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান সুদৃঢ় করার চক্রান্ত হিসাবে অভিহিত করে।

অবশেষে সাধারণ সভায় দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তে, অর্থনৈতিক দিক থেকে সংযুক্ত দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের (আরব ও ইহুদি) সুপারিশ করে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ব্রিটেনের অছিগিরি মেনে নেয়। পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা সহ তেত্রিশটি রাষ্ট্র ; বিপক্ষে তেরটি রাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সহ তেরটি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। গৃহীত প্রস্তাবে ছিলঃ প্যালেস্টাইনের অছি ব্যবস্থার অতি দ্রুত অবসান ঘটাতে হবে, যে কোন ভাবেই ১৯৪৮ খৃঃ ১ আগস্টের মধ্যে ; অছি শাসকের সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ ভাবে অতি দ্রুত সরিয়ে নিতে হবে এবং তা অবশ্যই ১৯৪৮ খৃঃ ১আগস্টের মধ্যে। আরব রাষ্ট্র হবে এগার হাজার একশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে (বিয়াল্লিশ ভাগ), পশ্চিম গ্যালিলি সহ আক্রা এবং নাজারেথ শহর সমেত, এসড্রায়েলন উপত্যকা থেকে বারসেবা পর্যন্ত দেশের মধ্য ও পূর্বাঞ্চল জুড়ে এবং আশদোদের উত্তর থেকে গাজার দক্ষিণ ভাগ ধরে উপকূল অঞ্চল বরাবর লোহিত নদীর মিশর সীমান্ত পর্যন্ত। জাফা হবে আরব রাষ্ট্রে অন্য রাষ্ট্রের পরিবেষ্টিত অংশ। চৌদ্দ হাজার একশত বর্গ কিলো-মিটার অর্থাৎ ছাপান্ন ভাগ অংশ নিয়ে গঠিত হবে ইহুদি রাষ্ট্র। হাইফা, তেল আভিভ, পূর্ব গ্যালিলি এবং এসড্রায়েলন উপত্যকা, হাইফার দক্ষিণে আশাদোদ পর্যন্ত উপকূল ভাগ এবং নেগেভ মরুভূমির অধিকাংশ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

বেথেলহেম এবং জেরুজালেম শহরের সন্নিহিত শতকরা দুই ভাগ অঞ্চল সহ ভূভাগ হবে অছিসংস্থার নিয়ন্ত্রণে স্বাধীন শাসন ক্ষমতা

সম্পন্ন। প্যালেস্টাইনের বিভাগ ঘটেছিল জাতির ভিত্তিতে। ১৯৪৭ খৃঃ শেষে প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যা ছিল ১,৮৪৫,০০০। আরব ১,২৩৭,০০০ অর্থাৎ ৬৭ শতাংশ এবং ৬০৮,০০০ ইহুদি অর্থাৎ ৩৩ শতাংশ। রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে কৃষিযোগ্য ভূমির শতকরা তিরানব্বই ভাগ ছিল আরবদের এবং মাত্র সাত ভাগ ছিল ইহুদিদের। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ দুটি রাষ্ট্রের জনসংখ্যার ভাগ নির্ধারণ করে এইভাবে, আরব রাষ্ট্রে সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার আরব ও দশ হাজার ইহুদি থাকবে। এবং ইহুদি রাষ্ট্রে চারলক্ষ আটানব্বই হাজার ইহুদি ও চার লক্ষ সাত হাজার আরব থাকবে। জেরুজালেমের জনসংখ্যা নির্ধারিত হয় একলক্ষ পাঁচ হাজার আরব এবং এক লক্ষ ইহুদি। রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্তে দুই রাষ্ট্রের প্রাদেশিক শাসকবর্গ ব্রিটিশ বাহিনী প্রত্যাহারের দু মাসের মধ্যে কার্যকরী করবে এমন কয়েকটি সুপারিশ ছিল। তার মধ্যে ছিল শাসনতান্ত্রিক সংসদ গঠনের জন্য নির্বাচন, গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনা এবং আরো বহু জরুরী বিষয়।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল ব্রিটেন ও আমেরিকার কোন সদিচ্ছা নেই রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্তগুলিকে কার্যকরী করতে। নানাভাবে তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে থাকে। এবং তাদেরই প্ররোচনায় ১৯৪৭ খৃঃ ডিসেম্বরে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয় এবং ১৯৪৮ খৃঃ প্রথমেই খোলাখুলি যুদ্ধ বেধে যায়। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে ১৯৪৮ খৃঃ মার্চ-এপ্রিল মাসে প্যালেস্টাইন সমস্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। মার্কিন ও বৃটিশ প্রতিনিধিরা ঘোষণা করে প্যালেস্টাইনকে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। উনিশ মার্চ মার্কিন প্রস্তাবে বলা হয়, প্যালেস্টাইন থাকবে রাষ্ট্রসংঘের নিয়ন্ত্রণে এবং রাষ্ট্রসংঘ নির্বাচিত গভর্ণর দেশটি শাসন করবেন। প্রকৃতপক্ষে এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার মানে ছল পরিপূর্ণ মার্কিন শাসনব্যবস্থা কায়েম। সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশনে মার্কিন প্রতিনিধি অছিগিরির প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।
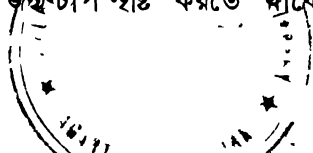
বিতর্কের সময় মার্কিন প্রতিনিধি একজন হাইকমিশনারের অধীনে প্যালেস্টাইনে সাময়িক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনে জোর দিতে থাকেন। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ সভায় সেদিন সোভিয়েত প্রতিনিধি মার্কিন পরিকল্পনার গোপন উদ্দেশ্যকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন, অছিশাসনে প্যালেস্টাইনের আরব ও ইহুদিদের একটিই মাত্র অধিকার থাকবে, তা হ'ল গভর্ণর জেনারেলের নির্দেশ বিনীতভাবে মেনে চলা।

এইভাবে মার্কিন পরিকল্পনার সাহায্যে সাধারণ সভার গৃহীত আরব ও ইহুদি রাষ্ট্রগঠনের সিদ্ধান্তকে বানচাল করবার চেষ্টা চলে। বরং আরব ও ইহুদিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংঘাত সৃষ্টি হতে থাকে। সোভিয়েত প্রতিনিধি ১৯৪৮ খৃঃ মে মাসে রাজনৈতিক কমিটি ও সাধারণ সভায় আরব-ইহুদি সমস্যা সমাধানের সামগ্রিক প্রয়াসে বৃটিশ ও মার্কিণ নগ্ন অপচেষ্টার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এইসময় ব্রিটেন হঠাৎ ঘোষণা করে, সে প্যালেস্টাইনে তার অছিশাসনের অবসান ঘটিয়ে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে। তাদের পরিকল্পনা ছিলঃ আরব ইহুদি সংঘর্ষে আরবরা ব্রিটিশ সাহায্যে জয়ী হবে এবং ব্রিটিশ বুর্জোয়া ও আরব জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠির মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হবে।

আবার অছিগিরির মার্কিন পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় মার্কিন শাসকগোষ্ঠি তাদের কৌশল বদল করে। তারা প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকেই স্বার্থানুকূল হিসাবে মনে করতে থাকে। তেরই মে ট্রুমান ও ওয়াইজমান সাক্ষাৎকারে প্যালেস্টাইনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শেষ ব্রিটিশ কমিশনার অ্যালান কাবিঙহাম জেরুজালেম ত্যাগ করেন চোদ্দই মে। ঐ দিন তেল আভিভে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়; সঙ্গে সঙ্গে ডেভিড বেন গুইরনের নেতৃত্বে গঠিত হয় মন্ত্রিসভা। নতুন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি জানায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নতুন রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসাবে কার্যভার গ্রহণের উদ্দেশ্যে আমেরিকা ত্যাগের প্রাক্কালে ওয়াইজমান

আবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিলিত হন। পরে তিনি স্মৃতি-কথায় লেখেন: "সামনের সংকটজনক মাসগুলিতে ইজরায়েল রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাহায্যের বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম।"

অনেকদিন ধরেই প্যালেস্টাইনের ইহুদি অধ্যুষিত অঞ্চলে আরবদের ওপর চলেছিল বর্বর হামলা। ইহুদিরা একের পর এক বসতি দখল করে নিতে থাকে। আরবদের ঘরবাড়ী, খেত-খামার, গৃহপালিত পশু, পোলট্রি, সবই কেড়ে নিতে থাকে সশস্ত্র আগন্তুকেরা। জাফা, আক্রা, লিড্ডা, রামলি, নাজারেথ এবং আরো শতাধিক শহর ও গ্রাম ইহুদিরা কেড়ে নেয়, যা তাদের দেওয়া হয়নি। আরব ইহুদি সংঘর্ষ ব্যাপক রূপ নিতে থাকে। ইরগুণ ও স্টার্ণ ইহুদি গুণ্ডাদের অত্যাচারে বহু আরব প্রাণ হারায়। এদের হাতেই দের ইয়াসিনে দুশ চুয়ান্ন জন আরব নরনারী ও শিশু মারা পড়ে এপ্রিলের নয় তারিখ ১৯৪৮ খৃঃ। মহিলাদের নিয়ে যাওয়া হয় জেরুজালেমে। রাস্তা দিয়ে তাদের সারি বেঁধে নিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্রূপ করা হতে থাকে এবং গায়ে থুথু ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরিস্থিতি সংকটজনক হয়ে ওঠায় রাষ্ট্রসংঘ একটি শান্তি কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় এগারই এপ্রিল।

প্যালেস্টাইন আরবদের সমর্থনে এগিয়ে আসে আরব লীগ (মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন)। নবগঠিত ইজরায়েল আক্রান্ত হয় পনেরই মে ১৯৪৮ খৃঃ। আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সৌদি আরব ও ইয়েমেনও যুদ্ধ ঘোষণা করে। আরব লীগের ঘোষণায় বলা হয়: "এই হস্তক্ষেপ প্যালেস্টাইন ইহুদিদের বিরুদ্ধে নয়। এই হস্তক্ষেপ কেবলমাত্র জিওনিস্ট সাম্রাজ্যবাদী দস্যুদলের বিরুদ্ধে। যতদিন পর্যন্ত প্যালেস্টাইনে সমস্যার সমাধান ন্যায়নীতির ভিত্তিতে সুসম্পন্ন না হয়, ততদিন ঐ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা অব্যাহত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।"

প্যালেস্টাইনে আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসংঘের নির্ধারিত ভূখণ্ডের সত্তর শতাংশ সশস্ত্র সংঘর্ষে দখল করে নেয় ইজরায়েল। বিশেষ করে : পশ্চিম গ্যালিলি, পশ্চিম নেগেভ এবং জেরুজালেমের অংশ (নিউ সিটি)—সব মিলিয়ে ছয় হাজার ছয়শত বর্গ কিলো-মিটার, পূর্ব প্যালেস্টাইনের সঙ্গে সংযুক্ত ট্রান্স-জর্ডানীয় অঞ্চল এবং জেরুজালেমের অংশ (ওল্ড সিটি)—মোট পাঁচ হাজার পাঁচশত বর্গ কিলোমিটার ; গাজার সংগে সংযুক্ত মিশরের ভূভাগ—প্রায় দুইশত আঠান্ন বর্গ কিলোমিটার। রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্তে আরব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব এইভাবেই সমাধি লাভ করে। রাষ্ট্রসংঘের ঘোষণাকে অগ্রাহ্য করে—প্যালেস্টাইনের পাঁচভাগের চারভাগ অর্থাৎ কুড়ি হাজার সাতশত বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল দখল করে ইজরায়েল।

একবছর যুদ্ধ চলে। নেগেভ অঞ্চলে যুদ্ধ শেষের তিনমাস প্রচণ্ড রূপ নেয়। অবশেষে রালফ বুনসের মধ্যস্থতায় রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে আরব রাষ্ট্রগুলিকে ইজরায়েলের সঙ্গে অস্ত্রসম্বরণ চুক্তি সাক্ষরে বাধ্য করা হয়। ১৯৪৯ খৃঃ ফেব্রুআরি থেকে জুলাই-এর মধ্যে মিশর, লেবানন, ট্রান্স-জর্ডান ও সিরিয়া চুক্তিতে সাক্ষর করে। অধিকৃত অঞ্চলে ইজরায়েল কর্তৃপক্ষ ব্যাপক সন্ত্রাসের রাজত্ব চালায়। দৈহিক নির্যাতনে বিপুলসংখ্যক আরব ধ্বংস হয়ে যায়। ইজরায়েলী সন্ত্রাসবাদীদের কার্যক্রমে আতঙ্কিত নব্বই হাজারেরও বেশী আরব দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। ফলে সৃষ্টি হয় এক বৃহত্তর সমস্যার। প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তুদের ফেরৎ নেওয়ার ১৯৪৮ খৃঃ রাষ্ট্রসংঘ সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করে আরব-ইজরায়েলী সংঘাতকে এক বৃহত্তর পটভূমিতে ছড়িয়ে দেয় ইজরায়েল।

প্রথম আরব ইজরায়েল সংঘর্ষকালে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সেনা-বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল :

ইজরায়েল—৬৫,০০০ মিশর—১০,০০০ আরব লিজিঅন—৪,৫০০

সিরিয়া—৩,০০০ লেবানন—১,০০০ ইরাক—৩,০০০

এক বছরের শিশুরাষ্ট্রের তুলনায় আরব রাষ্ট্রগুলির সৈন্যসংখ্যা ছিল চুয়াল্লিশ হাজার কম, তাছাড়া আরবদের যুদ্ধাস্ত্র সে সময়কার মান অনুযায়ী ছিল যথেষ্ট সেকেলে।

আরব ইজরায়েল সংঘর্ষ সাময়িকভাবে বন্ধ হলেও, এই সুযোগে ইজরায়েলের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ঘটে। ১৯৪৮ খৃঃ ১৮ জুন ইজরায়েল সরকার আবার আরব ভূমি দখল শুরু করে। গাজাফালি বাদে মিশর সীমান্ত পর্যন্ত তাদের অধিকারে চলে যায়। আরব রাষ্ট্রগুলির অনৈক্যের সুযোগ নিয়েছিল ইজরায়েল। প্যালেস্টাইনের আরবরা সংখ্যায় প্রায় বিশ লক্ষ, পার্শ্ববর্তী আরব রাষ্ট্রগুলিতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রসংঘ দীর্ঘ বাদানুবাদের পর ইজরায়েল অধিকৃত সমগ্র ভূভাগ সহ অঞ্চলকে সাময়িক সীমানা হিসাবে স্বীকৃতি জানায়।

বালফুর ঘোষণাকালে (নভেম্বর ১৯১৭খৃঃ) প্যালেস্টাইনে ইহুদি সংখ্যা ছিল ছাপান্ন হাজার ছয় শত সত্তর (সেন্সাস ১৯১৭খৃঃ-১৯১৮ খৃঃ)। এ হ'ল মোট জনসংখ্যার দশভাগ মাত্র। পাঁচ বছর বাদে, ১৯২২ খৃঃ ব্রিটেনের অছিশাসন গ্রহণকালে জনসংখ্যার ১১.১ ভাগ ছিল ইহুদি ; ১৯৩১ খৃঃ ছিল ১৬.৮ ভাগ। ১৯৪৭ খৃঃ নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘ প্যালেস্টাইনে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ঐ অঞ্চলে জনসংখ্যার একটি সাধারণ পরিসংখ্যান (হাজার হিসাবে):

	মোট	মুসলমান মূলত আরব	ইহুদি	খৃস্টান	অন্যান্য
১৯২২খৃঃ সেন্সাস	৭৫২.০	৫৮৯.১	৮৩.৮	৭১.১	৭.৬
১৯৪৫খৃঃ শেষে	১,৮১০,০	১,১০১.৫	৫৫৪.৬	১৩৯.৩	১৪.৮
১৯৪৭খৃঃ নভেম্বর	১,৮৪৫,০	১,২৩৭.০	৬০৮.০	...	...
স্বাভাবিক বৃদ্ধির হার %	৬৪.০	৯৬.০	২৮ ০	৭২.০	৯০.০
স্থায়ী বসবাসের জন্য বহিরাগত	৩৬.০	৪.০	৭২.০	২৮ ০	১০.০

সুতরাং প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধির পিছনে যে বহিরাগতদের অধিক সংখ্যায় আগমন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বেশীর ভাগ এসে বসতি স্থাপন করে জাফা, রামলি ও হাইফাতে। গ্যালিলি, পরে যেটি ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেখানে ইহুদির সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫'৬ ভাগ। আর ইজরায়েলের দখলীকৃত বারসেবায় ইহুদি ছিল মাত্র দুইভাগ (গাজা সহ)। ১৯৪৮ খৃঃ ডিসেম্বরে ইজরায়েলে ৮৬৭,০০০ জনসংখ্যার ৭৫৯,০০০ ইহুদি এবং ১০৮,০০০ আরব ছিল। আরব ইজরায়েল যুদ্ধ জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় ব্যাপকভাবে। ১৯৪৯ খৃঃ শেষে ইজরায়েলের জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১,১৭৩,৯০০। এর মধ্যে শতকরা ৮৬'৪ ভাগ হল ইহুদি এবং ১৩'৬ ভাগ আরব। দেশের উত্তরাংশ অর্থাৎ গ্যালিলিতে ইজরায়েল প্রতিষ্ঠাকালে আরব ছিল শতকরা ৮৪ জন এবং ১৬ জন ইহুদি। কিন্তু ১৯৫১ খৃঃ ৪৩'৫ জন আরব এবং ৫৬'১ জন ইহুদি হিসাবে এই অঞ্চলে জনবসতি গড়ে ওঠে। দেশের দক্ষিণাংশে (বারসেবা) প্রথমে ছিল শতকরা দুইজন ইহুদি ; ১৯৫১ খৃঃ তাদের হার হয় শতকরা ৭৯ জন, আরব জনসংখ্যা শতকরা ৯৮ থেকে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় একুশে। হাইফাতে সংখ্যায় বেশী ছিল ইহুদি। ১৯৪৮ খৃঃ সেখানে আরব ছিল শতকরা ৩৮'১ জন। কিন্তু ১৯৫১ খৃঃ তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় শতকরা ছয় জন।

ইজরায়েলে ইহুদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১৯৪৮ খৃঃ থেকে ১৯৫১খৃঃ মধ্যে। এর বেশীর ভাগই আসে অবশ্য বিদেশ থেকে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে। (হাজার হিসাবে) একটি পরিসংখ্যান :

	১৯৪৮	১৯৪৯ বছরের শেষে	১৯৫০	১৯৫১
মোট জনসংখ্যা	৭৫৮'৭	১,০১৩ ৯	১,২০৩'০	১,৪০৪'৪
বৃদ্ধির হার	১০৯'১	২৫৫'২	১৮৯'১	২০১'৪
বহিরাগত	১০১'১	২৩৯'০	১৬৯ ৪	১৭৩'৯
শতকরা	৯৩'৩	৯৩ ৬	৮৯ ৫	৮৬'৩

প্যালেস্টাইনে ১৯১৯ খৃঃ থেকে ১৯৪৮ খৃঃ মধ্যে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত ইহুদিদের সংখ্যাঃ য়ুরোপ—৮৭'৫; এশিয়া ও আফ্রিকা—১০'৭; আমেরিকা—১'৮। ১৯৪৮ খৃঃ ইজরায়েলে জন্ম-প্রাপ্ত ইহুদি সংখ্যা ছিল মাত্র শতকরা পঁয়ত্রিশ। অবশ্য এটা খুবই বেশী সংখ্যা; সমসাময়িককালে আগত বহিরাগতদের সন্তানদেরও এই হিসাবে ধরা হয়। বহিরাগত ইহুদিদের ব্যাপক আগমনে ইজরায়েলের আর্থিক সংকটের জন্য ১৯৫১ খৃঃ অক্টোবরে, বহিরাগত আগমনে বিধিনিষেধ আরোপ হয়। এই বছরের শেষে বহিরাগতদের ক্ষেত্রে নির্বাচিত ব্যক্তিদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতে থাকে।

ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী এবং যৌক্তিকতার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে "প্যালেস্টাইনঃ ক্রাইসিস অ্যাণ্ড লিবারেশন" গ্রন্থে। এখানে সেটি উদ্ধৃত হলঃ

(১) যখন ১৯১৭ খৃঃ ইংল্যাণ্ড প্যালেস্টাইনীয় বিরোধ সৃষ্টি করে তখন দেশের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ ভাগ ছিল আরব জাতিভুক্ত অথচ সেখানে তখন ৬৫,০০০-এর বেশি ইহুদি ছিল না।

(২) এবং তখন প্যালেস্টাইনে বসবাসকারী ইহুদিদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল সে দেশে নবাগত। এরা ১৯১৭ খৃঃ মাত্র তিন দশক আগে বিভিন্ন য়ুরোপীয় দেশ থেকে তাড়া খেয়ে এসে প্যালেস্টাইনে বসবাস শুরু করে। প্যালেস্টাইনে সে সময়ে মোট ইহুদি জাতিভুক্তদের মধ্যে শতকরা ৫ জনেরও কম অধিবাসী ছিল সে দেশের আদি বাসিন্দা।

(৩) যে সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন প্যালেস্টাইনীয় আরবরা দেশের শতকরা ৯৭'৫ ভাগ অঞ্চলে অধিকার ভোগ করছিল; সেই সঙ্গে দেশীয় এবং বিদেশ-আগত ইহুদিরা ভোগ করছিল মাত্র শতকরা ২'৫ ভাগ।

(৪) এবং ত্রিশ বছরব্যাপী ব্রিটিশ অধিকারকালে ইহুদিরা

প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের শতকরা ৩'৫ ভাগ অঞ্চল দখল করতে ব্যর্থ হয়, যদিও তাঁরা ইংরেজ প্রটেক্টরেট সরকারের পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে ক্রমাগত মদত পেয়ে এসেছে। এটা ছিল সেই একই ব্রিটিশ সরকার যারা ন্যায়সঙ্গত অধিকার এবং সম্মতি ছাড়াই ইহুদিদের হাতে প্যালেস্টাইন হস্তান্তর করে।

(৫) এবং এ কারণেই যখন ১৯৪৭ খৃঃ ব্রিটেন রাষ্ট্রসংঘে প্যালেস্টাইন সংক্রান্ত সমস্যাটি উত্থাপন করে তখন প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের শতকরা ছয় ভাগ অঞ্চলে ইহুদিরা বসবাস করত;

(৬) তা সত্ত্বেও জাতিসংঘ প্যালেস্টাইন বিভাজন এবং ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। এই সঙ্গে তাকে দেশের প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ অঞ্চলে অধিকার কায়েমের স্বীকৃতি দেয়;

(৭) যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া হল ত্বড়িৎ গতিতে তার শাসকগোষ্ঠী দেশের শতকরা ৮০'৪৮ ভাগ অংশে তাদের দখলদারী কায়েম করে;

(৮) এই একতরফা সম্প্রসারণ কার্য ১৯৪৮ খৃঃ ১৫ মে-র আগে সম্পূর্ণ হয়—অর্থাৎ প্যালেস্টাইনের ওপর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবসান ঘটার আগেই এবং সে দেশ থেকে তাদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের আগেই;

(৯) ১৯৪৭ খৃঃ ২৯ নভেম্বর ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে সুপারিশ রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ কমিশন করেছিল সেটা যে-কোন দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা যাক বেআইনী ছিল। এটা যেমন তার এক্তিয়ারভুক্ত ছিল না তেমনি ছিল রাষ্ট্রসংঘের সনদ-বিরোধী;

(১০) এখন প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রসংঘ, আরব জাতি এবং অন্যান্য এশীয় জাতিগুলির আন্তর্জাতিক আদালতে ঐ সুপারিশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের সকল প্রয়াস কী এ কারণেই ব্যর্থ করে দিয়েছে যে ঐ প্রশ্নে তার (রাষ্ট্রসংঘ) যাতে পরামর্শমূলক মতামত জানাতে পারে?

(১১) যখন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৪৮ খৃঃ সমস্যাটি পুনর্বিবেচনার জন্য মিলিত হয়, তখন প্যালেস্টাইন বিভাজনের জন্য ১৯৪৭ খৃঃ সুপারিশটি অনুমোদন হয়নি। সেটাই কী প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে একটি "ইহুদি রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী সুপারিশের বৈধতাটি নস্যাৎ করেনি?

১২) কোন এশীয় বা আফ্রিকান রাষ্ট্র—একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া, কেউই প্যালেস্টাইন বিভাজনের প্রশ্নে ভোট দেয়নি। তারপর "ইহুদি রাষ্ট্র" সৃষ্টির জন্য সঙ্গে সঙ্গে ১৯৪৭ খৃঃ অনুমোদিত সুপারিশের প্রতি যারা সমর্থন জানিয়েছিল তারা ছিল য়ুরোপ এবং আমেরিকার রাষ্ট্রগুলি। তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সরকারের মন্ত্রিরা জঘন্যভাবে বার বার চাপ সৃষ্টি সত্ত্বেও এশীয় বা আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি ভোটদানে সম্মত হয়নি, এই চাপ সৃষ্টি সফল হয়েছিল, কেবল তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিদের ওপর। এশিয়া থেকে ফিলিপিন এবং আফ্রিকা থেকে লাইবেরিয়া প্রথমবার ভোটদানের সময় প্রচণ্ড বিরোধিতা করেও অবশেষে ভোটদানে বাধ্য হয়;

১৩) ইজরায়েল একটি "নতুন রাষ্ট্র" হিসাবে প্রথম থেকে আফ্রো-এশীয় দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল; কোন আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে তার স্থান হয়নি অথবা জোটনিরপেক্ষ দেশগুলির সম্মেলনেও নয়।

১৪) ১৯৪৯ খৃঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর থেকেই ইজরায়েল আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করতে থাকে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত সীমান্ত রেখা লঙ্ঘন করে বার বার পড়শী আরব দেশগুলির ওপর আক্রমণাত্মক অভিযান চালাতে থাকে। এ জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ছয় বার এবং নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচ বার ভর্ৎসনা করা হয়।

১৫) একই কারণে বারংবার ভর্ৎসনার কোন নজির রাষ্ট্র-সঙ্ঘ থেকে অন্য কোন সদস্য দেশের ওপর করা হয়নি।

১৬) অপরপক্ষে কোন আরব রাষ্ট্র ইজরায়েলের ওপর বা পড়শী দেশগুলির বিরুদ্ধে আগ্রাসী অভিযান চালানোর অভিযোগে রাষ্ট্র-সঙ্ঘে ভর্ৎসিত হয়েছে এমন কোন নজিরও নেই ;

১৭) ইজরায়েলের আগ্রাসী কার্যকলাপ কেবল আরব দেশ-গুলির ওপরই সীমাবদ্ধ থাকেনি—ইজরায়েল আরব ভূখণ্ড বেআইনী-ভাবে দখল করেছে, সে স্থানের ন্যায়সঙ্গত অধিবাসীদের বিতাড়িত করেছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে তাদের প্রতিনিধিকে এবং তার সহযোগীকে হত্যা করেছে, আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যদের গুম করেছে, যুদ্ধবিরতি চুক্তি-পর্যবেক্ষকদের অফিসে বেআইনিভাবে প্রবেশ করেছে, তার কাজকর্ম বানচাল করে দেওয়ার জন্য বারবার যুদ্ধবিরতি কমিশনের সভাগুলি বয়কট করেছে ;

১৮) ইজরায়েল এ ছাড়াও আরব জাতিভুক্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে অন্যায় বিভেদমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের আলাদাভাবে থাকতে বাধ্য করা হয় প্রতি-নিয়ত কড়া পাহারা এবং অত্যাচারের মধ্যে ; তাদেব স্বাধীনতা পদ-দলিত করা হচ্ছে। একটা শহর থেকে অপর একটা শহরে যেতে তাদের প্রচণ্ড হামলার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ; তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুল শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। এ সব অঞ্চলে জীবিকার সন্ধান পাওয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর ; এমন কি যখন সে দেশের অধিবাসীরা অতি নিচু মাইনেতেও কাজ পেতে রাজী :

১৯) ইজরায়েলীরা এসব প্রমাণাতীত ঘটনা সত্বেও পশ্চিমী সংবাদজগতে গণতন্ত্রের মহান তীর্থ এবং মধ্যপ্রাচ্যে 'শান্তি প্রতিষ্ঠার চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে আখ্যাত হচ্ছে।

২০) এই কারণে পশ্চিমী শক্তিগুলি একদিকে ইজরায়েল এবং অন্য দিকে তেরটি রাষ্ট্রের দশ কোটী অধিবাসীর মধ্যে অস্ত্রসম্ভার সরবরাহ ও সাহায্যের ক্ষেত্রে এক ধরনের "সমতা" প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে।

স্বভাবতই ইজরায়েলের দাবির অসারতা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না।

প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে জিওনিস্ট নেতা ডেভিড বেন গুইরন ১৯৪৮ খৃঃ জানুআরি মাসে ইজরায়েল লেবার পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে ভাষণদানকালে বলেন : "আমরা পূর্ব ঘটনাতেই জানি যে, আন্তর্জাতিক নির্দেশ পাল্টে দেওয়া যায়; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তুরস্কের এলাকা মিত্রপক্ষের প্রধানদের দ্বারা ভাঙাগড়ার কথা আমরা জানি।" রাষ্টসঙ্ঘের প্রস্তাবে ছিল, নবগঠিত রাষ্ট্র কয়েকটি বিধি-নিষেধ মেনে চলবে। সে সম্পর্কে তেলআভিভের জিওনিস্ট কর্তৃপক্ষ নীরব ছিল। কারণ, তারা জানত, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মার্কিন ব্রিটিশ সমর্থনে রাষ্ট্রসঙ্ঘ নির্দেশ উপেক্ষা করা অসম্ভব হবে না। এই কৌশলেই তারা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম দিনে সাতাত্তর শতাংশ ভূভাগ দখল করে নেয়। তাছাড়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিয়ন্ত্রণে একটি আন্তর্জাতিক প্রশাসনের অধীন হবে ধর্মনগরী জেরু-জালেম। ব্রিটিশ অছি সরকার চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইজরায়েল জেরুজালেমের অর্ধেকের বেশী অংশ অধিকার করে। বেন গুইরন কয়েকদিন পরে লিখলেন; "প্রতি বৎসর প্রতি মাসেই আমাদের ইতিবাচক সাফল্যলাভ ঘটেছে, ইহুদি জেরুজালেমের অগ্রগতি খুবই চমকপ্রদ। ইজরায়েল রাষ্ট্রের অধীনে জেরুজালেমের এই অগ্রগতি রাষ্ট্রসঙ্ঘ শাসনের চেয়ে অনেক ভাল। আর রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাসনব্যবস্থা তো এখনও জন্মলাভই করেনি।" পরে ১৯৫০ খৃঃ ১৫ মে স্বাধীনতা দিবসে বেন গুইরন ঘোষণা করেছিলেন; "সকল লোকই দেখতে পাচ্ছে যে ইজরায়েল সরকার ও নেসেত রাষ্ট্রসঙ্ঘের অন্যায় নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে জেরুজালেমকে ইজরায়েলের রাজকীয় রাজধানীতে পরিণত করেছে এবং এই ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না।"

স্থিতাবস্থা অক্ষুন্ন রাখতে বলা হয়েছিল ১৯৪৯ খৃঃ যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে। কিন্তু একমাসও পেরোল না। ইজরায়েল আরব ভূখণ্ড

ওম-অল-র‍্যাসর‍্যাস দখল করে নেয়। পরে এখানে বিখ্যাত এইলাত বন্দর নির্মিত হয়েছে। ইজরায়েলের এই বলপ্রয়োগে ভূমি দখলের প্রয়াস রাষ্ট্রসঙ্ঘ একটি প্রস্তাবে নিন্দা করে। প্রধানমন্ত্রী বেন গুইরন সদম্ভে ঘোষণা করেন: "মিশরের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মৃত্যু ঘটেছে এবং তার কবর রচিত হয়েছে; এই চুক্তি আর কোন দিনই ফিরে আসবে না। ইজরায়েলের অধীনে বর্তমানে যে সব স্থান আছে তার কোন এলাকাতেই কোন বিদেশী সৈন্য ইজরায়েল বরদাস্ত করবে না।"

আগ্রাসী স্বরূপ ক্রমশ প্রকট হয়ে উঠতে থাকে। একের পর এক আরব অঞ্চল দখল করে ইজরায়েলের সীমান্ত সম্প্রসারণও ছিল নিয়মিত ঘটনা। প্রধানমন্ত্রী বেন গুইরন ঘোষণা করলেন; "স্থিতাবস্থা মেনে চলা যেতে পারে না। আমরা কর্মচঞ্চল সদা-অগ্রসর এক রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছি; এই রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধি করা একান্ত দরকার।" তা সত্বেও ইজরায়েল রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য হয় ১৯৪৯ খৃঃ ১১ মে। প্রথম কূটনৈতিক স্বীকৃতি জানায় ব্রিটিশ সরকার।

আরব সীমান্ত মধ্যকার নেগেভ অঞ্চলের এল-আউজা দখল করে ইজরায়েল। আরব রাষ্ট্র ও ইজরায়েলের মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। ইজরায়েল আকাবা উপসাগরকে আন্তর্জাতিক এলাকা হিসাবে স্বীকৃতির দাবী জানালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির সঙ্গে মিত্রতা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। মিশরের সিনাই ও সৌদি আরবের মধ্যবর্তী দীর্ঘ এই জলপথকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দিতে আরব রাষ্ট্রগুলির ছিল তীব্র অনিচ্ছা। পশ্চিম এশিয়ার তৈল সম্পদের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রলোভনও কম ছিল না। এই সাম্রাজ্য-বাদীদের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল চরম আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

পশ্চিম এশিয়ায় পরবর্তীকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মিশর থেকে রাজা ফারুকের বিতাড়ন। রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে নেয় বিপ্লবী পরিষদ। নতুন সরকারের নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি আতঙ্কিত

হয়। মিশর সৈয়দ বন্দর ও সুয়েজ থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারণের জন্য ব্রিটেনের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। সামরিক বাহিনীকে ব্রিটিশ প্রভাব মুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ খৃঃ ব্রিটেন ও মিশরের মধ্যে চুক্তি হয় সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে। ইজরায়েল এই চুক্তির প্রবল প্রতিবাদ জানায়। এই সময়ে মিশর তার সৈন্যবাহিনী নতুন করে গড়ছিল। ফলে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সে অস্ত্র কিনতে চাইলে, আমেরিকা সর্ত আরোপ করে মিশরকে বাগদাদ চুক্তিতে যোগ দিতে হবে। ফলে মিশর ১৯৫৫ খৃঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে এক অস্ত্র ক্রয় চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। আমেরিকা ও ব্রিটেন তার ওপর ক্ষিপ্ত হোল। তারপর মিশর আসওয়ান বাঁধ নির্মাণ করে নদীর অববাহিকায় চাষের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাঙ্ক, বৃটেন ও আমেরিকা থেকে সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি পায় মিশর। প্রথমে আমেরিকা সাহায্য দিতে সম্মত হয়। সে সাহায্যের বিনিময়ে চেয়েছিল মিশরের আভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে। মিশর অ-রাজী হওয়ায় মার্কিন শক্তি সাহায্য দিতে ইতস্তত করে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েক মাস বাদেই বৃটেন ও আমেরিকা অর্থ সাহায্য দিতে অস্বীকার করে বসে। মার্কিন পত্রিকাগুলি একে তখন ডালেস সাহেবের 'বুঝে শুনে ঝুঁকি নেওয়া' বলে অভিহিত করে এবং এবং এই মার্কিন ব্রিটিশ 'কূটনৈতিক দেউলিয়াপনার' কারণ হিসাবে তারাই দেখিয়েছিলেন যে এর পিছনে আছে: চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনা, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিশরের ক্রমবর্ধমান মৈত্রী, বান্দুং সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট নাসেরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, লোকায়ত্ত প্রজাতান্ত্রিক চীনকে স্বীকৃতিদান, আলজেরিয়ার মুক্তি সংগ্রাম নমর্থন, ভারতের নেহরু ও যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা—এই সব কিছুর জন্যে মিশর সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের ক্রোধ। আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের দায়িত্ব নেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সুয়েজ

জাতীয়করণ এবং আসোয়ান বাঁধে সোভিয়েত সাহায্য পশ্চিমী শক্তি-গুলিকে ক্ষিপ্ত করে তুলল। বিশেষ করে সুয়েজ খাল তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পথ। কোটি কোটি টাকার তেল, অন্যান্য দ্রব্যাদি জাহাজে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এই পথে। সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। এই কৃত্রিম জলপথ ১৯৫৬ খৃঃ মিশর সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়। তার জন্য মিশর সুয়েজ কোম্পানীকে দু কোটি আশি লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দেয়। নাসের রাষ্ট্রসঙ্ঘকে জানিয়ে দেন যে যেহেতু তারা ইজরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধরত, সেহেতু ইজরায়েলের পতাকাবাহী কোন জাহাজকে এই পথে যেতে দেওয়া হবে না। এই জলপথ বন্ধ থাকায় কেবলমাত্র মিশরেরই ক্ষতি হচ্ছে না, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বহু অসুবিধা থাকা সত্বেও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রকে সুয়েজ খাল বন্ধ করে দিতে হয়। আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের সময় খাল থাকবে নিরপেক্ষ। কিন্তু সমস্ত যুদ্ধের সময়ই পশ্চিমী শক্তি এই খালকে নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে। ১৯৫৬ খৃঃ তারা বোমা ফেলে জাহাজ ডুবিয়ে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ করে দেয়।

পশ্চিমী শক্তির প্ররোচনায় ইজরায়েল মিশর আক্রমণ করে বসে ১৯৫৬খৃঃ ২৯অক্টোবর। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ছিল তার অন্যতম সহযোগী। সিনাই উপদ্বীপ সুয়েজ ও আকাবা উপসাগরের মধ্যে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। উপত্যকার দক্ষিণ বিন্দুতে অবস্থিত শারম-এল-শেখ তিরান প্রণালী প্রহরারত; ১৯৫৬ খৃঃ পর্যন্ত ছিল মিশরের কর্তৃত্বে। সুয়েজ সঙ্কটের সময় মিশর এই পথ দিয়ে ইজরায়েলের এইলাত বন্দরে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। ব্রিটেন ও ফ্রান্স এগিয়ে আসে নিজেদের কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারে। এই সময় তাদের বিমান মিশর ও সুয়েজের ওপর প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ করে। আর আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত ইজরায়েলী বাহিনী সিনাইয়ে আশাতীত সাফল্য লাভ করে। প্রচণ্ড যুদ্ধের পর

শারম-এল-শেখ দখল করে। চার মাস এই ঘাঁটি তাদের হাতে ছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘবাহিনী আসবার পর ইজরায়েলীরা এখান থেকে সরে যায়। সে সময় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বুলগানিন পশ্চিমী শক্তিজোটের এই বীভৎস আক্রমণ অবিলম্বে বন্ধের নির্দেশ দেন, অন্যথায় তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাঁর এই হুমকিতে এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপে ১৯৫৬ খৃঃ ২ নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘটে। উভয় দেশের সৈন্যদলই নিজেদের এলাকার ফিরে যায়। তবে গাজা অঞ্চল থেকে ইজরায়েলী সৈন্য অপসারণে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল. দু দেশের মধ্যবর্তী ১১৭ মাইল দীর্ঘ সীমান্তে শান্তিরক্ষায় ছয় হাজার রাষ্ট্রসঙ্ঘ জরুরী বাহিনী মোতায়নের কথা ছিল, কিন্তু ইজরায়েল তার বিরোধিতা করে। ইজরায়েলের এই আপোষহীন মনোভাব মার্কিন সহায়তায় ক্রমশ উগ্র হয়ে উঠতে থাকে। প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার ইজরায়েলকে সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং আকাবা উপসাগর ইজরায়েলকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। মার্কিন-ব্রিটিশ ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীরা রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে লোহিত সাগর ও আকাবা উপসাগরের সংযোগস্থলে তিরাণ প্রণালী অঞ্চলে রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনী মোতায়েন করে।

ইজরায়েলের অন্যায় কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে ছিল না। জর্ডান নদী জল নিয়ে ১৯৪০ খৃঃ আরব ইজরায়েল সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়ে ওঠে। নেগেভ মরুভূমিকে উর্বর করার অজুহাতে তাইবেরিয়ান হ্রদ থেকে জর্ডান নদীর জলধারাকে ভিন্ন পথে পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি বসাতে থাকে ইজরায়েল আন্তর্জাতিক নির্দেশ উপেক্ষা করে।

সাতষট্টি সালের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এই আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে আঠাশবার নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাছাড়া যুদ্ধবিরতি কমিশন যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য ইজরায়েলকে সতর্ক করে দেয় সহস্রাধিকবার।

দুই ॥ স্বর্গরাজ্যে মোহভঙ্গ

ইহুদি রাষ্ট্র হিসাবে ইজরায়েলের আত্মপ্রকাশে বিরোধিতা করেছিলেন মহাত্মা গান্ধী। রাষ্ট্রসংঘে ভারত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দেয়। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছিলেন:

"আমি অন্তর থেকে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করি না। এর প্রয়োজন কি তা বুঝতে পারি না। হীণমন্যতা ও অর্থনৈতিক দৌর্বল্যের সঙ্গে এর যোগ রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটি খারাপ ব্যাপার। আমি সব সময়েই এর বিরুদ্ধে।"—তবুও ইজরায়েল রাষ্ট্রেব জন্ম হয়েছে। তার বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। ইজরায়েল একটি নেশন, তার জাতীয় ভাষা হিব্রু। ইহুদি জাতির মনোবৃত্তি স্বাধীন চিন্তা ও বিজ্ঞান চর্চার পরিপন্থী। ধর্মই এদের একমাত্র সংস্কৃতি, ধর্ম-বিবর্তনের ইতিহাসই জাতীয় ইতিহাস। অনুন্নত কৃষ্টি সম্পন্ন জাতির মত, প্রাচীনকালে এরা কোন শিল্পসৃষ্টি করেনি। ঝঞ্ঝা দেবতা জাভে ছিলেন ইহুদিদের প্রভু। "তিনি ছিলেন জাতির রক্ষক, জাতীয় দেবতা—চণ্ড যোদ্ধমূর্তি, রক্ত-পিপাসু, ক্রোধান্ধ, হঠকারী, খামখেয়ালী ও বাচাল। তাঁর রুদ্রতাণ্ডব রুচিসংগত নয়, নীতি-বিগর্হিত। জাতিকে জাতি নির্মমভাবে ধ্বংস করতে কুণ্ঠাবোধ করেন না তিনি।" বিবিধ শাস্তিদানের সময় সহস্র সহস্র মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। অন্যান্য বহু দেবতা ছিল ইহুদিদের। জাভে তা পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন ঈর্ষাপরায়ণ।

মিশর থেকে বিতাড়িত, আসিরিয়া, মিশর ও ব্যাবিলনে উপদ্রুত,

দু-হাজার বছর ধরে নানাদেশে নির্যাতিত ইহুদিরা, অবিচার শোষণ ও নিষ্পেষণ থেকে মুক্তির আশা দেখে ইজরায়েলে। কিন্তু ইহুদিরা হাজার হাজার ব্যাপী পর্বতপ্রমাণ কুসংস্কারকে আঁকড়ে রেখেছে ঐতিহ্য হিসাবে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়ন হিংসাপূর্ণ। বিদ্বেষ, লুণ্ঠন তথা প্রতিক্রিয়াশীলতায় প্রবাহিত। ইহুদি উগ্র স্বাতন্ত্রবাদী নেতারা আজ স্বেচ্ছায় বিস্মৃত যে, প্যালেস্টাইন মাত্র ইহুদিদেরই নয়, তা খৃস্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদেরও পবিত্র স্থান।

বর্তমান ইজরায়েলকে একটি গণতন্ত্রের তীর্থক্ষেত্র এবং ন্যায় ও আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র হিসাবে প্রচারের চেষ্টা চালায় তেলআভিভ কর্তৃপক্ষ এবং আন্তর্জাতিক জিওনিস্ট নেতারা। প্রতিক্রিয়াশীলতার হাতে পড়ে আধুনিক জগতে উন্নয়নশীল একটি দেশ পূর্ণ যুদ্ধবাজ ও পুলিশ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় চরিত্র বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ইজরায়েল একটি পুঁজিবাদী সম্প্রসারণবাদী দেশ। সমরবাদ, ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী জাত্যাভিমান ও ইহুদি যাজকতন্ত্রের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছে রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা। এই জাত্যাভিমান আক্ষরিক অর্থে সমগ্র সমাজের মধ্যে পরিব্যাপ্ত এবং ক্রমশঃ তা পরিণত হচ্ছে বর্ণবিদ্বেষে। সেই সঙ্গে ইহুদি যাজকতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সুসংহত। বর্তমান ইজরায়েলের সম্প্রসারণবাদী পররাষ্ট্রনীতিতে এবং শ্রমিক-বিরোধী, জন-বিরোধী আভ্যন্তরীণ কর্মনীতিতে পরিষ্কার ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী ভাবাদর্শের প্রভাব। এই ভাবাদর্শই প্রকৃতপক্ষে ইজরায়েলকে বিশ্বের অন্যতম সর্বাপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছে। ইজরায়েলের প্রতিষ্ঠার প্রথম দিককার বছরগুলিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বিকৃতরূপ। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, বিশেষ করে আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে ১৯৪৭ খৃঃ আগ্রাসী যুদ্ধের পর থেকে এই দেশটির রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত ফ্যাসিস্ত রূপান্তরকরণ চলেছে। বিশ্বের যে কয়েকটি দেশের

লিখিত সংবিধানে নেই বা এমনকি নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতা সুপ্রতিষ্ঠিত করার মত কোন আইন পর্যন্ত নেই, ইজরায়েল তাদের অন্যতম। এরই কল্যাণে ইজরায়েলের শাসকদল সর্বপ্রকার অবৈধ ও স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপের নানা গণতন্ত্র-বিরোধী আইন প্রণয়ণের সুযোগ পান। ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির, বিচার ও আইন প্রণয়ণ প্রতিষ্ঠানগুলির কাজকর্মে গণতন্ত্র বিরোধী রীতি-নীতি অনুসৃত হওয়ার অন্যতম উৎস হল রাজনৈতিক ও আত্মিক জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল যাজকতন্ত্রের ও ধর্মীয় পার্টিগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব।

ইজরায়েলের অর্থ-নৈতিক কাঠামোতে বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিরই প্রাধান্য। শিল্পোদ্যোগগুলিতে ব্যক্তিগত পুঁজির মালিকানা অংশ হল নব্বই শতাংশ, আর সমবায়ভিত্তিক ক্ষেত্রে হল প্রায় ছয় শতাংশ। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র বিকিয়ে যাচ্ছে মার্কিন একচেটিয়াপতিদের কাছে। এই ক্ষেত্রটি হাইফা তৈল শোধনাগারের বাইশ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে ইজরায়েল কর্পোরেশন নামক এক মার্কিন একচেটিয়া সংস্থাকে। তাছাড়া বিদেশী একচেটিয়া পুঁজি ইজরায়েলে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিনিয়োগ করেছে। সেই পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটছে সমবায়গুলির মধ্যে, তার ফলে সমবায়ের চরিত্র পরিবর্তিত হচ্ছে। ১৯৫১ খৃঃ-৫২ খৃঃ ইজরায়েল পনের মিলিঅন ডলার মার্কিন সাহায্য পায়। তাছাড়া মার্কিন প্রভাবিত রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন বিভাগ থেকে আসে পাঁচ মিলিঅন ডলার। মার্কিন বিশেষজ্ঞ বিরাট সংখ্যায় আমদানী হচ্ছে ইজরায়েলে।

ইজরায়েল হল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুর্গ। জিওনিস্টদের কাজ যে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বার্থেরই সেবা করা, তা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেইজন্যই শুরু থেকে প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পূর্ণ সমর্থন পাচ্ছে ইজরায়েল। জিওনিজম সক্রিয়ভাবে কাজ করতে শুরু করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত

মিলিয়ে। এখন তাকে চালাচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজস্ব স্বার্থ এবং আদর্শ অনুযায়ী। ইজরায়েলী শাসকচক্রের হঠকারী নীতি দেশকে নিয়ে চলেছে এক বিপজ্জনক পথে। তাকে পরিণত করেছে আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও জিওনিস্ট পুঁজির নিজস্ব এলাকায়। তেলআভিভের 'বাজপাখিদের' ইন্ধন যুগিয়ে আন্তর্জাতিক জিওনিজম ও মার্কিন শাসকচক্র মধ্যপ্রাচ্যের দেশ-গুলিতে উপনিবেশিক ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট। ইজরায়েলী শাসকচক্রের সম্প্রসারণবাদী নীতি এবং আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে অব্যাহত আগ্রাসন ইজরায়েলী জনগণ ও অন্য কোন ইহুদি স্বার্থকে পূরণ করে না। তা সংঘটিত সম্পূর্ণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের যোগ-সাজসেই, মুলত মার্কিন স্বার্থে। ইজরায়েলের আগ্রাসীপন্থাকে বিশ্ব জনমত ক্রমেই বেশি করে নিন্দা করছে। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্য-বাদের বীভৎস ষড়যন্ত্র তেলআভিভের ভূমিকা যখন আরো বেশি করে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে তখন জিওনিস্টরা স্থির করেছে যে তাদের কূট তৎপরতার পক্ষে এটাই হল প্রশস্ত সময়। জিওনিস্ট নেতারা যতই ছল-চাতুরি করুক না কেন, পৃথিবীর মানুষ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন যে জিওনিজমকে প্রয়োগ করা হচ্ছে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একটি হাতিয়ার হিসাবে। মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের প্রত্যক্ষ সমর্থকরূপে ইজ-রায়েলের ভূমিকা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির প্রতি জিওনিজমের বর্বর ঘৃণা থেকেই তা সবচেয়ে ভালোভাবে প্রমাণিত।

অথচ ইহুদি ধর্মমতে বলা হচ্ছে: "বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর, ক্লান্তি নেই তাঁর, অবসাদ নেই। শক্তির আধার তিনি, দুর্বলকে শক্তি দান করেন। বিশ্ব মানবের ন্যায়নিষ্ঠ তিনি, কিন্তু আব্রাহামের বংশধর ইজরায়েল সন্তানেরাই তাঁর বিশেষ কৃপার পাত্র—তাঁর ভৃত্য, তাঁর নির্বাচিত। তাঁর চিত্তের হর্ষবর্ধন করে এই ইহুদি জাতি। ইহুদিরাই জগতের অন্যান্য জাতিকে আলো হাতে অন্ধকারে পথ

দেখিয়ে নিয়ে যাবে।" কিন্তু মানববিদ্বেষ, হিংসা এবং উন্নাসিক জীবনধারার এক বিকৃতরূপ আজ প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে ইজরায়েলে।

আনুষ্ঠানিক ও আইনগত দিক থেকে ইজরায়েল একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ সংস্থা হল নেসেত (পার্লামেণ্ট)। প্রধান রাজনৈতিক দল লেবার পার্টি, ন্যাশনাল রিলিজিয়াস পার্টি, আপুদা রিলিজিয়াস ফ্রণ্ট, লিকুদ ব্লক। নেসেতের নির্বাচন হয় চার বছর অন্তর—গোপন ভোটে। অবশ্য এই নির্বাচন হয় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে। নেসেতের সংখ্যাগরিষ্ঠরা পাঁচ বছর অন্তর রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেন। আসলে রাষ্ট্রক্ষমতা নেসেতের বা গোটা সরকারের হাতেও নেই। ক্ষুদ্র এক মন্ত্রিগোষ্ঠির এবং প্রধানমন্ত্রির ঘনিষ্ঠ ও অত্যন্ত বিশ্বস্ত কিছু অসামরিক ব্যক্তি ও সামরিক নেতাদের হাতে সমগ্র দেশের কর্তৃত্বভার। প্যারিসের ক্যাথলিক সাপ্তাহিক তেময়নাগে ক্রেতিয়ে ১৯৫১ খৃঃ জানুআরি মাসের একটি সংখ্যায় মন্তব্য করে: "তথাকথিত সমন্বয় সাধন কমিটির অতি গোপনীয় বৈঠক দিয়েই জেরুজালেমে সব কিছু আরম্ভ হয়। এটা হোল ইজরায়েলী সরকার এবং ইহুদি এজেন্সির * মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারণ অধিবেশনগুলিতে যোগদানকারীদের অর্ধেক হলেন এজেন্সির প্রতিনিধিত্বকারী, বাকি অর্ধেক সরকারের প্রতিনিধি; তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী হলেন কমিটির স্থায়ী সদস্যদের অন্যতম।" এই কমিটির বৈঠকে শুধু শীর্ষ-স্থানীয় ইজরায়েলী নেতারাই যোগদান করেন না, আন্তর্জাতিক ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী কর্তারাও যোগ দেন; কমিটির বৈঠক "অনুষ্ঠিত হয় প্রতি মাসে এবং বৈঠকে স্থির হয়, কি করা হবে এবং তা কার্যকর করার ভার থাকবে কার ওপর......"

সম্প্রতিকালে ইজরায়েলে বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সংকট তীব্র হয়ে উঠেছে। সতর্কতার সঙ্গে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করা

---

* ইহুদি এজেন্সি—বিশ্ব ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী সংস্থা (ডব্লু. জেড. ও)

হলেও তা গোপন রাখা সম্ভব হচ্ছে না। ইজরায়েলের লেখক বি, আকজিন পর্যন্ত স্বীকার করেছেন যে, মন্ত্রিসভাই "হল নেসেতের কাজকর্ম পরিচালনাকারী সংস্থা। তাই শাসন-বিভাগীয় ক্ষমতা…… এবং আইন বিভাগের ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলির ওপর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সরকারই প্রয়োগ করে থাকে। পররাষ্ট্র নীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, সামরিক বাজেট এবং বাজেটের রাজস্বের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিতে সরকারের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে নেসেতের ক্ষমতা নেই। একমাত্র আর্থিক কর্মনীতির বেলায় রয়েছে সরকারের পূর্ণ স্বাধীনতা।"

গঠন বিন্যাস এবং ব্যবহারিক কার্যকলাপ উভয় দিক থেকেই নেসেত পুরোপুরি একটি প্রতিক্রিয়াশীল সংস্থা। তা বিশ্বস্তভাবে ইজরায়েলী বুর্জোয়া ও আন্তর্জাতিক ইহুদি-স্বাতন্ত্র্যবাদের সেবারত। এক শত কুড়িজন সদস্যের মধ্যে নেসেতে রয়েছেন বামপন্থী বিরোধী পক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র তিনজন কমিউনিস্ট এবং আর অল্প কয়েকজন প্রগতিশীল সদস্য। তেলআভিভের শাসকচক্রে সংসদের এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ করে গৌণ সংস্থায় রূপান্তরিত করার প্রয়াসের অন্যতম উদ্দেশ্য, প্রগতিশীল সদস্যরা যাতে সরকারের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কর্মনীতির স্বরূপ উন্মোচিত করতে সংসদীয় মঞ্চকে কাজে না লাগাতে পারে।

সরকারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, জরুরী ধরণের ডিক্রিজারী করার অধিকার প্রদত্ত হলে, সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার উদ্দেশ্যই সিদ্ধ করবে। অসংখ্য সরকারী কমিশন গঠন করে তাদের হাতে "মন্ত্রিসভা বিপুল ক্ষমতা প্রদান করে এবং কমিশনগুলি অর্থনৈতিক কর্মনীতি, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে এক একটি কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি হিসাবে কাজ করে।" এই ব্যাপারটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রধানমন্ত্রী ইজরায়েল রাষ্ট্রের এবং তার সামাজিক রাজনৈতিক

জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আর সময় সময় তাঁর হাতে প্রকৃতই একনায়কসুলভ ক্ষমতা থাকে। প্রধানমন্ত্রির হাতে ব্যাপক ক্ষমতা থাকায় এবং আন্তর্জাতিক ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী মহলের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ও অপর কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী দেশের সরকারী মহলের অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য ইজরায়েলী মন্ত্রিসভার প্রধান, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও প্রশাসনের সমস্ত যোগসূত্রগুলি নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে এবং দেশের গোটা জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম।

তেলআভিভে ইজরায়েলী ইতিহাসবিদ অধ্যাপক আই, আরিয়েলি এক বক্তৃতায় ১৯৫৫ খৃঃ জানুআরিতে খোলাখুলি ভাবেই 'বৃহৎ ইজরায়েল' ভাবাদর্শের সঙ্গে ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শের তুলনা করেন। ইজরায়েলে সকলেরইশ্রদ্ধার পাত্রঅধ্যাপক ই, লেইবোউইজ লেখেন: 'দেশ দখল আমাদের পরিণত করছে কারাপাল, আমলা ও পুলিসের বিশেষত্ব সম্পন্ন জাতিতে।......আজ আমরা বাড়ীঘর ধ্বংস করছি। আগামীকাল বাধ্য হব বন্দী-শিবির খুলতে এবং কে জানে হয়ত বা ফাঁসীকাষ্ঠও বসাতে হবে।...আমরা অগ্রসর হচ্ছি দক্ষিণ ভিয়েত-নামের দিকে, আর সেটা সরকারের কোন কোন সদস্য জানেনও।..." ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদ সম্পর্কে গবেষণারত এন, ওয়েইনস্টক তার 'জিওনিজম এগেনস্ট ইজরায়েল' গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ইজরায়েলে এখনকার বাস্তব অবস্থা 'সেখানকার শাসন ব্যবস্থার দ্রুত ফ্যাসিস্ত রূপান্তরণের বিপদই সূচিত করছে।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রগতিশীল যুবসমাজের অন্যতম নেতা এবং ১৯৫৮ খৃঃ ডেমোক্রেটিক পার্টির কনভেনশনের সময় গোলমালের ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে অভিযুক্ত চিকাগোর 'আটজনের' অন্যতম জেরি রুবিন ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্যে বলেন: "ইজ-রায়েল সফর থেকেই এর সূত্রপাত, এই সফরে আমার ভ্রান্তিগুলি দূর হয়ে যায়। এক আদর্শ দেশের সন্ধানে আমি সেখানে

গিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম ছোটখাট এক আমেরিকা। সেইজন্যই আমি ইজরায়েল-বিরোধী এবং আরব-সমর্থক হয়েছি।"

ইজরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম ভিলনার একটি ভাষণে বলেন: "তীব্র জাত্যাভিমান ও যুদ্ধ উন্মাদনার পরিমণ্ডল ইজরায়েলের শ্রমিক আন্দোলন এবং তার সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে দক্ষিণাভিমুখে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। সমস্ত ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী দলগুলিকে যুদ্ধ ও ভূখণ্ড সম্প্রসারণের কর্মনীতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে এই বারই সর্ব প্রথম ইজরায়েলে একটি সরকার গঠিত হয়েছে। চরম প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা সরকারের মধ্যে ও তার বাইরে নিজেদের প্রতিষ্ঠা শক্তিশালী করেছে।" ১৯৫০ খৃঃ আগস্ট মাসে চরম দক্ষিণপন্থী 'গহল' জোট (প্রতিক্রিয়াশীল ও ফ্যাসিস্ত পন্থী পার্টি 'হেরুথ' এবং ইজরায়েলে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাকারী লিবারেল পার্টির মিলিত জোট) সরকার থেকে বেরিয়ে এলেও গোল্ডা মেয়ারের মন্ত্রিসভা আগের মতই প্রতিক্রিয়াশীল থেকে গেছে।

"জিওনিস্টদের বর্ণ-বৈষম্যবাদী ধ্যান ধারণা বর্ণবিদ্বেষমূলক নাৎসী 'তত্ত্বেরই' অনুকরণ করছে এবং ইজরায়েলে এই ধ্যান ধারণার যুক্তি-সম্মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটান হয়েছে। কোন ব্যক্তি ইহুদি জাতির কি না তা নির্ভর করবে বর্ণগত বৈশিষ্ট্য ও গোঁড়া জুডাইজমের ওপর এই মর্মে সম্প্রতি নেসেতে (সংসদ) একটি আইন গৃহীত হয়েছে।"

জিওনিস্ট শাসকদের অনুসৃত নীতিরই প্রত্যক্ষ ফল হল ইজরায়েলে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও বৃদ্ধি। এই নীতির ভিত্তি আগ্রাসন আর পর রাজ্য জয়, সমরবাদ ও যুদ্ধোন্মাদনা, আরব জনসমষ্টি বিতাড়ন ও তাদের ওপর নির্যাতন। ইজরায়েলে প্রচলিত জিওনিস্ট মতাদর্শ থেকেই বর্ণ বিদ্বেষ, উগ্র জাত্যাভিমান ও কমিউনিজম বিরোধিতা— সর্বোপরি ফ্যাসিবাদের উন্মেষ।

'হুঁশিয়ার! ঝটিকা বাহিনী ইজরায়েলে আসছে।' ইজরায়েলে

ফ্যাসিস্ত সংগঠন সমূহের বৃদ্ধি সম্পর্কে তেলআভিভের সাপ্তাহিক হাওলাম হাজের একটি সংখ্যায় ওপরোক্ত শিরোনামে একটি আলোচনা বেরোয়। উগ্র প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠন হিসাবে হেরাত, বেইতার, ইহুদি রক্ষা লীগ, এরিএল এবং ডি, বি, ছাড়াও কয়েকটি সংগঠন গড়ে ওঠে। দিকুই বোগদিম এর আদ্যাক্ষর ডি, বি। যেসব ইহুদি জিওনিজমের বিরোধিতা করে অথবা সরকারের সম্প্রসারণ নীতির বিরোধী অথবা আরব ভূখণ্ড থেকে অপসারণ অথবা মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির পক্ষপাতী, তারা সকলেই বর্তমান শাসকগোষ্ঠির চোখে বিশ্বাসঘাতক।

হেরাত, বেইতার ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ত জিওনিস্ট সংগঠন ও গোষ্ঠিকে ইজরায়েল ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য পশ্চিমদেশে দেখা যায়। এরা সকলেই বিশ্ব জিওনিস্ট সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত। আর এদের আক্রমণকারী শক্তি হল ইহুদি রক্ষা লীগ। এই লীগের ফুয়েবার মেয়ার কাহানে ইজরায়েলে একদল গুণ্ডা শ্রেণীর লোক পাঠায় স্থানীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের উপযোগী কাজকারবারের জন্য। হাওলাম হাজে পত্রিকা সম্ভবত এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে।

একাত্তরের মার্চ মাসের শেষে ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র জো হাদেরেখ দপ্তরে হানা দেয় একদল ফ্যাসিস্ত চর। দপ্তরের জিনিসপত্র তছনছ করে, একজন মহিলা কর্মচারীকে মারধরও করা হয়! দেওয়ালে স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে দেয়। অবশ্য কর্তৃপক্ষ এই হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। তবে ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলিই তেলআভিভের লুঠেরা নীতি ও জিওনিজমের সবচেয়ে নিষ্ঠাবান প্রবক্তা, একথা বিবেচনা করে দেখলে ব্যাপারটা মোটেই বিস্ময়কর নয়। বস্তুত, ইজরায়েলিরা যখন শান্তির দাবী তোলে এবং গোলডা মেয়ারের সরকারকে নিরাপত্তা পরিষদের নভেম্বর মাসের প্রস্তাব মেনে চলতে রাজী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে সভা-সমাবেশ করেন, তখন স্থানীয় ফ্যাসিস্তরাই সে সমস্ত সভা-সমাবেশ ভাঙতে

সাহায্য করে পুলিশকে। এশিয়া ও আফ্রিকার ইহুদিদের যে বর্ণ-বৈষম্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে রাখা হয়, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যখন তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, তখনই এই ফ্যাসিস্তরা তাদের ওপর হামলা চালায়।

ফরাসী সাময়িক পত্র লে মন্দে ডিপ্লোমাতিক ইজরায়েল সম্পর্কে মন্তব্য করে, "ব্যক্তি-জীবনে এবং জাতীয় আর্থ ব্যবস্থা উভয় ক্ষেত্রেই সৈন্য বাহিনীর প্রভাব চূড়ান্ত……যুদ্ধ পরিবেশের প্রভাব দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় অত্যন্ত প্রবল… …।" আয়তনের তুলনায় দেশটির সৈন্য-সংখ্যা বিপুল। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে রয়েছে অসংখ্য সামরিক ও আধা-সামরিক সংগঠন। ইজরায়েল হল বিশ্বের একমাত্র দেশ যেখানে শান্তির সময়েও মহিলাদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণে বাধ্য করা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ আগ্রাসনের পর সামরিক কর্তৃপক্ষ ষোল থেকে সতের বছরের সমস্ত যুবককে সেনাবাহিনীতে নিয়োগের অধিকার পায়। পুরুষরা তিন বছর এবং মহিলারা কুড়ি মাস সেনাবাহিনীতে যুক্ত থাকতে বাধ্য। সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষ উনপঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এবং নারীরা চৌত্রিশ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত বাহিনীতে যুক্ত থাকে। প্রত্যেককে বছরে কয়েকদিন অথবা কয়েকমাস অতিরিক্ত সামরিক শিক্ষা নিতে হয়।

সেনাবাহিনীতে জন-শক্তি সমবেত করার ক্ষেত্রে ইজরায়েল তার সমগ্র জনসংখ্যার দশ শতাংশকে (তিন লক্ষ) নিয়োজিত করতে সক্ষম। এই হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। ইজরায়েলী শ্রমমন্ত্রী মাই পার্টির নেতা জে, আলমোগি বলেন, প্রয়োজনবোধে দেশরক্ষায় আট লক্ষ দশ হাজার মানুষকে নিয়োগ সম্ভব। ইজরায়েলের সীমান্ত অঞ্চলে আছে নাহাল বাহিনী (লড়ুয়ে যুবসমাজ)। ১৯৫০ খৃঃ এটি গঠিত হয়। সম্পূর্ণ সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত এই ধরণের বহু সংগঠন আছে। এরা অবশ্য সামরিক বাহিনীর অংশ। নাহালে যোগদানকারী যুবকেরা সৈন্যবাহিনীতে কাজ করার উপযুক্ত। এরা অধিকৃত আরব

ভূখণ্ডে উপনিবেশ স্থাপন এবং খামারের কাজ করে। সংগঠনটি অন্তর্ঘাতমূলক কাজে লিপ্ত থাকে। নাহাল বাহিনীতে আছে ত্রিশ হাজারেরও বেশী যুবক।

আধা সামরিক সংগঠন গাদনার আছে নিজস্ব বিমান বাহিনী এবং নৌবহর। বিভিন্ন ব্যাটেলিআনে বিভক্ত গাদনা। সংগঠনটি শিক্ষা ও প্রতিরক্ষা উভয় মন্ত্রকেরই অধীন। চৌদ্দ থেকে আঠার বছর বয়সের স্কুলের ছেলেমেয়ে এবং যুবসমাজকে এরা সামরিক শিক্ষা দেয়। আবার যুব সমাজের মগজ ধোলাই-এর কাজও করে। যুব সমাজকে গড়ে তোলা হচ্ছে ডায়ানের ভাবমূর্তিতে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে বছরে দুশ বাহাত্তর ঘণ্টা সামরিক শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সমরবাদ ও জাত্যাভিমান জাগিয়ে তোলে গাদনা। যাবতীয় প্রগতিশীল কাজকর্ম এবং আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব গড়ে তোলে। এদের সামনে রয়েছে সরকারী প্রধান এবং লেবার মাই পার্টির নেতা গোল্ডা মেয়ারের বক্তব্য: "আমি চাই না যে ইহুদি জনগণ কোমলভাব বিশিষ্ট, উদারনৈতিক উপনিবেশবাদ বিরোধী ও সমরবাদ বিরোধী মনোভাবাপন্ন হন......।"

বলপ্রয়োগের রাষ্ট্রযন্ত্রে সীমান্তের উপকূলভাগের অসামরিক পুলিশ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। পুলিশবাহিনী প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আর সীমান্ত পুলিশ বাহিনী আসলে সামরিক বাহিনীর অংশ। ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় জীবনে পুলিশের রয়েছে স্বয়ংশাসনের বিপুল ক্ষমতা। ধর্মঘট, মিছিল নির্মমভাবে দমন করে। প্রগতিশীল ইজরায়েলী নাগরিকদের নির্যাতনের অবধি নেই।

দেশের সশস্ত্রবাহিনী এবং আধা সামরিক সংগঠনগুলির সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র জেনারেল স্টাফের অধীন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজরায়েলী গোয়েন্দা বিভাগ এবং জেনারেল স্টাফ সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ মুক্তই শুধু নয়, সরকারী নির্দেশ ছাড়াও তারা কাজ করতে পারে।

জেনারেল স্টাফ কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞাতসারেই আরব ভূখণ্ডে শাস্তিমূলক অভিযান চালায়। তাছাড়া ১৯৫৮ খৃঃ সমগ্র ইজরায়েল বা কোন অংশ বিশেষকে নিরাপত্তা অঞ্চল ঘোষণার অধিকার দেওয়া হয় জেনারেল স্টাফকে।

হা আরেৎজ সংবাদপত্রে ১৯৫০ খৃঃ প্রকাশিত হয়, দেশের আর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন মূলপদ চোদ্দহাজার অবসর প্রাপ্ত অফিসার ও জেনারেল অধিকার করে আছে। ইজরায়েলের বিজ্ঞানী এ. পার্লমুটের বলেন অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ও অফিসারদের শতকরা ৩৭'৬ ভাগ মন্ত্রিসভায় কাজ করেন। এমন কি কয়েকজন আছেন গুরুত্বপূর্ণ পদে। রাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে ১২'২ ভাগ এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ২২'৫ ভাগ ইজরায়েলী অবসর প্রাপ্ত জেনারেল ও অফিসার কর্মরত। ১৯৫৫ খৃঃ মোশে ডায়ান 'লোনা' প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর নিযুক্ত হন। ইজরায়েলী প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল এইচ. হেরজোগ ব্রিটিশ শিল্পপতি উলফ্‌সনের স্থানীয় কারবারগুলি দেখাশোনা করেন। এই ভদ্রলোক আবার হলেন রেডিও ইজরায়েলের ভাষ্যকারও। পূর্বেকার গুপ্তচর কর্ণেল হাভিস হয়েছেন কাইজার ফ্রাজের-এর সঙ্গে যুক্ত ইজরায়েলী প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর। রাষ্ট্রীয় বিমান 'এই-আই'-এর পরিচালকমণ্ডলীতে আছেন জেনারেল বেন-আরসি এবং তিনজন কর্ণেল।

এ থেকে স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায় ইজরায়েলের সশস্ত্র বাহিনী শুধুমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই নয়, আর্থ ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। সৈন্যবাহিনী ও শ্রমশিল্পের পরস্পর নির্ভরতা এবং অনুপ্রবেশ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। ১৯৫৭ খৃঃ আগ্রাসনের পর ইজরায়েলী আর্থনীতির ব্যাপক সামরিকীকরণ ঘটে। সামরিক শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটছে। ১৯৫১ খৃঃ ইজরায়েলের নয় লক্ষ ষাট হাজার শ্রমিক ও অফিস কর্মীর মধ্যে দু'লক্ষ সমর শিল্পে কর্মরত ছিল। বিদেশী সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে দেশ জুড়ে যুদ্ধ

শিল্পোদ্যোগ। এখানে বর্তমানে নির্মিত হচ্ছে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ। তার মধ্যে আছে জেটবিমান, ক্ষেপণাস্ত্র, বিভিন্ন ধরণের আগ্নেয়াস্ত্র, মর্টার এবং আরো অনেক কিছু। আর্থব্যবস্থায় সামরিক ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত হওয়ায় দেশের রাজনৈতিক জীবনে সামরিক শ্রেণীর লোকজনের প্রভাব প্রতিপত্তি আরো বেড়ে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ব্যক্তিগত মালিকদের কাছ থেকে তাদের কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান কিনতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে বিদেশে বিমান ও অন্যান্য কারখানা ক্রয় করছে। কিন্তু সমগ্রভাবে তাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রটি সংকুচিত হচ্ছে।

ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মেয়ার ভিলনার ১৯৫২ খঃ একটি ভাষণে উল্লেখ করেছেন: "শাসকদের ইচ্ছানুসারে ইজরায়েল যুদ্ধোন্মাদনার আবহাওয়ার মধ্যে বাস করে চলেছে। ১৯৫৬ খঃ সরকারী সামরিক ব্যয় দাঁড়িয়েছিল ৯২০ কোটি ইজরায়েলী পাউণ্ড। ১৯৫১ খঃ এই ব্যয় বেড়ে পৌঁছিয়েছে ৭০০ কোটি ইজরায়েলী পাউণ্ডের বিরাট অংকে অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বাজেটের অর্ধেকের মত বা মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশে। ১৯৫৭ খৃঃ ইজরায়েলের বিদেশী ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১৬০ কোটি ডলার। ১৯৫১ খঃ শেষ দিকে এই ঋণ বেড়ে দাঁড়ায় ৩৬০ কোটি ডলার। এখন ইজরায়েলের মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে। এর মূল কারণ হল বিপুল সামরিক ব্যয় যা রাষ্ট্রীয় বাজেটে ঘাটতি স্থায়ী করে তুলেছে।

"ইজরায়েলে জীবনযাত্রার ব্যয় অভূতপূর্ব অনুপাতে বেড়েছে। ১৯৫৯ খৃঃ জিনিসপত্রের দর বেড়েছিল ৪ শতাংশ, ১৯৫০ খৃঃ ১২ এবং ১৯৫১ খৃঃ বাড়ে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। সম্প্রতি কয়েক মাসে খাদ্যের দর আবার দারুণ বেড়ে গেছে। বাড়ীভাড়া আকাশ-ছোঁয়া। সামরিক ব্যয় ভার অসহনীয় হয়ে উঠেছে। এর ফলে একদিকে প্রকৃত মজুরী কমে গেছে এবং অন্য দিকে যুদ্ধ হলেই যারা খুশী হয় সেই পুঁজি-বাদীদের মুনাফা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে।

"শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামে বাধা সৃষ্টির জন্য সরকার নেসেভে ধর্মঘটের স্বাধীনতা সংকুচিত করে এবং বহু শিল্প ও জনকৃত্যকে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে শ্রমিক বিরোধী আইন পাশ করিয়ে নিয়েছেন। এসব সত্বেও ধর্মঘটের ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠছে। সরকারের শ্রমিক বিরোধী আইন এবং শ্রমিক সংক্রান্ত প্রশ্ন আদালতের রায় মানতে অনিচ্ছুক শ্রমজীবী জনগণ নির্ভীকভাবে তাদের অধিকার দাবি করছে।

"শ্রেণীসংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ ও সরকারী কর্মনীতির মধ্যে বিরোধিতা বৃদ্ধির প্রমাণ। এসব থেকে শ্রমজীবী জনগণের এই উপলব্ধি হচ্ছে যে, জীবনযাত্রার মানের অবনতি এবং সামাজিক ও ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর সরকারের দখলদারি কর্মনীতির, স্থানীয় ও বিদেশী বৃহৎ পুঁজিকে সেবা করার কর্মনীতির ফল। জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাওয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম যে শান্তির জন্য সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত এই চেতনা ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যক শ্রমিকের মনে জাগছে।"

দরের সূচকের মাসিক বৃদ্ধি সংক্রান্ত ইজরায়েলের সরকারী তথ্যাদিতে জানা যায় যে, তিয়াত্তরের মে মাসের গোড়ার দিকে দর বেড়েছিল ৩.৯ শতাংশ। কুড়ি বছরের মধ্যে এত দর বৃদ্ধি কখনও ঘটেনি। তিয়াত্তরের প্রথম চার মাসে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ৯.৫ শতাংশ। তার আগের বছরে জীবনযাত্রার ব্যয় তের শতাংশ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইজরায়েলী জনগণের ওপর প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। সবচেয়ে সস্তা মাংসের দাম হল এখন প্রতি পাউণ্ড ২.৪ ডলার এবং ইনস্ট্যান্ট কফির দাম প্রতি পাউণ্ড চার ডলার। পেট্রোলের দর আশী শতাংশ বেড়েছে। আর একটি য়ুরোপীয় মোটর গাড়ীর দাম দাঁড়িয়েছে পাঁচ হাজার ডলার। এপ্রিল মাসের শেষ দিকে খুচরা দরের সূচক মার্চ মাসের ১৫০.৫ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৫৬.৩ (১৯৪৯ খৃঃ দরের স্তরকে ১০০ ধরে)। ইজরায়েলের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী হাইম বারলেভ

সম্প্রতি বলেছেন যে, সরকার দরবৃদ্ধি বন্ধ করার কথা ভাবছেন, তবে তিনি একথাও বলেন যে, "দর নিয়ন্ত্রণ মুদ্রাস্ফীতি রোধ করতে পারে না।"

মার্কিন কংগ্রেসের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইজরায়েল হল পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী রাষ্ট্র। ইজরায়েলে বাজেটের শতকরা ৪১ ভাগ খরচ হয় সামরিক খাতে। ১৯৪১ খৃঃ বাজেটে এরকম খরচই হয়েছিল। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনতে ইজরায়েলের বৈদেশিক ঋণ দ্রুত বেড়েই চলেছে। ১৯৪১ খৃঃ বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ২১০ কোটি ডলার। ১৯৪৩ খৃঃ এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪১০ কোটি ডলার। মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণও সবচেয়ে বেশী।

নেসেতে উত্থাপিত ১৯৪৩-৪৪ আর্থ বছরের বাজেটে সামরিক খাতে বরাদ্দের পরিমাণ আবও বেড়ে গেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ৬'১২ হাজার ইজরায়েলী পাউণ্ড পেয়ে উৎফুল্ল। এই বছরে অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধবিমান ক্রয়ে ব্যয়ের পরিমাণ ৭৪০ মিলিয়ন ডলার। পরের বছর মোট বৈষয়িক উৎপাদনের ১৯'৮ শতাংশ যাবে সামরিক খাতে।

তেলআভিভের মাথা-পিছু সামরিক ব্যয়ও পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী। প্রতিদিন সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যয় হয় ত্রিশ লক্ষ ডলার। ইজরায়েলী অর্থমন্ত্রী শ্যাপিরের ভাষণ থেকে জানা যায়, ১৯৪৭ খৃঃ আগ্রাসনেব পর তিন হাজার সাতশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় অস্ত্রশস্ত্র কিনতে। শ্যাপিরের বক্তব্যে প্রকাশ গত দশ বছরে

ইজরায়েল সামরিক ক্ষেত্রে খরচ করেছে ছয় হাজার মিলিঅন ডলার। আর মধ্যপ্রাচ্যে যদি কোন শান্তি চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয়, তাহলেও আগামী দশ বছরে সামরিক ক্ষেত্রে ব্যয়ের পরিমাণ হবে ষাট শতাংশেরও বেশী।

এই বিপুল পরিমাণ অর্থের উৎস কোথায়? সামরিক খাতে এই বিপুল ব্যয় জোগায় কারা? প্রথমেই বলা দরকার, ইজরায়েলী শাসকচক্র কর বাড়িয়েছে প্রচণ্ড ভাবে। কর বহন করে শ্রমজীবী জনগণ। তাদের পকেট থেকেই ইজরায়েলের রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি আসে। সরকারী তথ্য থেকে জানা যায়, শ্রমিকদের মজুরির ষাট শতাংশ গ্রাস করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। দখল করা আরব অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে তেলআভিভ প্রচুর অর্থ পায়। কোন কোন হিসাব অনুযায়ী এর পরিমাণ পঁচিশ কোটি ডলার। শুধু সিনাই-এর তৈলক্ষেত্র থেকেই ইজরায়েলের কোষাগারে প্রতিদিন জমা পড়ে এক লক্ষ ডলারের বেশি।

আগ্রাসী কার্যকলাপ চালাবার জন্য ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ ভাড়াটে সৈন্য আমদানী করছে বিভিন্ন বন্ধু দেশ থেকে। ভাড়াটে সৈন্যরা আসে ফ্রান্স, ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল থেকে—বিশেষ-করে যে সব দেশে আন্তর্জাতিক জিওনিজমের কাজকর্ম বহু বিস্তৃত। ফাইন্যানসিয়াল টাইমস (ব্রিটেন) লেখে যে, ইজরায়েলী বাণিজ্য জাহাজগুলির তিন ভাগের একভাগই হল বিদেশী ভাড়াটে। তাদের অধিকাংশই কাজ করে অবশ্য অফিসার পর্যায়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে ইজরায়েলী বৈমানিক ও ট্যাঙ্ক চালকেরা হল আমেরিকা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্য পুঁজি-বাদী দেশ থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক। ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির পলিটিক্যাল ব্যুরোর সদস্য এমিল তোমার বিবরণ থেকে জানা যায়, ১৯৪৮ খৃঃ প্যালেস্টাইনে আরবদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় ইজ-রায়েল পঁচিশ শত বিদেশী স্বেচ্ছাসেবককে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ

করেছিল। লেফটেন্যান্ট কর্ণেল এস, ও, রাওমেতি 'দি ইজরায়েলী ডিফেন্স ফোর্সেস' গ্রন্থে লিখেছেন এইসব স্বেচ্ছাসেবকরাই ইজরায়েলের বিমান ও নৌবাহিনীর শিক্ষাদান কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল।

আরব ভূখণ্ডে আচমকা আক্রমণকালে ১৯৪৭খৃঃ জুনে, এক হাজার মার্কিন বৈমানিক ও নৌচালক ইজরায়েলে আসে। এরা য়ুরোপ ও অন্যান্য দেশে মার্কিন বাহিনীর সংগে যুক্ত ছিল দীর্ঘকাল। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রাক্ মুহূর্তে, পশ্চিমদেশীয় অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবক, বিশেষ-সামরিক প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষজ্ঞ ইজরায়েলে হাজির হয়েছিল। এই তথ্য দেয় পশ্চিমী সংবাদসূত্র। ইজরায়েলী বিমানবাহিনীর জন্য লোক সংগ্রহ উদ্দেশ্যে (বিশেষ করে বৈমানিক) আমেরিকায় নিয়োগ-কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। নিয়মিত বেতন ছাড়াও, প্রতিটি সফল অভিযানের জন্য এদের বোনাস দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৪৭ খৃঃ যুদ্ধে ইজরায়েলী বিমানবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের মূলে ছিল মার্কিন বৈমানিকদের অবদান। সুইডিশ সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়ঃ "......১৯২ জন আমেরিকান ইজরায়েলী বিমান চালায়, যারা ইজরায়েলে সরকারীভাবে এসেছিল ভ্রমণকারী হিসাবে।" পেন্টাগণের সম্মতি নিয়ে পশ্চিম জার্মানীতে অবস্থানকারী মার্কিন সৈন্যদের নিয়োগ ব্যাপারেও কয়েকটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানদেরও ইজরায়েলী বাহিনীতে নিয়োগ করা হয়। কয়েকটি পশ্চিম জার্মান শহরে নিয়োগ কেন্দ্র খোলা হয় এবং প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছিলেন ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর জেনারেল ডোরোন। পশ্চিম জার্মান সংবাদপত্র টেলিগ্রাফ থেকে জানা যায় (১৯৪৭ খৃঃ জুলাই) পশ্চিম জার্মানী থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের এগারটি দল ইজরায়েল বাহিনীতে যোগ দিতে অথবা অধিকৃত অঞ্চল উন্নয়নের কাজে অংশ নিতে যাত্রা করে। পশ্চিম জার্মান ভাড়াটে সৈন্য সংখ্যা গিয়ে পৌছায় তিন হাজারে।

ইজরায়েলকে প্রদত্ত মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্যের সঙ্গে মার্কিন জিওনিস্টদের অপরিসীম আনুকূল্যও স্মরণযোগ্য। ইজরায়েল রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রথম বছরগুলিতে বেসরকারী মার্কিন জিওনিস্ট উৎসগুলির মোট অর্থ সাহায্যের পরিমাণ পঁচিশ হাজার কোটি ডলার। ১৯৫১ খৃঃ প্রেরিত অর্থ পরিমাণ ছিল আশি কোটি ডলার।

সংযুক্ত ইহুদি আবেদন সংগঠন ১৯৫৫ খৃঃ ইজরায়েলের জন্য একশ কোটি ডলার সংগ্রহের সিদ্ধান্ত নেয়।

'ইজরায়েলের জন্য একশ দিন' অভিযানে সংগৃহীত হয় পঁচিশ লক্ষ গুলদেন। আমেরিকায় সংগঠিত জিওনিস্ট সংগঠনগুলির মধ্যে আছে: ইউনাইটেড জিয়ুস অ্যাপিল, আমেরিকান জিওনিস্ট কাউন্সিল, জিয়ুস এজেন্সি ফর ইজরায়েল, হাদাশা, জিওনিস্ট অর্গনাইজেসন অফ আমেরিকা, গোয়েলি জিওন, মিজরাহি অ্যাণ্ড হাসোয়েল হামিজরাহি, হাশোমের হাতজেইর, আচ্‌ুট হা-আভোডা-পোয়েলি জিওন, হেরুট হাতজোহার, দি আমেরিকান লীগ ফর ইজরায়েল, কারেন কাইমেত, কারেন হাইমোদ প্রভৃতি। এসবই হল বিশ্ব জিওনিস্ট সংগঠনের শাখা প্রশাখা। এই সংস্থানগুলি আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রথচাইল্‌ডস্‌ ও কুনলোয়েব গোষ্ঠী, শেল ও স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল অফ নিউজারসি, ইমপিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রি ও অন্যান্য একচেটিয়াপতিদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। একচেটিয়াপতিরা অকারণে উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের অর্থ যোগায় না। শ্রমজীবী ইহুদি জনগণের কাছ থেকে ভাঁওতা দিয়ে অথবা নিষ্পেষণের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করে জিওনিস্টরা। আর এই সব অর্থ যায় মার্কিন অস্ত্র নির্মাণ সংস্থাগুলিতে—ইজরায়েলে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহের মূল্য বাবদ। জিওনিস্ট ক্রোড়পতিদের আন্তর্জাতিক সম্মেলন একাধিকবার অনুষ্ঠিত হয়েছে ইজরায়েলে। এইসব সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে ইজরায়েলী অর্থনীতির সামরিকীকরণের চলতি ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা রচিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের আগ্রাসী কার্যকলাপে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিয়ে এসেছে। এবং আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দিয়েছে নিজেদের উপনিবেশবাদী লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য। সামরিক দিক থেকে পশ্চিম এশিয়া হল সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিপুল তৈল সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে, পশ্চিম এশিয়া হল য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে যোগাযোগের প্রাণকেন্দ্র। ইজরায়েলী আগ্রাসনের অথবা বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের কোন প্রতিবাদই জানায়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এমনকি নিহত মানুষদের জন্য শোক প্রকাশ পর্যন্ত করেনি; বরং নিরাপত্তা পরিষদে আগ্রাসকের সাহায্যে এগিয়ে এসে, মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। এসবই হল মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে ওয়াশিংটন কর্তৃপক্ষের সাধারণ নীতি। আমেরিকা ইজরায়েলকে পরিণত করেছে আক্রমণের একটা ঘাঁটিতে। এই ঘাঁটি স্থাপনের উদ্দেশ্য আরব জনগণের মুক্তি সংগ্রামে বাধা দেওয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা জীইয়ে রাখা। মার্কিন সরকার ইজরায়েলকে বছরে লক্ষ লক্ষ ডলার সাহায্য দেয়। আধুনিক সূক্ষ্ম সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে ইজরায়েলের সামরিক শক্তিকে সংহত করে যুদ্ধ সংক্রান্ত শিল্প সংগঠনে অন্যতম সহায়কে পরিণত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্রয়েই তেলআভিভের আচরণ উদ্ধত হয়ে উঠেছে: অধিকৃত আরব ভূখণ্ডকে নিজের বলে দাবী করে, মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং ১৯৬৭ খৃঃ ২২ নভেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে।

ইজরায়েলের সরকার প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় ১৯৪৮ খৃঃ থেকে ১৯৫৩ খৃঃ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে এগার বিলিঅন ডলার আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। আরব অর্থনীতিবিদদের হিসাবানুসারে ইজরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ চার হাজার মিলিঅন ডলার। ১৯৫৩ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের

জন্য ইজরায়েলকে পাঁচশত মিলিঅন ডলার ঋণ দেয়। আমেরিকা থেকে আসে চারশ পনের মিলিঅন ডলার, যা হল ১৯৫৩ খৃঃ তুলনায় একশ চুরাশি মিলিঅন, ডলার বেশী। ন্যাটো ও সিয়াটো সদস্যদের তুলনায় ইজরায়েলকে অধিক উন্নত যুদ্ধ বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রসরবরাহ করা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দিয়েছে ফ্যান্টম, স্কাইহক ও পাইলটহীন বিমান, ট্যাঙ্ক, হেলিকপটার, মাটি থেকে শূন্যে—শূন্য থেকে মাটিতে এবং অন্তরীক্ষ থেকে অন্তরীক্ষে ক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র। অদূর ভবিষ্যতে দেওয়া হবে পঞ্চাশ থেকে একশটি উন্নত ধরণের স্কাইহক বোমারু বিমান। তিয়াত্তরের মধ্যে আমেরিকা থেকে ইজরায়েলে এসেছে একশ কুড়িটি সুপারসনিক এফ-৪ ফ্যান্টম জঙ্গী বিমান। ছত্রিশটি নতুন স্কাইহকও পৌঁছে গেছে। বাইশ কোটি ডলারের অতিরিক্ত আটচল্লিশটি ফ্যান্টম চুয়াত্তরে সরবরাহ করা হবে। জেনারেল রবিনের মতে গত পাঁচ বছরে ইজরায়েলে মার্কিন সামরিক সাহায্য আগেকার কুড়ি বছরে প্রদত্ত মোট সাহায্য পরিমাণ থেকেও বেশী। বর্তমানে যে হারে মার্কিন কোম্পানিগুলি ইজরায়েলে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করছে ১৯৫৫ খৃঃ তার পরিমাণ দ্বিগুণ হবে। মার্কিন সেনাবাহিনী থেকে ত্রিশ হাজার ব্যক্তিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—যারা এখন ইজরায়েলী সেনাবাহিনীতে কর্মরত।

ইজরায়েলের প্রধান ঋণদাতা ওপৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে পশ্চিম জার্মান একচেটিয়া গোষ্ঠিগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। ইজরায়েলের অর্থনীতিতে তাদের প্রভাব এত ব্যাপক যে মার্কিন একচেটিয়া মহলের মুখপত্র ফরচুন জানায় পশ্চিম জার্মান মার্ক ইজরায়েলে যত নিবিড়ভাবে ব্যবহৃত, হয়, এমন আর কোথাও হয়নি। তেল আভিভের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের আশি থেকে নব্বই শতাংশই হল পশ্চিম জার্মান মার্ক। ১৯৪৮ খৃঃ থেকে কুড়ি বছরে জার্মান এক-চেটিয়াপতিদের সাহায্য পরিমাণ তের হাজার মিলিঅন জার্মান মার্ক।

জার্মান-ইজরায়েলী সহযোগিতার স্রোত ব্যাপ্ত হয় ১৯৫২ খৃঃ ১০ সেপ্টেম্বর সাক্ষরিত লুক্সেমবুর্গ চুক্তি অনুসারে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পশ্চিম জার্মান সরকার ইজরায়েলকে দেবে তিন হাজার মিলিঅন এবং সাড়ে চারশ মিলিঅন মার্ক। পশ্চিম জার্মানী থেকে কৃষি দ্রব্য, কাঠ নিষ্কাশন, পোশাকের কাপড়, রাসায়নিক ও ওষুধ, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, জাহাজ নির্মাণ, মোটরশিল্প এবং বিবিধ যুদ্ধ প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হয়েছে। চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টনের ষাটটি জাহাজ গেছে ইজরায়েলে পশ্চিম জার্মানী থেকে। এইসব জাহাজ পশ্চিম জার্মানীর তেরটি শিপইয়ার্ডে তৈরি।

লুক্সেমবুর্গ চুক্তি অনুসারে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ১৯৪৫ খৃঃ পশ্চিম জার্মানী উৎপাদিত দ্রব্য ইজ-রায়েলে আমদানী পরিমাণ ছিল ৪·৫ মিলিঅন মার্ক। দশ বছরে ১৯৫৫ খৃঃ এই পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ২৭৬ মিলিঅন মার্ক। এই বৃদ্ধির হার হল ৫,৭০০ শতাংশ (১৯৪৫ = ১০০)। ইজরায়েলে উৎপাদিত দ্রব্য পশ্চিম জার্মানী ১৯৫৫ খৃঃ আমদানী করে ৮·৩ মিলিঅন মার্ক এবং ১৯৫৫ খৃঃ বেড়ে হয় ২০৬ মিলিঅন মার্ক। ১৯৫৭ খৃঃ আগ্রাসনের পর ব্যবসায়িক লেনদেন বৃদ্ধি পায়। একটি পরিসংখ্যান দেওয়া হল :

পশ্চিম জার্মানীতে ইজরায়েলের রপ্তানী	পশ্চিম জার্মানীর ইজরায়েলে রপ্তানী
২০২·৩ মিলিঅন মার্ক	২১২·২ মিলিঅন মার্ক
২৭৬·৫ ”	৪৮১·১ ”
৩৩৮·৯ ”	৬১১·৪ ”
২৮২·৮ ”	৫৬৯·৪ ”

(জানুআরি-নভেম্বর)

ইজরায়েল থেকে পশ্চিম জার্মানীতে মোট রপ্তানীর পরিমাণ ১৯৫৯ খৃঃ পৌছায় ৩০৪ মিলিঅন মার্কে। পরের বছর এই পরিমাণ বেড়ে হয় ৩৪৭ মিলিঅন মার্ক। এই সময়ে ইজরায়েলে পশ্চিম জার্মানীর রপ্তানীর পরিমাণ ৬৩৮ মিলিঅন মার্ক থেকে ৭২৭ মিলিঅন মার্কে পৌছায়।

পশ্চিম জার্মানী থেকে ইজরায়েলে পাঁচশ মিলিঅন ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র গেছে। এর মধ্যে আছে ডিও-২৭ জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, হেলিকপটার, বিমানধ্বংসী কামান। ইজরায়েলী পাইলটদের ট্রেনিং চলে পশ্চিম জার্মানীতে। ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর কমপক্ষে দশ হাজার সৈন্য এবং অফিসারের আছে পশ্চিম জার্মান নাগরিকত্ব।

পশ্চিম জার্মানী হল মার্কিন সামরিক ঘাঁটি এবং ব্যাপকহারে গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র। এখান থেকে ফ্যাণ্টম জঙ্গী বিমান, বিমান বিধ্বংসী কামান ও গোলাবারুদ পাঠান হয় ইজরায়েলে।

মরুভূমিতে যুদ্ধ চালাবার উপযোগী সব ধরণের অস্ত্র ইজরায়েলকে সরবরাহ করেছে পশ্চিম জার্মানী। পশ্চিম জার্মানীর নতুন চূড়া ও কামানে সজ্জিত লিওপার্ড ট্যাঙ্কের ভূমিকা সিনাইযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য।

তাছাড়া ব্রিটেনের জিওনিস্ট পুঁজিও একটা বেশ বড়শক্তি। ডেইলি মেল পত্রিকায় লণ্ডনের স্যভয় হোটেলে এক ভোজসভার খবর বেরোয়। সেখানে চারশজন অতিথি ইজরায়েলী সাহায্য তহবিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কুড়ি লক্ষ স্টার্লিং পাউণ্ড সাহায্য দিয়েছিলেন। ভারী ট্যাঙ্ক, গোলা বারুদ, রাডার যন্ত্র, সাবমেরিন আসে ব্রিটেন থেকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী এবং ইণ্টারন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক তেলআভিভের পুনর্গঠন ও উন্নয়নে ১৯৫৭ খৃঃ থেকে ১৯৫৯ খৃঃ মধ্যে নয় হাজার মিলিঅন ডলার সাহায্য দেবে।

এক জিওনিস্ট সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের পোস্টার দেওয়া

সত্ত্বেও, শ্রেণীগত পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের ছিন্নবিচ্ছিন্নরূপ ইজরায়েলী জনগণের মধ্যে প্রকট হয়ে উঠছে। প্রায় অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাচ্ছে ১৩'৮ শতাংশ পরিবার। অপুষ্টিতে ভুগছে এক লক্ষ ষাট হাজার শিশু। এক পঞ্চমাংশ জনগণ ভয়াবহভাবে নিদারুণ দরিদ্র। সরকারী দরিদ্ররেখার নীচে আছে আটষট্টি হাজারেরও বেশী পরিবার। আর তেষট্টি হাজারেরও বেশী পরিবার আছে ঠিক এই রেখার সমানস্তরে। অথচ ইজরায়েলে বসবাসকারী নাগরিক পরিবারের সংখ্যা ছয় লক্ষ চোদ্দ হাজার। দারিদ্র্য রেখার সমানস্তরস্থিত পরিবারের লোকসংখ্যা পাঁচলক্ষ। এই সংখ্যা নাগরিক জন সমষ্টির একচতুর্থাংশ। 'শোচনীয়ভাবে জনসমষ্টির কুড়ি শতাংশ বেঁচে আছে ঠিক এই দরিদ্ররেখার সমানস্তরে অথবা নীচে'—অভিমতটি টাইম পত্রিকার।

একটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাভাবিক হল বহুবিভক্ত সমাজ। ইজরায়েলে আজ তা অতি বাস্তব। ইহুদি সংহতির কথা বাতুলতা মাত্র। শাসক ও শোষিত দুটি শ্রেণীস্বরূপ স্পষ্ট। ধর্মঘট, আন্দোলনে ইজরায়েলের সব কটি বড় বড় শহর মুখর। তিয়াত্তরের জানুআরিতে ব্যাপক ধর্মঘটে জনজীবন প্রায় অচল হয়ে পড়ে। বেতন বৃদ্ধির দাবীতে ত্রিশ হাজার ইঞ্জিনিয়ার ধর্মঘট করায় জানুআরির দুই তারিখে টেলিভিশন ও রেডিও থেকে কোন সংবাদ প্রচার সম্ভব হয়নি। এই ধর্মঘটের ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহও ব্যাহত হয়। বেতন বৃদ্ধির দাবীতে সরকারী হাসপাতালগুলির কর্মচারীরাও ধর্মঘট করে। নবগঠিত বন্দর কর্মচারী য়ুনিয়নের স্বীকৃতির দাবীতে ধর্মঘট আহ্বান করা হয় চব্বিশ ঘণ্টার জন্য।

ইজরায়েল প্রত্যাগত কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর্থার হার্ত্জবার্গের মতে বর্ণবৈষম্যবাদীনীতির দিক থেকে ইজরায়েল আর দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। তিনি বলেন "যেটা একেবারেই বোধগম্য নয়, তাহল ইজরায়েলী গরীবদের

অভাব অভিযোগের সঙ্গে ইজরায়েলী ধর্মীয় নেতৃত্ব, বুদ্ধিজীবী সমাজ ও সামগ্রিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহানুভূতি, বোধশক্তি ও সাজুয্যের অভাব।' ইহুদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সোল কুগেল-মাসের মতে 'ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ব্যবধান বেড়েই চলেছে তার প্রতি সরকার যথেষ্ট মনোযোগ দেয় নি।'

ইহুদি জনসমষ্টির মধ্যে বিরোধ সহজেই চোখে পড়ে। শ্বেতাঙ্গ ইহুদিরা কৃষ্ণাঙ্গ ইহুদিদের নানাভাবে শোষণ করে. দুর্ব্যবহার চালায়। শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ বিবাহ প্রায় নিষিদ্ধ। আশকেনাজি (জার্মান শব্দের হিব্রু) বলতে বোঝায় য়ুরোপীয় বংশোদ্ভুত ইহুদি। শেফার্ডি (স্প্যানিয়ার্ড শব্দের হিব্রু) বলতে বোঝায় আফ্রো-এশীয় বংশোদ্ভূত ইহুদি। মোট জনসংখ্যার বিয়াল্লিশ শতাংশ হল শেফার্ডি। এরা ইজরায়েলে নির্মম আচরণ পেয়ে থাকে। স্কুলপাঠ শেষ করেছে এমন শেফার্ডির সংখ্যা ষোল শতাংশ। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে এদের সংখ্যা তিন শতাংশ, ছাত্রদের মধ্যে পাঁচ শতাংশ, নেসেতে মাত্র কুড়ি শতাংশ। সরকারী অফিসের পর্যায়ে শেফার্ডির সংখ্যা মুষ্টিমেয়। স্বাধীন বৃত্তিজীবী খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর। শেফার্ডিরাই দেশের সব থেকে শ্রম-সাধ্য কাজ করলেও মজুরি পায় সব চেয়ে কম। কৌশলে এদের শ্রমশিক্ষার পথরোধ করে, অশিক্ষিত কর্মী পর্যায়ে ফেলে রাখা হয়েছে। দেশের সমগ্র শ্রমিক সমাজের উপার্জনের তিনভাগের একভাগ মাত্র পায় এরা।

সংখ্যালঘিষ্ঠ আরবদের বেলায় চালান হচ্ছে এক বর্ণবিদ্বেষী কর্মনীতি। তেলআভিভের পত্রিকা হারেৎজ ১৯৫৯ খৃঃ লেখে: "গত শতকে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের প্রতি যে আচরণ করা হত তার সঙ্গেই একমাত্র তুলনায় ইজরায়েলে আরবদের প্রতি ব্যবহার।" আরব বংশোদ্ভূত ইজরায়েলী নাগরিক এবং আইনজীবী এস জিরিস-এর "ইজরায়েলের আরবরা" বইখানি বেরুত থেকে বেরোবার পর,

তাকে জন জীবনে বিপদজনক ব্যক্তি হিসেবে আটক করা হয়। তিনি লেখেন যে, আরবদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাসংবলিত সাতশ পঞ্চাশটি আইন ইজরায়েলে প্রচলিত আছে। আগস্ট মাসে আটশ আরবকে অন্তরীণ করা হয়। জেলে ও বন্দী শিবিরে আছে আগুন্তি আরব। নির্যাতন কক্ষে আরবদের হত্যাও করা হয়। সাংবাদিক এম রুজভেন বলেন ইজরায়েলে রাজনৈতিক বন্দীকে আটক রাখার ঝামেলা থেকে সহজ মুক্তির পথ হল তাকে খুন করা। বিপদজনক ব্যক্তিদের গোপন বিচারের খবর ১৯৫৯ খৃঃ ব্রিটিশ ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী পত্রিকা জুইস অবজার্ভার প্রকাশ করে দেয়।

ইজরায়েলের মোট বেকার সংখ্যার অধিকাংশই আরব। সাধারণ নিয়মে এরা সব থেকে খারাপ ও কম মুজুরীর কাজ পায়। একশ পাঁচটি আরব অঞ্চলে কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। আরব প্রাথমিক বিত্তালয়ও নগণ্য। শিক্ষকের হারও তেমনি। ১'৫-২ শতাংশ হল উচ্চ শিক্ষায়তনে আরবদের সংখ্যা। দেশের তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আরব নাগারিক হল মোট নাগরিক সংখ্যার তের শতাংশ। অথচ প্রশাসনিক কাজে তাদের সংখ্যা ১'৫-১ শতাংশ। নেসেতে সাতজন মাত্র আরব প্রতিনিধি।

আরব জনগণের মত শেফার্ডিরাও আজ বুঝতে পেরেছে কী চূড়ান্ত বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়েছে তারা। জেরুজালেমে বিরাট বিক্ষোভ মিছিলে সরকার কিছুটা বিব্রত হয়ে পড়ে। এদের দাবী উপযুক্ত শিক্ষা, উন্নত বাসস্থান, উচ্চ বেতন, বৈষম্য দূরীকরণ। সরকার তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন। ভূতপূর্ব মাপাই, বর্তমান মাই পার্টির এক মরক্কো বংশোদ্ভুত ইহুদি নেতা বছর কয়েক আগে বলতে বাধ্য হয়েছেন : "তোমরা আমাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করছ। তোমরা ভুলে যেও না, লসএঞ্জেলস আর আলবামায় কি ঘটেছিল।"

উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীরা ইহুদিদের 'ঈশ্বর নির্বাচিত জাতি,'

'ইহুদীদের ইহুদিত্বে প্রত্যাবর্তন' প্রভৃতি শ্লোগান দিয়ে কৃত্রিমভাবে অন্যান্য জাতি থেকে এদের স্বতন্ত্র করার চেষ্টা চালায়। বিভিন্ন দেশে জনজীবনের সঙ্গে মিশে যাওয়া ইহুদিদের ওপর রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলে। প্রতিটি ইহুদির মন বর্ণবিদ্বেষে বিষাক্ত। মিশ্র-বিবাহ বন্ধের চেষ্টা চালান হয় সব থেকে বেশী। এ সম্পর্কে বেশ কিছু আইন জারি করেছে ইজরায়েলের ধর্মীয় পরিষদ। ইজরায়েলে মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদের কোন অধিকার নেই। এমন কি আদালতের কোন মামলায় তারা সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত থাকতে পারে না। ইজরায়েলে আগমনের আগে কোন ইহুদি যদি ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তা বাতিল বিবেচিত হয়। সেইসঙ্গে মিশ্র বিবাহের সন্তানেরা অবৈধ হিসাবেও গণ্য হয়। বিধবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ দেবরের অনুমতি ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাবার পর সন্তানদের বয়স ছয় বছর হলে, মায়েদের আর কোন অধিকার থাকে না সন্তানের ওপর।

বেশ কিছু ইহুদি সোভিয়েত নাগরিক ইজরায়েলে চলে গিয়েছিলেন ধর্মগত, না হয় ব্যক্তিগত কারণে। কিন্তু তাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যকের পক্ষে সেখানে থাকা সম্ভব হয়নি। তারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাদের কাছ থেকে জানা গেছে যে, দেশ ছাড়ার অনুমতি দেওয়ার আগে ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ দাবি করেন যে দেশত্যাগেচ্ছু কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত অর্থ হয় ফিরিয়ে দিতে হবে, না হয় কাজ করে শোধ করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও বেশ কিছু প্রতিবন্ধক আছে যার ফলে একটা আইনসম্মত দেশত্যাগ অসম্ভব হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য ভিসা পাওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। অন্যদিকে তরুণ-তরুণীদের দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ায় সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করা হয়। সেক্ষেত্রে যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া হয় তা এই: 'সামরিক কাজের জন্য তাদের দরকার.........।'

আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে তারা বলেছেন, সেখানে গিয়ে পৌঁছবার পর, তারা প্রথম ধাক্কা খান। বহিরাগতদের পুংখানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়। তারপর অত্যন্ত খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ চলে। কয়েক সপ্তাহ বাদে বহিরাগতদের সম্পত্তি ইজরায়েলে এসে পৌঁছতে থাকে, তখন কাষ্টমস হাউসে সবকিছু খুটিয়ে পরীক্ষা চলে। সব বাক্স খুলে জিনিসপত্র পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করা হয়, অনেক জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়, আরো কিছু অদৃশ্য হয়ে যায় 'পরীক্ষার' সময়। তারা দেখতে পেলেন যে কোন এক কারণে, সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নিয়ে আসা আসবাবপত্রের উপরে মোটা ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া হোল। একজন তো তাঁর টেলিভিশন সেটের উপরে চাপানো ট্যাক্সের দরুণ এত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন যে সেটিকে তিনি মেঝেতে আছড়ে ভেঙে ফেলেন।

এদের সবাই ইজরায়েলে এক বছরেরও কম সময় কাটিয়েছেন। কেউ কেউ কাটিয়েছেন দু-তিন মাসেরও কম। এদের সকলেরই ছিল একটিই ইচ্ছা সেই দেশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিত্যাগ করে ফিরে যাওয়া। তারা ইজরায়েলের পরিস্থিতি আর সহ্য করতে পারছিলেন না। বস্তুতঃ তাদের কোন অধিকারই ছিল না এবং তাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হত দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষের মত। তারা যেহেতু সেদেশের ভাষা বলতে পারতেন না, সেইজন্য তাদের দেওয়া হয়েছিল শুধু স্বল্প বেতনের চাকরি কিংবা কঠোর কায়িক শ্রমের কাজ। তাদের অধিকাংশের পক্ষেই ইজরায়েল থেকে পালিয়ে আসাটা ছিল দুরূহ ব্যাপার। এদের কারোরই পাশপোর্ট ছিল না, ছিল শুধু পাস। ইজরায়েলে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থের যারা প্রতিনিধিত্ব করেন সেই ফিনিশ কন্স্যুলেটে যারা দেখা করতে যান, তাদের প্রত্যেককেই ইজরায়েলি পুলিশ ডেকে পাঠাতে পারে। কনস্যুলেটের চারপাশ ঘিরে থাকে সাদা পোশাকের পুলিশ। পুলিশ স্টেশনে যাকে ডেকে আনা হয়, তাকে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হয়। তাকে অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা হয়, তিনি যেন দেশত্যাগ না করেন।

তিন ॥ সাতষট্টির জটিলতা

ছাপ্পান্নর যুদ্ধের পর দশ বৎসর মিশর সিনাই-এ পরাজয়ের কোন প্রতিশোধ নেয়নি। কিন্তু উভয় দেশের সীমান্তে উত্তেজনা মাঝে মাঝে চরমে উঠছিল। ইজরায়েল সিরিয়া ও ইজরায়েল-জর্ডান সীমান্তে সংঘর্ষ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত সীমান্তে যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখার ওপর ইজরায়েল প্রথম থেকেই নজর দেয়। প্রতিবেশী আরব দেশগুলির ওপর ইজরায়েলী হামলা হয়ে উঠেছিল নিয়মিত ঘটনা। কেবল ১৯৩৫ খৃঃ থেকে ১৯৪২ খৃঃ মধ্যে তারা জর্ডান সীমান্তে ২,৫১১; ১৯৪৯ খৃঃ থেকে ১৯৫১ খৃঃ মিশর সীমান্তে ১,৬৩৫; ১৯৫১ খৃঃ থেকে ১৯৫২ খৃঃ মধ্যে লেবানন সীমান্তে ৯৭ বার এবং সিরিয়া সীমান্তে ১৯৫২ খৃঃ থেকে ১৯৫৫ খৃঃ মধ্যে ১৬,৯৯৭ বার ইজরায়েলী আগ্রাসন ঘটে। বিশেষ করে দুখানা সিরীয় মিগ-২১ বিমান ইজরায়েলীরা ভূপাতিত করার পর অবস্থা চরম রূপ নেয়। সিরিয়া-ইজরাইল সীমান্তে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যতক্ষণ দামাস্কাস দখল না হচ্ছে, ততক্ষণ তাদের সংগ্রাম চলবে। প্রেসিডেন্ট নাসের ঘোষণা করেন, যদি সিরিয়া আক্রান্ত হয় তবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তাব সমস্ত শক্তি দিয়ে ইজরায়েল ধ্বংসে এগিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহর এসে আবির্ভূত হয় আরব দরিয়ায়। উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। ইজরায়েলী নেতারা সিরিয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকেন। প্রেসিডেন্ট নাসের অনুমান করেন ইজরায়েল কর্তৃক সিরিয়া ১৭ মে নাগাদ আক্রান্ত হতে পারে। এই সম্ভাবনায় ১৫ মে কায়রো থেকে

বিপুল সংখ্যক সৈন্য ইজরায়েল সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হতে থাকে। সিনাইয়ে আরব সাধারণতন্ত্রের মূল যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তার সীমান্ত থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ জরুরী বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানায় ১৭ মে। পশ্চিম এশিয়ার আকাশে যুদ্ধের কালো মেঘ আরো ঘন হয়ে আসে। অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ জেনারেল সেক্রেটারী কায়রো ছুটে যান। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট নাসের তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় সেক্রেটারীকে শুধু হাতে ফিরে যেতে হয়। অবশেষে তিনি রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনীর পরিত্যক্ত স্থানে এগিয়ে আসে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রামের সৈনিকেরা। তাদের পিছনে সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্রের সৈন্যবাহিনী। প্রেসিডেণ্ট নাসের এবার এমন একটি ঘোষণা করলেন যা যুদ্ধের সম্ভাবনাকে আরও ত্বরান্বিত করে। তিনি নির্দেশ দেন আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালী ইজরায়েলীরা ব্যবহার করতে পারবে না। এই জলপথেই ইজরায়েলের বিখ্যাত এইলাত বন্দর। বিভিন্ন তৈলবাহী জাহাজ এইলাত বন্দরে যায় এই জলপথে। এই বন্দর দিয়েই ইজরায়েল এশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য করে থাকে। তাছাড়া ১৯৫৬ খৃঃ যুদ্ধ-বিরতির সর্তস্বরূপ ইজরায়েল এই জলপথ ব্যবহারের অধিকার লাভ করে। ইজরায়েলের প্রধান মন্ত্রী এই অবরোধকে আক্রমণাত্মক এবং মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জনসন একে বে-আইনী ঘটনা বলে ঘোষণা করেন।

যুদ্ধের সাজ-সাজ রবের সংগে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। গাজা এলাকায় ২৪ মে রাতে ইজরায়েলী ও আরব সৈন্যদে. মধ্যে তুমুল গুলি বিনিময় ঘটে। ২৬ মে আকাবা উপ-সাগরের মুখে আরব স‌ং৷৷রণতন্ত্র দুটি ইজরায়েলী মিরেজ জঙ্গী বিমান

আক্রমণ করে। ২৯ মে মিশরীয় সৈন্যদের সংগে ইজরায়েলীদের প্রায় ৪০ মিনিটব্যাপী মর্টার ও মেসিনগানে আক্রমণ চলে। একটি মার্কিন জাহাজ আকাবা উপসাগরের অবরোধ ভাঙবার চেষ্টা করলে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের একটি যুদ্ধ জাহাজ থেকে ঐ জাহাজটি লক্ষ্য করে সতর্কতামূলক গুলি চালান হয়। ১ জুন জর্ডান সীমান্তে একটি ইজরায়েলী বিমান গুলিবিদ্ধ হয়। ২ জুন সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্ত সংঘর্ষে দুজন ইজরায়েলী ও একজন সিরীয় সৈন্য নিহত হয়।

৫ জুন ভোরবেলায় মিশরের নীল নদের ব-দ্বীপ এলাকার ২৫টি সামরিক ও বে-সামরিক বিমান ঘাঁটিতে ইজরায়েলের জঙ্গী বিমানের এক বিরাট বহর বোমা, কামানের গোলা এবং রকেট নিক্ষেপ করে। তারা এমন নিখুঁত সংবাদের ওপর নির্ভর করে বোমাবর্ষণ করে যে বিমানঘাঁটির বাইরে অবস্থিত কোন নকল বিমানের (ডামি প্লেন) ওপর তারা বোমাবর্ষণ করেনি। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বিমান-বহরের বিপুল ক্ষতি হয়। রোমের একটি সংবাদপত্রে এ সম্পর্কে বলা হয় যে, আরব সাধারণতন্ত্রের সৈন্য বাহিনীর খুঁটিনাটি সংবাদ ও পরিকল্পনা সি-আই-এর সহায়তায় ইজরায়েল সংগ্রহ করে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে নিযুক্ত পশ্চিম জার্মান কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় এই তথ্য সংগৃহীত হয়েছিল। তারপর বিমান আক্রমণের মত হঠাৎ ইজরায়েল পদাতিক ও সাঁজোয়া বাহিনী নিয়ে চতুর্মুখ অভিযান চালায় সিনাই-এ। ভূমধ্যসাগরের তীর বরাবর সৈন্যরা উত্তরে সুয়েজখালের দিকে অগ্রসর হয়। মরু অঞ্চলে বীর তাশনা এবং তওফিক লক্ষ করে দুটি অভিযান চলে। সর্বদক্ষিণে আকাবা উপসাগরের তীর ধরে একটি বাহিনী অগ্রসর হয়ে শারম-এল-শেখে পৌঁছে তিরান প্রণালী অবরোধ মুক্ত করে। কিন্তু আরব ট্যাঙ্ক বাহিনী আকাশপথে কোন বিমান সাহায্য পায়নি। একমাত্র ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ আয়ত্তে রাখা ছিল অসম্ভব। কারণ

ইজরায়েলী বিমান বহরের হামলায় তখন ক্রমশ তারা সুয়েজের দিকে সরে যাচ্ছিল। যদিও প্রথম দিকে সংযুক্ত আরব এবং জর্ডান বাহিনী ইজরায়েলী এলাকার কোথাও কোথাও ঢুকে পড়েছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ তা করায়ত্ত রাখা সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে আলজেরিয়ার মিগ জঙ্গী বিমান সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলে আল আরিশ ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে দুপক্ষে তুমুল লড়াই চলে। কিন্তু তখন মিশরীয় বাহিনী—ক্রমশ সুয়েজের দিকে সরে যাচ্ছে। ইজরায়েলী বিমানের আক্রমণে বহু মিশরীয় সৈন্য বিনষ্ট হয়ে যায়। পশ্চিমী সমর সাংবাদিকরা জানান যে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের যুদ্ধে বীর আরবীয় সৈন্যদের হাতে ইজরায়েলের ক্ষতির পরিমাণও সামান্য নয়।

তিন দিনের যুদ্ধে জর্ডানের প্রায় আঠার হাজার সৈন্য নষ্ট হয়। এর মূলে ছিল ইজরায়েলীদের নাপাম বোমা ব্যবহার। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে বিস্তীর্ণ অঞ্চল ইজরায়েলীদের হাতে চলে যায়। জর্ডান অস্ত্র সংবরণের আহ্বানে সাড়া দেয়।

জর্ডান ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের যুদ্ধ সমাপ্তির দুদিন পরেও ইজরায়েল-সিরিয়ায় যুদ্ধ চলে। সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্তবর্তী পাহাড় অঞ্চল ইজরায়েল দখল করে নেয়। এটি সিরিয়ার একটি মূল্যবান যুদ্ধ ঘাঁটি ছিল। সিরিয়ার আক্রমণ ক্ষমতা, তার সামরিক শক্তি এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্ব বিনষ্ট করাই ছিল ইজরায়েলী আগ্রাসনের লক্ষ্য।

সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলী সহসা বজ্রপাতের মত পৃথিবীতে আঘাত করে। প্যালেস্টাইনী আরবদের নাশকতামূলক কার্যকলাপের মিথ্যা ছুতোয় সিরিয়ার বিরুদ্ধে ইজরায়েলের দণ্ডমূলক অভিযান সমগ্র আরব জগতের সংহতি এবং সিরিয়া ও সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সপক্ষে আরব রাষ্ট্রসমূহের যৌথ ভূমিকা, ইজরায়েলের নগ্ন আগ্রাসন, সিনাই উপদ্বীপে মোশে দায়ানের নাৎসিসুলভ অনুপ্রবেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের পৃষ্ঠপোষকতায় তেলআভি-

ভের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব ঔদ্ধত্যভাবে উপেক্ষা—এই সবই ঘটে যায় মাত্র দুমাসের মধ্যে।

সেদিন মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীর বিচিত্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেছে। কেউ কেউ যেমন এই সব ঘটনায় বেদনা বা বিক্ষোভ বোধ করেছেন; অন্যরা উল্লসিত হয়ে উঠেছেন, বিপুল সৌভাগ্য বিবেচনা করেছেন।

ইজরায়েল ও তার মিত্ররা সমগ্র বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক উত্তেজনা ও অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টি করে। অবশ্য আরব অঞ্চলে সামরিক কার্যকলাপ চালিয়ে বা অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে কোন ফল পাওয়া যায় নি। কারণ আরব জাতীয়তাবোধ তাদের ন্যায্য দাবী না মেটা পর্যন্ত যে কোন প্রকার নতিস্বীকার করবে না—তাদের বিভিন্ন কার্যাবলী থেকে তা বারবার প্রমাণিত।

পশ্চিমী শক্তিজোটের সাহায্যপুষ্ট না হলে ইজরায়েলী চরমপন্থীরা তাদের বেপরোয়া হঠকারিতায় নামত না। ইজরায়েলের সামরিক শক্তির উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একশ ষাট কোটি ডলার দেয়; গ্রেট ব্রিটেনের অঙ্কও বিরাট। ন্যাটোর অংশীদারদের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে পশ্চিম জার্মানীও ইজরায়েলকে দেয় বিরাশি কোটি কুড়ি লক্ষ ডলার। এই সমগ্র অর্থ-ই ব্যয় করা হয় প্রধানত ইজরায়েলী সৈন্য-বাহিনীকে গড়ে তোলার জন্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী ইজরায়েলকে রাইফেল ও টমিগান থেকে শুরু করে ট্যাঙ্ক ও বিমান পর্যন্ত আধুনিক সমরাস্ত্র সরবরাহ করে।

পশ্চিম এশিয়ায় সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বার্থও কোন অংশে কম নয়। তারা এই অঞ্চলে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারে শঙ্কিত। আমেরিকার সামরিক কার্যকলাপ উচ্ছেদের জন্য আরব জাতীয়তাবাদের প্রবীণ নেতা নাসেরকে তারা অবলম্বন করে। উদ্দেশ্য সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সহযোগিতায় পশ্চিম এশিয়ায় ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাব বিনষ্ট করা। এদিকে আমেরিকা ও ব্রিটেন ইজরায়েলের মাধ্যমে

নাসেরের প্রভাব এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুপ্রবেশ নষ্ট করতে দৃঢ়সংকল্প। তাই আরব স্বার্থ-সংরক্ষণে এবং বিনষ্ট মর্যাদার পুনঃ-রুদ্ধারে সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজকে ভূমধ্যসাগরে এসে হাজির হতে হয়।

যুদ্ধোত্তর পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ হয়। যুদ্ধ থামলেও সমস্যা সমাধানের কোন পথ নির্দেশ হয়নি। অধিকৃত ভূমি থেকে ইজরায়েলকে সরাবার কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রসংঘ করতে পারেনি। চক্রান্তকারীদের অধিকারকে যেন মেনে নেওয়া হয়েছে অপরোক্ষে।

এদিকে উগ্রপন্থী আরব নেতারা এই অপমানকে হজম করে যে নেবেন না তা বোঝা যায় বিভিন্ন ঘটনা থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব রাষ্ট্রগুলির বিনষ্ট সামরিক শক্তি পুনরুদ্ধারে যথাসাধ্য সমরো-পকরণ সরবরাহ করে চলে। ইজরায়েল যদি অধিকৃত অঞ্চল থেকে না সরে যায় তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি যে পালন করবেই তা বিভিন্ন সোভিয়েত নেতার বক্তৃতায় ও তাদের কার্যে ছিল সুস্পষ্ট। অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রও আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে এসে দাঁড়ায় অস্ত্রসম্ভার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। আমে-রিকার উদ্বেগকে আমল না দিয়ে সোভিয়েত অস্ত্রবাহী জাহাজে সমরাস্ত্র আসতে থাকে। ফলে আরব রাষ্ট্রগুলি সামরিক শক্তি অনেকটাই ফিরে পায়।

কায়রোয় পাঁচ আরব রাষ্ট্রপ্রধান সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ইজরায়েলকে সতর্ক করে বলা হয়, সে যেন সুয়েজ খালে জাহাজ চালাবার চেষ্টা না করে। রাষ্ট্রপ্রধানরা আরব ঐক্যের ওপরই সব থেকে গুরুত্ব দেন। তাছাড়া যে সমস্ত রাষ্ট্র যুদ্ধকালে ইজরায়েলকে সমর্থন জানিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থায়ী রাখার বিষয়ে বিবেচনা করা হবে। তারা আরও গুরুত্ব দেন যুদ্ধে আমেরিকা ও ব্রিটেনের যোগদান বিষয়ে। নিজেদের অধিকার তারা অক্ষুণ্ণ রাখবেন, কোন রকম প্রতিবন্ধকতা তারা মানবেন না।

খার্তুম সম্মেলন যখন পুরোদমে চলছিল সে সময় কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় বলা হয় যে, ইরাক ইজরায়েলের সমর্থক দেশগুলিকে তেল সরবরাহ সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ইরাক সরকার অনতিবিলম্বে এই গুজবের সত্যতা অস্বীকার করেন।

ইজরায়েলী ফৌজ জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে মোতায়েন থাকে এবং জর্ডানের যথেষ্ট পরিমাণ জমি দখল করে থাকা সত্ত্বেও তা "বিস্মৃত" হয়ে নিউইয়র্ক টাইমস্ প্রস্তাব করে যে ইজরায়েলী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জর্ডানে প্রেরিত ফৌজকে ইরাক সে দেশ থেকে সরিয়ে আনুক। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করায় জর্ডানকে নিবৃত্ত করার অভিযোগ পত্রিকাটি ইরাকের বিরুদ্ধে উত্থাপন করে। এর জবাবে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, সঙ্কট সমাধানের প্রশ্নে তাঁর দেশ আরব দেশগুলির ঐক্য, সংহতি ও কাজকর্মের সমন্বয় সাধনভিত্তিক মূলনীতিসমূহ অনুসরণ করে।

পশ্চিমী প্রচারের যে জবাব আরব দেশগুলি দেয় তা আরব ঐক্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছে। খার্তুম সম্মেলনের কার্য-বিবরণীর মধ্যেই আরব ঐক্যের জীবনীশক্তি ও সংহতি প্রকাশিত।

মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সবচেয়ে কঠিন দিনগুলিতে আরব ঐক্যের প্রকৃত তাৎপর্য প্রকট হয়েছিল। জনগণ শুধু ইজরায়েলী আক্রমণের বিরুদ্ধে নয়, মিশর, সিরিয়া ও আলজেরিয়ার বিপ্লবী সরকারগুলিকে রক্ষা করার জন্যও সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

কিন্তু সমগ্র আরব রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে চলতে থাকে নানান অশান্তি। আরব শীর্ষ সম্মেলনের পরিবর্তে ঐস্লামিক শীর্ষ সম্মেলনের ওপর গুরুত্ব দেন সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়জল। বিপর্যস্ত উদ্ভ্রান্তভাবে বিভ্রান্ত জর্ডান দ্বিধাগ্রস্ত। রাজা ইদ্রিস ব্রিটেন ও আমেরিকাকে তার রাজ্য থেকে ঘাঁটি অপসারণের নির্দেশ দেন। কুয়ায়েত আরব শীর্ষ সম্মেলনে সিদ্ধান্ত মেনে চলবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু লিবিয়া ও মরক্কোর রাজার মনোভাব স্পষ্ট ছিল না। মুখে এবং কাজে

এদের দুস্তর ফারাক। আরব অনৈক্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। তেল সরবরাহ বয়কট শেষরক্ষা করতে পারে নি।

মিশর বা কোন আরব রাষ্ট্র ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হয়নি। এমন কি যুদ্ধের হুমকি পর্যন্ত দেয়নি তারা। ইজরায়েল যুদ্ধের হুমকি দিয়ে আসছে প্রথম থেকেই। কোন আইনবিরোধী কাজ আরব রাষ্ট্রগুলি করেনি। রাষ্ট্রসঙ্ঘ বাহিনী অপসারণ এবং তিরান প্রণালী অবরোধ নিয়ে পশ্চিমী শক্তিজোট প্রবল প্রচার চালায়। অথচ এই দুটি কাজ সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বেআইনী-ভাবে করেনি। তিরান প্রণালীর দুধারেই মিশরের ভূমি। মাঝে তিরান প্রণালী চার মাইল চওড়া। মিশরীয় দরিয়ায় অবস্থিত এই প্রণালী দিয়ে শান্তির সময় আন্তর্জাতিক বাণিজ্য জাহাজ চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা যায় না। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ইজরায়েল ১৯৪৮ খৃঃ পর থেকে কোন না কোন ভাবে যুদ্ধরত। তাছাড়া ইজরায়েলের অস্তিত্বও আরব রাষ্ট্রগুলি স্বীকার করে নি। তিরান প্রণালী দিয়ে যুদ্ধাস্ত্রহীন ইজরায়েলী জাহাজ যাতায়াতে মিশর কোন প্রতিবন্ধকতাও সৃষ্টি করেনি। ইজরায়েলের জন্ম সময় থেকে পরবর্তী-কালের ইতিহাস তার যুদ্ধোন্মাদনাই প্রমাণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের সংকটকে ইজরায়েল দিনের পর দিন উত্তপ্ত করে তোলে। ইজরায়েলের জঙ্গীনীতি পশ্চিমী সমর্থনে ক্রমশ উগ্র হয়ে ওঠে। আরব দেশগুলির ওপর আক্রমণের দু'সপ্তাহ আগে পশ্চিম জার্মানী ইজরায়েলকে আটশ সামরিক ট্রাক ও অন্যান্য সমর সরঞ্জাম সরবরাহ করে। এরূপ সংবাদও পাওয়া গেছে যে ইজরায়েলকে বিপুলসংখ্যক বিমান পাঠানো হয়। আক্রমণের আগে আমেরিকা ও কয়েকটি পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশ থেকে "স্বেচ্ছাব্রতী" পাইলটরা তেলআভিভে উপস্থিত হয়।

সিনাই উপদ্বীপে ১৯৫৬ খৃঃ যুদ্ধের মত এবারকার যুদ্ধের কৃতিত্ব ও সাফল্যের জন্য ইজরায়েল গর্ব অনুভব করতে পারে। আরব রাষ্ট্রগুলি ইজরায়েলকে ধ্বংস করা দূরে থাকুক, আরব দুনিয়া সমস্ত ফ্রণ্টেই

ইজরায়েলী বাহিনীর হাতে প্রথম প্রতিরক্ষা-ব্যূহে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবল প্রতিরোধ দিয়েও তাদের গতিরোধ করতে পারে নি আরব বাহিনী। ইজরায়েলী রণনীতি ছিল ১৯৫৬ খৃঃ অনুসৃত রীতিরই অনুরূপ।

এবারের শোচনীয় আরব বিপর্যয়ের জন্য ইজরায়েলী ষ্ট্রাটিজি অন্যতম দায়ী। সিনাই উপদ্বীপে ১৯৫৬ খৃঃ কৌশল অনুসৃত হলেও ইজরায়েলের সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ওপর আক্রমণের রীতি ছিল বিৎজক্রিগ ধরনের। প্রথমেই আরব সাধারণতন্ত্রের বিমান-শক্তিকে বিনষ্ট করে দেওয়া হয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ে আরব বিমানবাহিনী পদাতিক বা সাঁজোয়াবাহিনীর সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারে নি। ইজরায়েল এবং তার মিত্রগোষ্ঠী ভালভাবেই জানে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে ইজরায়েলের সাফল্যের সম্ভাবনা কম।

ওয়াশিংটনের একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ঃ ইজরায়েল ঘাঁটি থেকে যে কোন শব্দাতিগ (সুপারসনিক) জেট বিমান মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মিশরের বিমান-ঘাঁটিতে পৌঁছাতে পারে। যেমন ঘণ্টায় তেরশ মাইল গতিবেগ বিশিষ্ট ইজরায়েলী মিরেজ ৩-সি পনের মিনিটেরও কম সময়ে তেলআভিভ থেকে কায়রো পৌঁছাতে পারে। জর্ডানের নিকটস্থ বিমানঘাঁটিতে পৌঁছতে ইজরায়েলী জেট বিমানের লাগে পাঁচ মিনিটেরও কম সময়। অবশ্য ইজরায়েলী যুদ্ধ-কৌশলের দোহাই দিয়ে আরব বিপর্যয়কে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায় হবে। তারা যে এইভাবে আক্রমণ চালাতে পারে তার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ইজরায়েলী বিমান আক্রমণ প্রতিরোধে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। যদিও তার হাতে যথেষ্ট পরিমাণে বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ছিল। তবুও সেগুলি ব্যবহার করতে পারেনি। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের গোপন সংবাদ সংগ্রহ ছিল খুবই দুর্বল। শত্রুদের শক্তি সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ জ্ঞাত ছিল না। কারণ পরে প্রেসিডেণ্ট নাসের বলে-

ছিলেন যে, ইজরায়েল 'আমরা যা আশা করেছিলাম, তার থেকে অনেক বেশী শক্তিশালী।'

আরবদের প্রচার-প্রস্তুতি ছিল যত বেশী, সমর প্রস্তুতি তত ছিল না। সিনাই সীমান্তের প্রথম রক্ষাব্যূহ খুব সহজেই ধ্বসে পড়ে। অথচ দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি চলেছিল। সিনাই উপদ্বীপে ইজরায়েল যে ১৯৫৬ খৃঃ ষ্ট্রাটিজি অনুসরণ করতে পারে তা সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বোঝা উচিত ছিল। তাছাড়া সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের নেতারা আত্মনির্ভরতার নীতি গ্রহণ করে নি। তারা বেশী মাত্রায় সোভিয়েতের ওপর নির্ভর করেছিলেন।

আরব তুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের ওপরই যুদ্ধের প্রধান দায়িত্ব পড়েছিল। যদি তার অপ্রস্তুতি ও অসতর্কতায় এই বিপর্যয় ঘটে থাকে, তবুও বলা যায়, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের নিষ্ক্রিয়তা ও দ্বিধাজড়িত মনোভাবও এর জন্য কম দায়ী নয়। ইরাক ও আলজেরিয়া যুদ্ধে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল। অন্যান্য আরব রাষ্ট্র কতখানি যুদ্ধে নেমেছিল সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। জর্ডান যতখানি কাহিল হয়ে পড়েছিল, ঠিক যুদ্ধে ততখানি অংশ গ্রহণ করেছিল কিনা তাও প্রশ্নের বিষয়। সৌদী আরব বাহিনী জর্ডানে ঢুকেছিল আরব পক্ষের হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কোন সংবাদ পাওয়া যায় নি। জর্ডান ও সৌদী আরব নাসেরকে বারবার ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিল। ফলে নাসেরকে নিজের সম্মান বাঁচাবার জন্য কঠোর পথ নিতে হয়!

সিরিয়া-ইজরায়েল সীমান্তে যুদ্ধবিগ্রহ সব সময়েই লেগে থাকে। এই সিরিয়ার জন্যই নাসেরকে চরম মনোভাব নিতে হয়েছিল। কিন্তু সিরিয়ার প্রচার আর প্রকৃত যুদ্ধের মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকা আশ্চর্যের নয়। এবারের যুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের বিপর্যয় হোল সিরিয়ার বিপন্মুক্তি। আরব রাষ্ট্রগুলির অসহযোগী মনোভাব

নাসের বিরোধী রাজনীতির বিরাট জয়লাভ বটে, কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় চরম সংকটের আহ্বান।

ইজরায়েলের সামরিকতত্ত্বের ভিত্তি 'ব্লিজক্রিগ'তত্ত্ব—এটি হিটলারী সৈন্যবাহিনীর কাছ থেকে ধার করা। এই তত্ত্বের নির্দেশ হল আরব জাতিসমূহের সঙ্গে সীমান্ত ধরে সংগঠিত সামরিক প্ররোচনা চালাতে হবে ও তারপর আকস্মিক আক্রমণ হানতে হবে। আগে থাকতেই এই কাজের সাফাই গাওয়ার জন্য জনসাধারণের কাছে প্রতিবেশী দেশগুলিকে সম্ভাব্য আক্রমণকারী হিসাবে চিত্রিত করা হয়। রণনৈতিক লক্ষ্য ও কর্তব্যসাধনে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল বোমারু বিমানবহরকে। দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়েছিল ট্যাঙ্ক ইউনিটগুলিকে। যেহেতু মরুভূমি অঞ্চল ট্যাঙ্কের পক্ষে প্রায় দুর্গম, সে জন্যই সাঁজোয়া ইউনিটগুলিকে রাস্তা আঁকড়ে থাকতে হয়েছে।

জুন মাসের আগ্রাসনে ইজরায়েলের খরচ হয়েছিল তিন হাজার ইজরায়েলী পাউণ্ডেরও কিছু বেশী। এই মাসে আমেরিকা ইজরায়েলকে আটচল্লিশটি জেট বোম্বার দেয়। আরও কুড়িটি স্কাইহক এবং পঞ্চাশটি ফ্যাণ্টম জঙ্গী বিমান পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। মার্কিন কংগ্রেস ইজরায়েলকে অপরিমিত সামরিক সাহায্যদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। জর্ডানের ক্ষেত্রে এই জাতীয় সাহায্যবন্ধের অনুরোধ জানান হয়।

ইজরায়েল এই যুদ্ধে তাদের মূল ভূখণ্ডের থেকেও তিনগুণ বেশী ষাট হাজার বর্গ কিলো মিটার আরব ভূখণ্ড দখল করে নেয়। আরব জনসংখ্যা হল পনের লক্ষ, অর্থাৎ ইজরায়েলী জনসংখ্যার ষাট শতাংশ। সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ সহ সুয়েজ খালের পূর্বতীর এবং শারম এল শেখ ; জর্ডান নদী পর্যন্ত জর্ডানের সমগ্র পশ্চিম ভূভাগ—জেরুজালেম, বেথেলহেম ও নাবুলাস সহ ; কয়েকটি অসামরিক অঞ্চল সহ সিরিয়ার ভূ ভাগের কিছু অংশ ইজরায়েল দখল করে। এখানে উল্লেখযোগ্য হল, নিরাপত্তা পরিষদে ৬, ৭, ৯ জুন যুদ্ধ-

বিরতি সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এইসব অঞ্চল দখলে আনা হয়। যুদ্ধ যখন প্রবল রূপ নেয়, তখন নিউ ইয়র্ক টাইমস লেখে: ইজরায়েলের কৌশল এখন স্পষ্ট। এরা যুদ্ধবিরতি মানবে না। আরবদের সামরিক শক্তি নষ্ট করে জমি দখল করবে এবং শান্তির জন্য দর কষাকরি করবে।

যদিও তেলআভিভের সম্প্রসারণবাদীরা শান্তির বুলির আড়ালে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাহলেও সামরিক তৎপরতার পরবর্তী কর্মনীতি ইজরায়েলের এই দাবি অপ্রমাণ করে যে, সে নাকি নিজ ভূখণ্ড রক্ষার লড়াই করছিল। ইজরায়েলী সৈন্যবাহিনীর কাজ দেখিয়ে দিয়েছে যে তেলআভিভ সীমান্ত নতুন করে রচনা করতে ও তার সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনা কার্যকর করতে কৃতসংকল্প ছিল।

যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ইজরায়েলের ব্যবহার যে কি অমানুষিক, তার কিছু কিছু সংবাদ প্রকাশিত হয়। সিনাই অঞ্চলে যে পনের হাজার আরব সৈন্য বন্দী হয়, তাদের প্রতি ব্যবহার সম্পূর্ণ অমানবিক! সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র পোশাক কেড়ে নিয়ে গেঞ্জি ও ছোট প্যাণ্টপরা অবস্থায় তাদের ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া বন্দী-শিবিরে। আহতদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাধ্যমে। নিরস্ত্র অসহায় বহু আরব সৈন্য খাদ্য ও জল ছাড়া মরুভূমির দস্যু, বিষাক্ত সাপ এবং হিংস্র জন্তুর হাতে নিহত হয়। উনিশ বছর আগে ইজরায়েল থেকে নির্বাসিত এবং সিনাই ও সিরিয়ায় আশ্রয়প্রাপ্ত হাজার হাজার প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তুর ওপর নারকীয় নির্যাতন চালায়। বিনা বিচারে, বিনা অনুসন্ধানে শান্তিপ্রিয় জনগণকে হত্যা করে। ফসল পুড়িয়ে দেয়। হাসপাতাল ও বিদ্যালয় ধ্বংস করে। পরাজিত সৈন্যদের প্রতি ইজরায়েল মানবিকতার দিক থেকে আরও উদার হতে পারত।

রাষ্ট্রসংঘের কাজে নিযুক্ত ভারতীয় সৈন্যদের ওপর ইজরায়েলী

পদাতিক ও বিমানবাহিনী যে অন্যায় আক্রমণ চালায়, তাতে অন্তত উনিশজন ভারতীয় সৈন্য নিহত হয়। এমনকি ইন্দ্রজিৎ রিখের বিমানও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। এর জন্য দ্বিধাগ্রস্তভাবে ইজরায়েল দুঃখ প্রকাশ করেছে।

এই যুদ্ধে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বিপর্যস্ত ঠিকই। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের রাজনৈতিক লাভ ঘটে প্রচণ্ডভাবে। পশ্চিমী সমর্থনপুষ্ট ইজরায়েলের স্বরূপ আরবদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৃহৎ স্বার্থান্বেষী শক্তিরা আর তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না। তাছাড়া যাদের সাহায্য ও সমর্থন ইজরায়েলের ঔদ্ধত্য বাড়িয়েছে, আরবরা আজ আর তাদের মিত্র বলে জানে না।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ আসতে থাকে। তেল আভিভে কর্তৃপক্ষ অধিকৃত আরব ভূখণ্ডকে ইজরায়েলের সঙ্গে যুক্ত করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করে। ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী এশকোলের বক্তৃতাতেও এটা স্পষ্ট ছিল। এইসব অঞ্চল থেকে বিতাড়িত আরবদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন নিষিদ্ধ করে তেলআভিভে একটি আদেশ প্রচারিত হয়। কোন কোন সংবাদে দেখা যায়, আগেকার আরব বসতি এলাকাগুলিতে ইজরায়েলীদের পাঠান হবে। জেরুজালেমের জর্ডানীয় অংশকে, বিশাল সিনাই উপদ্বীপকে ইজরায়েলের অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে ইজরায়েল আরব জাতিসমূহের বিরুদ্ধে তার আক্রমণকে সম্প্রসারিত করতে থাকে। এইভাবে তেলআভিভ কর্তৃপক্ষ জেরুজালেমে পূর্ববর্তী শাসন বজায় রাখা সম্পর্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ জরুরি অধিবেশনের সিদ্ধান্তকেই লঙ্ঘন করে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করেনি।

সহজেই তেলআভিভ নেতৃবৃন্দের এইসব পদক্ষেপের ব্যাখ্যা করা যায়। এরা আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া, সম্প্রসারিত করার জন্য

সাহায্য ও সমর্থন পায় পশ্চিমী মহল থেকে। মধ্যপ্রাচ্যের প্রগতিশীল সরকারগুলিকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করছে এরা।

তারপর শুরু হয় আক্রমণের দ্বিতীয় পর্যায়। এর অঙ্গ হিসাবে সব রকমের প্ররোচনা দেওয়া হতে থাকে এই আশায় যে আরব জাতিগুলির মধ্যে বিভেদ ঘটানো যাবে এবং তারপর এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে আঘাত হানা যাবে যেখানকার সরকারকে পশ্চিমীরা বিশেষভাবে পছন্দ করে না। এইসব প্ররোচনার একটি হল পশ্চিমীদের সাহায্যে আরব ভূখণ্ডসমূহ আত্মসাৎ করার চলতি ইজরায়েলী কর্মনীতি। পরিকল্পনাটি খুব সোজা, এটি হল আরব রাষ্ট্রগুলিকে আর একটি সামরিক সংঘর্ষে জড়িয়ে অস্ত্রবলে কোন কোন আরব দেশের আইনসম্মত সরকারগুলিকে উচ্ছেদের চেষ্টা চালান।

সুয়েজ খালের দুধারে দু'দেশের সশস্ত্র সৈন্য। পূর্ব পাড়ে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র আর পশ্চিমে ইজরায়েলী সৈন্য। মাঝখানে আণবিক অস্ত্রসজ্জিত সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ। সুয়েজ খাল বন্ধ। কিন্তু এই খাল খোলা প্রয়োজন মিশরের স্বার্থে এবং পশ্চিমী রাষ্ট্র-জোটের স্বার্থে। পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবসাবাণিজ্যের অধোগতি এবং পশ্চিমী স্বার্থরক্ষক শক্তিজোট আবার যদি ইজরায়েল মাধ্যমে আগ্রাসী হয়ে ওঠে তবে সোভিয়েতকে চুপ করে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠবে; আবার আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে বিপর্যস্ত আরবভূমি এবং লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ক্রন্দনকে স্বীকার করে নেওয়াও অসম্ভব। ইজরায়েল থেকে জানান হয়, সে আরব অঞ্চলে অধিকৃত ভূমি ছেড়ে যাবে না। অথচ এই জমি থেকে না সরে যাওয়া পর্যন্ত কোন মীমাংসার প্রশ্নও ওঠে না।

রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই ইজরায়েলের শাসকগোষ্ঠী আগ্রাসী ও সম্প্রসারণবাদী কর্মনীতি অনুসরণ করছে। তারা আরবদের পুরুষানুক্রমে ভোগ করা শত শত বছরের জায়গা জমি দখল ক'রে,

রাষ্ট্রপরিধিরই বিস্তার করছে না, পৃথিবীর অন্যান্য অংশে নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান দৃঢ়তর করছে।

ইজরায়েলের রণনীতিগত পরিকল্পনার সংগে আর একটি প্রচেষ্টাও অবিচ্ছিন্নভাবে চলেছে বিগত পঁচিশ বছর ধরে। আরব রাষ্ট্রগুলিকে সমাজতান্ত্রিক শিবির থেকে বিচ্ছিন্ন করা, তাদের আভ্যন্তরীণ বিভেদকে জাগিয়ে দিয়ে পরস্পরকে উত্তেজিত করে তোলা এবং আরব মুক্তি আন্দোলনের অন্তর্দ্বন্দ্বকে জটিল করে দেওয়া। এর দ্বারা ইজরায়েল যেমন তার অধিকৃত ভূখণ্ডকে অধিকারে রাখতে পারবে, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ— বিস্তৃত হবে। অধিকৃত আরব অঞ্চলকে সামরিক ও অর্থ নৈতিক লেজুড়ে পরিণত করা হচ্ছে। স্থানীয় অধিবাসীদের উৎখাত ও নির্বাসন চলেছে ব্যাপকভাবে। সম্পূর্ণ পরাধীন হয়ে বাসে বাধ্য করা হচ্ছে। অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যাপকভাবে শোষণ করা হচ্ছে। একটি ইজরায়েলী পত্রিকার মতে দখলদারী বেশ লাভজনক কারবার।

ইজরায়েলী শাসকরা আরব ভূখণ্ড দখলের সময় "প্রতিরক্ষার প্রয়োজন," "নিরাপত্তা সীমান্তের" উল্লেখ করে। আর তাদের মতে "নিরাপত্তা সীমান্ত" থাকবে সার্বভৌম আরব রাষ্ট্রগুলির ভূখণ্ডে। নেসেতের ১৯৫২ খৃঃ মার্চ মাসের শেষে এক প্রস্তাবে বলা হয়, বাই-বেলের যুগে যেসব এলাকায় তাদের অধিকার ছিল, সেইসব এলাকার ওপর তাদের রয়েছে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক অধিকার। এর মধ্যে পড়ে সিনাই উপদ্বীপের একাংশ, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডান ভূখণ্ডের কিছু অংশ। সুতরাং তাদের দাবীগুলি যে বিশ্বজনমতকে বিভ্রান্ত করার কৌশল সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের আগ্রাসী অভিযানকে ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে।

মনে রাখতে হবে ইজরায়েল রাষ্ট্রের আবির্ভাব মাত্র ১৯৪৭খৃঃ

২৯ নভেম্বর রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ গৃহীত সিদ্ধান্তে। এই সিদ্ধান্তই হল তার অস্তিত্বের একমাত্র আইনগত ভিত্তি। সেই প্রস্তাবে অবশ্য প্যালেস্টাইন ও অন্যান্য ভূখণ্ডে ইহুদিদের পৌরাণিক অধিকারের কথা ছিল না। সাধারণ পরিষদ আরব ও ইহুদিদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায় করে দিতে চেয়েছিল মাত্র। ইজরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্‌বা ইবানের একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য : "ইজরায়েলের কোন সম্প্রসারণকামী দাবি দাওয়া নেই। দেশ আবিষ্কারের প্রচেষ্টা, আর নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত পরিবর্তনের প্রয়োজনের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বর্তমান।"

"পবিত্রস্থানগুলি রক্ষা", "পুনরুদ্ধারের কাজ", "প্রতিরক্ষার প্রয়োজন", "নিরাপত্তা সীমান্ত" সবই উপনিবেশ গড়ে তোলা এবং অধিকৃত অঞ্চলকে আক্রমণের সেতুমুখ হিসাবে ব্যবহারের লক্ষ্যেই পরিচালিত, ইজরায়েলী কার্যক্রমে তারই পরিচয় মেলে। বারবার আগ্রাসী কার্যকলাপে মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে থাকে ইজরায়েলী সরকার। গেরিলা তৎপরতা বন্ধ, অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান কালে অনুষ্ঠিত শোচনীয় ঘটনার বদলা এসব যুক্তি মেনে নেওয়া দুষ্কর। যারিং মিশনের কার্যকলাপে বাধার সৃষ্টি করে ইজরায়েল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ও উৎসাহেই ইজরায়েল সার্বভৌম আরব রাষ্ট্রগুলির অধিকার অস্বীকার করে। রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক জনমতকে অগ্রাহ্য ক'রে, শান্তি ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক অশুভশক্তিতে পরিণত হয়েছে।

তেলআভিভের কর্তৃপক্ষ তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতি গোপন করে না। নিউইয়র্ক টাইমস-এর সংগে সাক্ষাৎকারে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ার ঘোষণা করেন : "ইজরায়েলের কর্মনীতির অন্যতম প্রধান দিক এই যে, ৪ জুন ১৯৪৭ খৃঃ সীমান্তের যে অবস্থা ছিল, শান্তিচুক্তি দিয়ে তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা যাবে না। সীমান্ত

বদলাতে হবেই। আমরা আমাদের সমস্ত সীমান্তের পুনর্বিবেচনা চাই।”

মিশরের প্রেসিডেণ্ট আনোয়ার সাদাত বলেছেন: “উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের লক্ষ্য হল ভূখণ্ড সম্প্রসারণ……হ্যাঁ, সম্প্রসারণ, যতটা সম্ভব জায়গা দখল করা……কতটা জায়গা? এটাই হল একমাত্র প্রশ্ন।” ইজরায়েলের এই অপরিমিত ভূমি ক্ষুধায় আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার ব্যাপক সামরিক সংঘর্ষ ঘটেছে।

ফেব্রুআরি ১৯৫২ খৃঃ ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান মার্কিন টেলিভিশনে বক্তৃতাকালে বলেন যে ইজরায়েল ‘অবশ্যই’ গোলান হাইটস ও শারম এল-শেখের ওপরে দখল বজায় রাখবে। তিনি জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর বরাবর ভূখণ্ডের ওপরেও দাবী জানান।

মার্চ, ১৯৫২ খৃঃ ইজরায়েলী নেসেত মধ্যপ্রাচ্যে নতুন সম্প্রসারণের কর্মসূচী অনুমোদন করে একটি প্রস্তাব নেয়। সেই কর্মসূচীর একটি ধারায় বাইবেলের যুগের প্রাচীন ইজরায়েল ভূমির ওপরে ইহুদি জাতির ঐতিহাসিক অধিকারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। “সিনাই থেকে ইউফ্রেতিস পর্যন্ত ইজরায়েল”।—এই পর রাজ্যগ্রাসী শ্লোগান এভাবেই ঘোষিত হয়েছে।

টাইম-এর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোল্ডা মেয়ার বলেছেন: “জেরুজালেমের জন্য যুদ্ধ করা এবং এই যুদ্ধে জয়লাভ ছাড়া আরবদের পক্ষে জেরুজালেম ফিরে পাওয়ার আর কোন পথ নেই।” সিরিয়ার গোলান শিখর সম্পর্কে তিনি বলেন: “আমি ভাবতে পারি না যে ইজরায়েলে এমন কোন বিকৃত মস্তিষ্ক মানুষ আছে যে এটা ছেড়ে দিতে সম্মত হবে।” তিনি মিশরের শারম-এল-শেখকে “এশিয়া ও আফ্রিকা অভিমুখে আমাদের জন্য এক অপরিহার্য গমনাগমনের পথ” হিসাবে বর্ণনা করেন।

অসঙ্গত যুক্তির অজুহাতে অধিকৃত ভূখণ্ডে ইহুদি উপনিবেশ গড়ে

তোলা। মোশে দায়ানের মতে: "বর্তমান সময়ে আমি মনে করি না যে উপনিবেশের নিরাপত্তা বিষয় সম্পর্কে কোন বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আমি উপনিবেশকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করি।" এবং তিনি আরও বলেন: "আমরা যেখানে উপনিবেশ বা নিরাপত্তা উপনিবেশ ঘাঁটি স্থাপন করতে পারি তা আমরা ছেড়ে দেব না।"

"দখলীকৃত এলাকায় নতুন উপনিবেশগুলি হল মাটির গভীরে প্রোথিত দৃঢ় শিকড় সম্পন্ন গাছের মত, টবের ওপরে ফুলের মত নয় যে, তাদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরানো যাবে। আমরা যেখানেই আমাদের সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে তুলি না কেন, আমরা না ছাড়ব সেই সম্প্রদায়কে, না সেই স্থানকে।"

মোশে দায়ানের এই বক্তব্য অনুসারে দখল করা জমিকে বৈধ করা হয় ১৯৫২ খৃঃ এই সব এলাকায় পৌর নির্বাচনের মাধ্যমে। বিস্ময়ের ব্যাপার হল, ইজরায়েলী শাসক দলের নির্বাচনী কর্মসূচীতে দখল করা জমি বিক্রি ও লীজের ব্যবস্থা ছিল। এই দেশের সরকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ওয়াশিংটন পোস্ট পর্যন্ত লিখতে বাধ্য হল: "১৯৫৭ খৃঃ তার আরব প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জয় করা অঞ্চলের বৃহত্তর অংশে স্থায়ী দখলদারী কায়েম করার দিকে এক বৃহত্তর পদক্ষেপ।"

বিগত পঁচিশ বছর ধরে ইজরায়েল তার অনুসৃত নীতিতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ লম্ফনে আরবদের কোনঠাসা করে ফেলেছে। তাদের সামনে প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়নের সেই বিখ্যাত যুক্তি: "প্রতিটি রাষ্ট্র জমি ও জনগণ নিয়ে গঠিত। ইজরায়েল তার ব্যতিক্রম নয়, কিন্তু তাকে তার বর্তমান সীমানা ও জনগণ দিয়েই সনাক্ত করা চলে না।......এখন এটা অবশ্যই বলতে হবে যে, ইজরায়েলী সীমানার এক ক্ষুদ্র অংশে মাত্র ইজরায়েল সৃষ্টি হয়েছে।"

ইজরায়েলের শাসকরা প্যালেস্টাইনে আরবদের আইনসঙ্গত

অধিকার ও রাজনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে অস্বীকার করে গোল্ডা মেয়ার প্যালেস্টাইনে আরবদের বৈধ প্রজা বলে স্বীকার করতে চান নি। তিনি বলেন : "১৯৫৭ খৃঃ পর্যন্ত আমরা তাদের সম্পর্কে কিছুই শুনি নি।" এবং প্যালেস্টাইনে আরবদের নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জনৈক ব্রিটিশ সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে বলেন : "এর জন্য কোন স্থান নেই ; এবং তার প্রয়োজনও নেই।" ১৯৫৭ খৃঃ ১৬ মার্চ নেসেত-এ গৃহীত একটি সিদ্ধান্তে বলা হয় : "প্যালেস্টাইনে ইহুদি জনগণের ঐতিহাসিক অধিকার প্রশ্নাতীত।'

সুতরাং আরব জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে তাদের অর্থনীতি ও কৃষ্টি বিনষ্ট করার সঙ্কল্পে ব্যাপক নির্যাতন চলছে। ইজরায়েলী দক্ষিণপন্থী পার্টি হায়রুটের নেতা মেনাহিম বীজেন ইজরায়েলী পিটুনি ইউনিটে ভাষণদান কালে বলেন, : "হে ইজরায়েলী জনগণ, যখন তোমরা শত্রুকে নিধন করবে, তোমাদের মনে কখনও অনুকম্পা পোষণ করবে না। তাদের জন্য তোমাদের কখনও দয়াশীল হওয়া উচিত নয়, যাতে আমরা তথাকথিত আবব সংস্কৃতিকে দুর্বল বলে বিবেচনা করতে পারি।"

জেনারেল দায়ান নির্বিকার চিত্তে ঘোষণা করেছেন, যে সব জায়গায় ইজরায়েলীরা বাস করছে অথবা আধা সামরিক বসত গড়ে তুলেছে, সেখান থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার করা হবে না। বিস্ময়কর ঘটনা হল, ১৯৫৭ খৃঃ জুন মাসের যুদ্ধবিরতি সীমানাকে নিজের সীমান্ত নির্দেশ করে ইজরায়েল সরকার মানচিত্রও প্রকাশ করেছেন !

অধিকৃত অঞ্চলগুলি ইজরায়েল যে ত্যাগ করবে না, তা ইজরায়েলী শাসকদের কর্মনীতিতে বারবার স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিতে অবিশ্রাম সশস্ত্র প্ররোচনা ও লুণ্ঠন থেকে ইজরায়েল কখনও বিরত হয়নি। বিশ্বজনমতের প্রতিবাদ, রাষ্ট্রসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে সে অধিকৃত ভূখণ্ড তাদের রাষ্ট্রভুক্ত

করতে থাকে 'পুনরুদ্ধারে'র নামে। এই সব অঞ্চলে এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি আধা সামরিক বসত গড়ে তোলা হয়েছে। আরবদের হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস করা হয়েছে।

অধিকৃত অঞ্চলে দুর্গশহর নির্মাণ, সামরিক উদ্দেশ্যে পথঘাট নির্মাণ এবং বহিরাগতদের বসতি স্থাপন আরব জনগণের ভবিষ্যতের পথে এক সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকে। যুদ্ধ ও নির্যাতনে তের লক্ষ প্যালেস্টাইন আরব জন্মভূমি ত্যাগ করে অন্যান্য রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছে। যে দশ লক্ষ মানুষ থেকে গেছে, তারা ইজরায়েলী সৈন্য এবং বহিরাগতদের আচরণে ক্ষুব্ধ। তারা ক্রমশ শত্রুভাবাপন্ন হয়ে উঠছে। এই সব অধিবাসীদেরও বিতাড়ণ করতে চায় ইজরায়েলী যুদ্ধবাজরা। অধিকৃত অঞ্চলে চলেছে নির্মম শোষণ ও লুণ্ঠন।

ব্রিটিশ উপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ প্রবর্তিত অর্ডিন্যান্সের সাহায্যে বেন গুরিয়ন সরকার আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে অধিকার কায়েম করেছিল। এইসব অর্ডিন্যান্স এখনও চালু রয়েছে। আরবরা সামরিক বা পুলিশ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে পারে না। তাদের জমি ও সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারে প্রশাসনের কর্তারা। এমন কি তাদের বিনা বিচারে আটক রাখা বা যুদ্ধবিরতি সীমা রেখার বাইরে তাড়িয়েও দিতে পারে।

আরবরা এই অত্যাচারকে কখনও স্বীকার করে নেয় নি। পিতৃ-ভূমির মুক্তিসংগ্রামে তারা গেরিলা যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। বন্দী গেরিলা-দের ওপর চলে নির্মম অত্যাচার। কখনও তাদের হত্যা করা হয় প্রকাশ্যে, কখনও পাঠিয়ে দেওয়া হয় বন্দী শিবিরে। সিনাই উপদ্বীপে গড়ে উঠেছে বন্দী শিবির। সেখানে হাজার হাজার আরবকে রাখা হয়েছে শোচনীয় অবস্থায়। নির্যাতনে অথবা রোগে ভুগে মারা পড়ছে তাদের অনেকে। অনেকে পালিয়ে গেছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে। গেরিলাদের ঘরবাড়ী অথবা তাদের সাহায্য করেছে এমন সন্দেহজনক

ব্যক্তির ঘরবাড়ী উড়িয়ে দেওয়া হয় ডিনামাইটে। অথবা তাড়িয়ে দেওয়া হয় তাদের। এইসব জমি ঘরবাড়ী অবশ্য খালি পড়ে থাকে না। সে সব দেওয়া হয় ইজরায়েলীদের। শুনে হয়ত অনেকে বিস্মিত হবেন ১৯৬৭ খৃঃ জুনের পর থেকে এ পর্যন্ত ষোল হাজার ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয়েছে। কেবল ডিনামাইটে উড়িয়ে দেওয়া ঘববাড়ীর সংখ্যা দশ হাজারের মত। গোলান শিখরে সতেরটি গ্রাম মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাঁচ হাজারেরও বেশী নিরীহ অসামরিক মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। আহত মানুষের সংখ্যা ষোল হাজার। ইজরায়েলীদের পিটুনি অভিযানে কোন বাধা সৃষ্টি করলে নির্মম নির্যাতন চলে। আরব জনগণের ওপর ইজরায়েলী বর্বরতা প্রকৃতপক্ষে গণহত্যারই সামিল। এসব গুরুতর মানববিদ্বেষী অপরাধ। যা বার বার রাষ্ট্রসংঘে নিন্দিত হয়েছে।

ইজরায়েলের সরকারী গেজেটে ১৯৪৮ খৃঃ জুন মাসে পরিত্যক্ত ভূসম্পত্তি সম্পর্কে একটি নির্দেশনামায় বলা হয়েছিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মালিকদের না পাওয়া গেলে সম্পত্তি হস্তগত করা বৈধ বলে গণ্য হবে। এই বছরের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে এ জাতীয় আরও অর্ডিন্যান্স জারী করা হয় এবং ১৯৫০ খৃঃ আইন প্রণয়ন করা হয়। ইজরায়েলের ইহুদি অধিবাসীরা ১৯৫৪ খৃঃ এই আইনের সাহায্যে অন্যের এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দখল করে নিয়েছিল। আরবদের হারান সহর ও গ্রামের সংখ্যা ছিল তিনশ অষ্টআশি। তাদের দশ হাজার দোকান ও অফিস ইহুদিরা দখল করে নিয়েছিল। আর ইজরায়েলের বাড়ীঘরের একচতুর্থাংশই ছিল আরবদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া।

অধিকৃত অঞ্চলে আরবদের পরিত্যক্ত টাকাকড়ি, মালপত্র এবং স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ দখলের জন্য ১৯৫৭ খৃঃ ৩ জুলাই আইন জারী করে। যে কোন অধিকৃত এলাকাকে

'নিরাপত্তা অঞ্চল' ঘোষণার অধিকার দেওয়া হয় সামরিক ও পুলিশ কর্তৃপক্ষকে। এই 'নিরাপত্তা অঞ্চল' ঘোষণার অর্থ সেখানে আরবদের বসবাস করতে না দেওয়া—তাদের উচ্ছেদ করা। অনুপস্থিত(?) আরবদের জমি সম্পত্তি দেওয়া হয় বহিরাগত ইহুদিদের। এইভাবে আরবদের ষাট শতাংশ উর্বর জমি বাজেয়াপ্ত করেছে ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ।

ইজরায়েল থেকে প্রকাশিত সাম্প্রতিক তথ্যে জানা যায় ১৯৪৮খৃঃ উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের প্যালেস্টাইন দখলের আগে সেখানে ছিল পরিশ্রমী প্যালেস্টাইনী আরবদের উন্নত ও সমৃদ্ধ কয়েকটি শহর। তাদের ছিল ফল ও লেবুর ব্যবসা। বন্দর ছিল তাদের ব্যবসায়ের জয় চঞ্চল। এইসব আরবদের চারশ পঁচাত্তরটি গ্রামের তিনশ পঁচাশিটি ধ্বংস করা হয়েছে। অবশিষ্ট আছে মাত্র নব্বইটি। বেথেলহেম জেলায় জানগ শহর বাদে তেইশটি আরব গ্রাম এবং রামলেহ জেলার একত্রিশটি গ্রাম ধ্বংস করা হয়। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান হাইফা টেকনিঅনের ছাত্রদের সামনে ১৯৫৯ খৃঃ ১৯ মার্চ ভাষণে বলেন: "এদেশে এমন একটি ইহুদি গ্রাম নেই যা আরব গ্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি।" ইজরায়েলী লীগ ফর হিউম্যান অ্যাণ্ড সিভিল রাইটস-এর চেয়ারম্যান ইজরায়েল শাহাকের রিপোর্ট থেকে জানা যায়: "১৯৪৮ খৃঃ ইজরায়েল রাষ্ট্র কায়েমের আগের আরব বসতিগুলির প্রকৃত অবস্থা কি ছিল ইজরায়েল রাষ্ট্রে তা খুবই গোপনীয় ব্যাপার। কোন পুস্তিকা, কোন বই, কোন প্রচারপত্রে তাদের সংখ্যা বা অবস্থান সম্পর্কে কিছু পাওয়া যাবে না। এটা উদ্দেশ্যমূলক। কারণ স্কুলের ছাত্রদের শেখাতে হবে, বিদেশী সফরকারীদের বোঝাতে হবে যে প্যালেস্টাইন একটি জনশূন্য এলাকা ছিল।"

প্যালেস্টাইনীদের ঘরবাড়ী ধ্বংস ও উৎখাতে ইজরায়েলী সন্ত্রাসে মোশে দায়ানের ভূমিকা প্রথম থেকেই ছিল উল্লেখযোগ্য। তার

নেতৃত্বে একটি অভিযান চালান হয় লিড্ডার ১৯৪৮ খৃঃ ১১ জুলাই। ইহুদি লেখক ডেভিড কিমসে লিখেছেন: "ইহুদি সন্ত্রাসবাদীরা গুলী চালাতে চালাতে লিড্ডায় প্রবেশ করে। একটা বিশৃঙ্খল ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। প্রায় তিরিশ হাজার আরব হয় পালিয়ে গেল অথবা তাদের তাড়িয়ে নেওয়া হল রামাল্লার দিকে। পরদিন রামাল্লার আত্ম-সমর্পণে সেখানকার আরবদের একই পরিণতি ঘটে।"

ইহুদি সন্ত্রাসবাদীরা আটচল্লিশের বাইশে এপ্রিল মধ্য রাত্রে আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালায় হাইফায়। পাকাবাড়ী, রাস্তাঘাট দখল করে নেয়। হতবাক প্যালেস্টাইনীদের নারী ও শিশুসহ বন্দরের দিকে ঠেলে দেওয়া হয়। ভীত সন্ত্রস্ত এইসব পলায়নপর আরবদের ওপর চলল বর্বর হামলা। একশরও বেশী আরব সেদিন হত্যা করা হয়। আহতের সংখ্যা ছিল দুশরও বেশী।

ইজরায়েলী ধ্বংসলীলার ভয়ঙ্কর রূপ বর্ণনা করেছেন ওদেশেরই সাংবাদিক ও সৈনিক আমোস কেনান: "ইউনিট কমাণ্ডার আমাদের বললেন, আমাদের সেকটরে তিনটি গ্রাম বেইট নুরা, আমস ও ইয়ালু উড়িয়ে দিতে হবে। নিরস্ত্র ব্যক্তিদের পোটলা-পুটলী বাঁধার সুযোগ দিয়ে পাশ্ববর্তী বেইট সুরা গ্রামে সরে যেতে বলা হবে। তারা যাতে আবার ফিরে না আসতে পারে, সেজন্য গ্রামে ঢোকার পথগুলো দেওয়া হল বন্ধ করে। মাথার ওপর দিয়ে গুলি করার নির্দেশ ছিল। দুপুরে এল বুলডোজার এবং গ্রামের প্রথম বাড়ীটাকে শুইয়ে দিল।"

ইজরায়েলী দখলদার কর্তৃপক্ষ নবুলাসের পূর্বদিকে নবুলাস শহরের কাছে অবস্থিত আকরাবী গ্রামের ফসল জমির ওপর বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যভর্তি ডজন ডজন পত্র নিক্ষেপ করে। পাঁচশত হেক্টর পরিমাণ যে ফসলের জমিতে ফসল কাটার মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি ছিল, সেগুলি পরিণত হয় পতিত ভূমিতে।

এ সম্বন্ধে ফরাসী পত্রিকা, 'লে নুভেল অবজারভতুর' ইজরায়েলী পত্রিকা 'আল হামিশমার' ও 'দাভার'-এর সংবাদদাতাদের তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে বলেন এই ঘটনাকে কিছুতেই বৈমানিকের ভুল বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না। ঐ এলাকায় আর একটি ইহুদি 'কিবুটজিম' স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইজরায়েলী সামরিক বাহিনী ইচ্ছাকৃতভাবে এলাকাটিতে গুল্মপত্রনাশক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। ইজরায়েলী প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী কেউই আকরাবীর কৃষকদের লিখিত আবেদন পত্রের কোন জবাব দেন নি।

ইজরায়েলীরা বাহাত্তর সালের এপ্রিল থেকেই অধিকৃত আরব এলাকায় ফসল নষ্ট করতে থাকে। ইজরায়েলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান স্বীকার করেন যে, ইজরায়েলী সৈন্যরা বিমান থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে অধিকৃত আরব এলাকার ফসল নষ্ট করেছে। তিনি বলেছেন যেহেতু আরব গ্রামবাসীরা বেআইনীভাবে চাষ করেছিল সেই জন্যেই তাদের ফসল নষ্ট করা হয়। তিনি জানান ইজরায়েলী সৈন্যরা মাত্র একশ পঁচিশ একর ভূমির ফসল নষ্ট করেছে। কিন্তু ইজরায়েলী সংবাদপত্রের খবরে প্রকাশ ইজরায়েলী বিমানগুলি সাড়ে বারশ একরেরও বেশী জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। বারবার এইভাবে রাসায়নিক বিষ ছড়ানোর ফলে ঐ এলাকার জমিগুলি চিরকালের মত নষ্ট হয়ে গেছে। আর কোন দিন ফসল জন্মাবে না।

আকরাবী গ্রামে ইহুদি বসাবার পরিকল্পনানুসারে এটি করা হয়।

সানডে টাইমসের ডেভিড হগেন উল্লেখ করেন বিমান থেকে বিষাক্ত দ্রব্য নিক্ষেপ করেই আকরাবী গ্রামের কেবলমাত্র ফসল নষ্ট করা হয় নি—বহু জমিও দখল করা হয়েছে। ঘরবাড়ী ছেড়ে গ্রামের পাঁচ হাজার মানুষ পালিয়ে গেলে ইহুদিরা তাদের জমি জায়গা ঘরবাড়ী দখল করে। গ্রামবাসীদের ক্রমে গোচারণ ভূমির দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে।

অধিকৃত আরব অঞ্চলগুলিতে দ্রুততার সঙ্গে বিদেশ থেকে আনা বহিরাগতের বসতি গড়ে উঠছে। মুসলমান অধ্যুষিত হেব্রোন শহরে এখন সবই প্রায় নতুন বাসিন্দার মুখ। সহর বা গ্রামের নতুন নামাকরণ হচ্ছে। শারম-অল-শেখের নতুন নাম ওফিরা। এখানে কয়েক শত ইহুদির বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। ইজরায়েলীদের জন্য ফ্ল্যাট বাড়ী তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে নবুলাস, জেনিন এবং রামাল্লায়। ১৯৫১ খৃঃ শেষ দিকে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার পূর্ব য়ুরোপ থেকে আগতদের গোলান পাহাড়ে বসতি স্থাপনের আবেদন জানান। আর ইজরায়েলের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ইগাল আলোন বলেন, অধিকৃত এলাকায় কেবল কৃষি বসতি নয়, ইহুদি শহর গড়ে তুলতে হবে। ১৯১৯ খৃঃ উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের নেতা চেইন উন জমান বলেছিলেন, প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই সরকার গঠনের দাবী জানাবে। আলোন তাকে অনুসরণ করেই বলেছেন, যে স্থানে যে বাস করবে সে স্থানের মালিকানা তারই। ইহুদিদের অধিকৃত অঞ্চলের বাসিন্দায় পরিণত করলে সে সব জমি হবে তাদের। এইসব বসতি স্থাপনে উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীদের একটি বৃহৎ লক্ষ্য হল প্যালেস্টাইন গেরিলাদের বিরুদ্ধে এইসব নবা-গতদের কালক্রমে অনুগত রক্ষীতে পরিণত করা।

অধিকৃত অঞ্চলে সামরিক সীমারেখা স্থাপনের নীতি বদল ঘটায় ইজরায়েল সরকার। ইজরায়েলের সংবাদপত্রে বলা হয় আবার যুদ্ধ শুরু হলে ইজরায়েলের নিরাপত্তা দৃঢ়তর হবে। কিন্তু মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের নিরাপত্তা বিপন্ন হবে। এখন ইজরায়েলের বিমান বহর কুড়ি মিনিটের মধ্যে কায়রোয় হানা দিতে পারে। যুদ্ধবিরতি সীমানার কাছেই নির্মিত হয়েছে সামরিক বিমান ঘাঁটি ও সরবরাহ ডিপো। প্রধান প্রধান সামরিক ও শিল্প কেন্দ্র থেকে ইজরায়েলের যুদ্ধবিরতি রেখা শত শত কিলোমিটার দূরে সরে গেছে। গোলান পাহাড়ের ওপর এবং জর্ডান নদীর কূলে তৈরী করা হয়েছে ইলেক-

ট্রনিক সরঞ্জাম সজ্জিত আধুনিক দুর্গ। সুয়েজখালের ধারে শক্তিশালী সামরিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। সংরক্ষিত দুর্গ অঞ্চলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আক্রমণাত্মক বাহিনী। দেশের প্রধান প্রধান সামরিক ও শিল্প কেন্দ্রগুলির সঙ্গে অসংখ্য রাস্তাঘাট তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত দুর্গাঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। আকাবা উপসাগরের পাশ দিয়ে ইজরায়েলের সামুদ্রিক বন্দর এইলাত ও মিশরের শারম-অল-শেখ শহরের মধ্যে দুই শত কিলোমিটার দীর্ঘ মোটর চলাচল উপযোগী রাস্তা নির্মিত হয়েছে। অধিকৃত এলাকাগুলি দখলে রাখার কৌশল হিসাবে গড়ে উঠেছে কৃষি বসত হিসাবে পরিচিত কিবুটজিম, নাহাল প্রভৃতি দুর্গ শহর ও ঘাঁটি। সামরিক দিক থেকে এইসব ঘাঁটির গুরুত্ব অসীম। সে সম্পর্কে আলোন বলেছেন: "বসতির জায়গাগুলি বেছে নেওয়ার ব্যাপারে শুধু অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতার কথা বিবেচনা করা হয় নি, স্থানীয় প্রতিরক্ষার প্রয়োজনও বিবেচনা করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ এই প্রয়োজনই সবার উপরে স্থান পেয়েছে।" দেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে ইহুদিদের রাজনৈতিক উপস্থিতি সুনিশ্চিত করাও বসতি স্থাপনের সামরিক লক্ষ্য। বসতিগুলির স্থান নির্বাচনে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে চূড়ান্ত সংগ্রামের উদ্দেশ্যকেই। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সামরিক ঘাঁটি এইসব বসতি। ১৯৫২ খৃঃ এই জাতীয় আধা সামরিক বসতি সিনাই উপদ্বীপে ছয়টি, গোলান গিরিশৃঙ্গে তেরটি, জর্ডানের পশ্চিম তীরে নয়টি এবং জেরুজালেমের কাছে তিনটি স্থাপিত হয়। এই বছরে তৈরি আরও পনেরটি বসতির মধ্যে গাজা ও সিনাইয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য গাজা আরিশ সীমারেখা বরাবর স্থাপিত হয় দশটি বসতি। এই উদ্দেশ্য নিয়েই গোলান গিরির নিম্ন পথে এবং শারম-অল-শেখ-এর দিকে প্রবাহিত রাস্তা বরাবর কিবুটজিম তৈরি করা হয়। নাহাল নামে আধা-সামরিক ঘাঁটি গড়ে উঠেছে সব থেকে ব্যাপক আকারে।

সাতষট্টি সালে অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে ইজরায়েল শক্ত হয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। সামরিক এলাকাভুক্ত হিসাবে ঘোষিত অঞ্চলে প্রথমে বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তারপর সেখানে গৃহ নির্মাণ ও উপনিবেশ গড়ে ওঠে। নবুলাস অঞ্চলের তত্তবাস গ্রামে চল্লিশ হাজার ডওনামস (ডওনামস=০·৯ হেক্টর) জমি নিরাপত্তার প্রয়োজনে বাজেয়াপ্ত করা হলে, কৃষকরা আদেশ অমান্য করে। তখন তাদের ফসলে বিষ মিশিয়ে সেখান থেকে তাদের বিতাড়ন করা হয়। এই অঞ্চলে নতুন ইহুদি উপনিবেশ নাহাল গিটিট স্থাপিত হয়েছে।

বাহাত্তরের ডিসেম্বরে বেথেলহেমের এসকারিয়া গ্রামের পনের শত ডওনামস -এ বোনা আঙুর ও অন্যান্য ফলের খেত মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ইহুদি উপনিবেশিকরা দখল করে। আরব শহর হেবরনে ইহুদি উপনিবেশিকদের সামনে ডায়াস ঘোষণা করেন : "আমি তোমাদের বুলডোজার। হেবরনে যাও, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

জেরুজালেমের আরব অঞ্চলে স্থানীয় অধিবাসীদের ঘরবাড়ী ভেঙে ফেলা হচ্ছে, ব্লক ধ্বংস করা হচ্ছে। ১৯৫৫ খৃঃ মধ্যে শহরের আরব অধ্যুষিত অঞ্চলে দশ লক্ষ ইহুদি উদ্বাস্তু বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। জেরুজালেমের পূর্বে খান আমের অঞ্চলে সত্তর হাজার ডওনামস জমি বাজেয়াপ্ত করে মা এল আদোম-এ একটি ইহুদি শহর গড়ে তোলার প্রস্তুতি চলেছে।

রাজনৈতিক ভীতি প্রদর্শন, অর্থনৈতিক চাপ ও সন্ত্রাস প্রয়োগে ব্যাপকভাবে আরবরা পিতৃভূমি ত্যাগ করছে। এইভাবে ১৯৪৮ খৃঃ -এ প্যালেস্টাইনের কুড়ি লক্ষ আরব জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক এবং ১৯৫৭ খৃঃ অধিকৃত এলাকার মিশরীয় ও সিরীয় সহ আরও চার লক্ষ বিতাড়িত হয়েছে।

ইজরায়েলী পণ্যের সব থেকে বড় বাজার হল অধিকৃত আরব অঞ্চল। ১৯৫৭ খৃঃ এইসব জায়গায় এক কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ডলার

মূল্যের ইজরায়েলী পণ্য রপ্তানী হয়। আর ১৯৫০ খৃঃ রপ্তানী হয় নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার মূল্যের পণ্য। এখানে কোন বিদেশী প্রতিযোগিতা না থাকায় ইজরায়েল সরকার তাদের জিনিসের দাম মাত্রাতিরিক্ত চড়া করেছে। আরবদের কৃষিজাত দ্রব্য ইজরায়েলে ব্যবহারোপযোগী করে আবার অধিকৃত অঞ্চলে পাঠান হয়। তাছাড়া ইজরায়েলের ব্যবসায় সংস্থাগুলি অধিকৃত অঞ্চলের মাধ্যমে তাদের শিল্পজাত দ্রব্য আরব দেশগুলিতে রপ্তানীর চেষ্টা চালাচ্ছে। বাজার নিয়ন্ত্রণ করে সামরিক কর্তৃপক্ষ। কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে শ্রমিকের অভাবে। ইজরায়েলের বিরাট সৈন্য ও পুলিশ বাহিনী থাকায় শ্রমশক্তির প্রচণ্ড ঘাটতি দেখা দিয়েছে। অধিকৃত অঞ্চলে নির্মম পুঁজিবাদী শোষণে নিস্পেষিত শ্রমিক ও অফিস কর্মীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার। আরব শ্রমিকরা ইজরায়েলী শ্রমিকদের থেকে কম মজুরী পায়। এদের মজুরী প্রথমে তাদের মালিক জমা দেয় সরকারের কাছে। সরকার সেই মজুরীর চল্লিশ শতাংশ সমাজ কল্যাণের বিশেষ তহবিলে কেটে রেখে বাকিটা দেয় আরব শ্রমিককে। ১৯৫০ খৃঃ মে পর্যন্ত এইভাবে কেটে রাখা মজুরীর মোট পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচ কোটি ইজরায়েলী পাউণ্ড। অধিকৃত অঞ্চলের আরব শ্রমিকরা ইজরায়েলী শ্রমিকদের তুলনায় এক চতুর্থাংশ মজুরী কম পায়। তাছাড়া ইজরায়েলের আইনও অধিকৃত অঞ্চলের আরবদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়! তাছাড়া এই অঞ্চলের আরবরা কর্তৃপক্ষকে বছরে ছয় কোটি ইজরায়েলী পাউণ্ড ট্যাক্স দিতে বাধ্য।

অধিকৃত অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যাপকভাবে গ্রাস করছে ইজরায়েলী সরকার। অনুসন্ধানের ফলে বিরাট তেল ভাণ্ডার, ওলফ্রাম, তামা, ফেলডস্পার এবং বক্সাইটসহ খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। আল-বিলাইম এবং আবুরুদাইস অঞ্চলে তেলভাণ্ডারগুলি বিকাশের কাজ সুরু হয়েছে। সিনাই উপদ্বীপে ১৯৫৬ খৃঃ তেল

আহরণের পরিমাণ চল্লিশ লক্ষ টন। ইজরায়েলী কোম্পানী নেটিভেই নেফট ১৯৫১ খৃঃ ষাট লক্ষ টন তেল আহরণ করে দশ কোটি ইজরায়েলী পাউণ্ড মুনাফা অর্জন করেছে। সমুদ্র উপকূলে কুড়িটি এবং স্থলভাগে একশটি তৈলকূপ থেকে তেল আহরণ করা হচ্ছে। বছরে এ অঞ্চল থেকে যে তেল উৎপন্ন হয় তার দাম একশত কোটি ডলার। ইজরায়েলের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মেটাচ্ছে মিশরীয় তেল ; আর পরিশ্রুত তেলের একটা বড় অংশ রপ্তানী হ'চ্ছে বিদেশে। বিশেষজ্ঞের ধারণা সিনাই উপদ্বীপ থেকে বছরে চার কোটি টন তেল পাওয়ার সম্ভাবনা। মার্কিন সংস্থাসমূহ ইজরায়েলীদের সঙ্গে তৈল খনির সন্ধান করতে গিয়ে ভূগর্ভস্থ জলের উৎসমুখ আবিষ্কার করে মরুভূমিতে নতুন জীবন সঞ্চার করেছে। মাটির নীচে অতি সামান্য জলযুক্ত যে হ্রদের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার জলের পরিমাণ কুড়ি হাজার কোটি কিউবিক মিটার। এ থেকে কুড়ি লক্ষ লোকের জলের প্রয়োজন মিটবে।

সাতষট্টির ইজরায়েলী আগ্রাসনের ফলে সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর আগে এই গুরুত্বপূর্ণ পথে যে সব দেশের জাহাজ যাতায়াত করত, তাদের বিপুল আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে হচ্ছে। এই পথে তেল সরবরাহ হত। আর ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পাওয়া অর্থের একাত্তর শতাংশই আসত তেল পরিবহন বাবদ। পারস্য উপসাগর অঞ্চলের যে কুড়ি কোটি ষাট লক্ষ টন তেল রপ্তানী হত তার চৌদ্দ কোটি চল্লিশ লক্ষ টন পাঠান হত সুয়েজ খাল দিয়ে। সাতষট্টি সালের আগ্রাসনের আগে যেখানে জাহাজগুলি অতিক্রম করত ৪,৭৬৩ মাইল দূরত্ব, এখন সেখানে অতিক্রম করতে হয় ১১,৮৭৫ মাইল। ফলে তেল পরিবহনের খরচ সাত ডলার থেকে বেড়ে গেছে কুড়ি ডলারে।

সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ায় পুঁজিবাদী দেশগুলির ক্ষতির পরিমাণ বড়ে যায় সব থেকে বেশী। এই পথে যে সব মাল পরিবহন হত তার

দশ ভাগের নয় ভাগই হল এই সব দেশের। মার্কিন বিশেষজ্ঞদের মতে খাল বন্ধ হওয়ার পর থেকে ১৯২২ খৃঃ পর্যন্ত পশ্চিম য়ুরোপ ও জাপানের প্রত্যক্ষ ক্ষতির পরিমাণ হল তিনশ চল্লিশ কোটি ডলার।

খাল বন্ধ হওয়ার সুযোগ নিয়েছে ইজরায়েলী সরকার। ১৯২৯ খৃঃ থেকে তারা স্থলভাগে মাল সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করে। পূর্ব আফ্রিকা, এশিয়া ও ওশেনিয়ার মাল এইলাত বন্দর থেকে ভূমধ্যসাগরের নতুন বন্দর আশদোফে পাঠান হয় লরী করে। সেখান থেকে জাহাজে পাঠান হয় ভূমধ্যসাগরের পূর্ব দিকের বন্দরগুলিতে। উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে মাল পাঠাবার সমপরিমাণ খরচ পড়লেও, এই পথে সময় কম লাগে কয়েক সপ্তাহ।

ইজরায়েল সরকার অধিকৃত অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নতুন পাইপ লাইন বসাতে থাকে। দেশের দুই প্রান্তের মধ্যে স্থাপিত তেলের পাইপ লাইন চালু হয় ১৯২০ খৃঃ ফেব্রুআরি মাসে। একাত্তর সালে এই পাইপ লাইনে এইলাত বন্দর থেকে আশকেলোন-এ দুই কোটি ষাট লক্ষ টন তেল সরবরাহ হয়। পাইপ লাইনের দ্বিতীয় স্তরের কাজ শেষ হলে বছরে ছয় কোটি টন তেল পাঠান সম্ভব হবে। আশকেলোনের কাছে নির্মিত তৈল শোধনাগারে বছরে ত্রিশ লক্ষ টন তৈল শোধন সম্ভব। সুয়েজ খালের পরিবর্তে এই পথ ব্যবহার করাকেই শ্রেয় মনে করে ইজরায়েলী অর্থনীতিবিদরা। সুয়েজখাল পুনর্গঠন ও জাহাজ চলাচল উপযোগী করতে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হবে তার জন্য খাল ব্যবহারকারীকে আরও বেশী অর্থ দিতে হবে। তখন এই পাইপ লাইন ব্যবহারই হবে ইজরায়েলের পক্ষে লাভ-জনক ব্যবসা।

সিনাই উপদ্বীপ দখল করে নেওয়ার পর ইজরায়েলী বিমাণগুলি অনেক কম সময়েই পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যেতে পারছে। আগে ইজরায়েলী বিমাণগুলি নায়রোবী হয়ে জোহানেসবার্গ যেতে হলে

তুরস্কের মধ্য দিয়ে যেতে হত। সময় লাগত ষোল ঘণ্টা। এখন সিনাই উপদ্বীপ থেকে সরাসরি যেতে সময় লাগে এগার ঘণ্টা।

পর্যটন বাবদ বিদেশী মুনাফা অর্জনের পথও প্রশস্ত করেছে অধিকৃত অঞ্চলগুলি। ১৯২৬ খৃঃ এ বাবদ ইজরায়েলী সরকার আয় করে পাঁচ কোটি নব্বই লক্ষ ডলার। আর ১৯২১ খৃঃ তা বেড়ে দাঁড়ায় পনের কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ডলার। জেরুজালেমের অন্তর্ভুক্ত এলাকায়, গোলান গিরিশৃঙ্গ, হেব্রণ, গাজা ও শারম-অল-শেখ শহর-গুলিতে গড়ে উঠছে নতুন পর্যটন কেন্দ্র।

এক স্বৈরাচারী আবহাওয়ায় চলেছে ব্যাপক ধ্বংস কার্য। যাদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করা হয়েছে তাদের দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। প্যালেস্টাইন আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নেই।

অধিকৃত অঞ্চলে ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষের অত্যাচার সম্পর্কে তদন্তের জন্য গঠিত রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ কমিটির দলিলে প্রকাশ, ১৯২০ খৃঃ মানবাধিকার লঙ্ঘনকারী কর্মনীতিকে আরও কঠোর ও নির্মম ভাবে অনুসরণ করে চলেছে উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীরা। জেনেভা চুক্তির উনচল্লিশ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করে ইজরায়েল অধিকৃত অঞ্চলের অধিবাসীদের নির্বাসনে পাঠাচ্ছে। শরণার্থীদের নিজেদের দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এমন কি নিয়মিত ভাবে বসবাসকারীদেরও বলপ্রয়োগে নির্বাসনে পাঠান হচ্ছে। প্রতিরোধে অংশ গ্রহণকারীদের সাহায্য করেছে, এমন সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তির ঘর-বাড়ী ধ্বংস করার নীতিও ঘোষণা করেছে ইজরায়েলী সরকার। চতুর্থ জেনেভা চুক্তির তেত্রিশ ও তিপান্ন ধারার পরিপন্থী এই ঘোষণা। কমিটি ইজরায়েলী সরকারের এই সুপরিকল্পিত আরব বিচ্ছেদ কর্ম-নীতির স্বরূপ উন্মোচন করে দেয়। ১৯২২ খৃঃ ২২ মার্চ মানবাধিকার সংক্রান্ত রাষ্ট্রসংঘ কমিশন ইজরায়েল কর্তৃপক্ষের আচরণকে সামরিক অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করেন।

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিরাপত্তা পরিষদের

১৯৪২ খৃঃ নভেম্বর মাসে ২৪২ নং প্রস্তাবে বলা হয়, অধিকৃত অঞ্চল থেকে ইজরায়েলী সৈন্য অপসারণ, যুদ্ধাবসান এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে ; জেরুজালেম নগরীর জর্ডনভুক্ত এলাকাকে গ্রাস করার ইজরায়েলী ব্যবস্থাকে নিন্দা করা হয় নিরাপত্তা পরিষদের ২৫২নং (১৯৪৮ খৃঃ সেপ্টেম্বর) এবং ২৬১ নঃ (১৯৪৯ খৃঃ) প্রস্তাবে। তাছাড়া ১৯৪১ খৃঃ গৃহীত প্রস্তাবে অধিকৃত অঞ্চলের ভূসম্পত্তি ও স্থাবর সম্পত্তি দখল, অধিবাসীদের অপসারণ ও আইন জারির প্রয়াসকে অনুমোদনযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করে। নিরাপত্তা পরিষদ ইজরায়েলকে বারবার অনুরোধ করে যে, জেরুজালেমের অধিকৃত এলাকায় যেন ইজরায়েলী আইন প্রবর্তন না করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদ ১৯৪১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে ইজরায়েলকে অনুরোধ করে, অধিকৃত অঞ্চলে তার কর্মনীতি যেন বন্ধ করা হয়, ঘরবাড়ী ও বসতি ধ্বংস না করে, ধৃত ব্যক্তিদের সঙ্গে যেন দুর্ব্যবহার না করা হয় এবং নির্বাসিতদের যেন মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঘোষণায় বলা হয় অধিকৃত অঞ্চলে ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রয়াস সম্পূর্ণ অবৈধ।

ক্ষুব্ধ বিশ্ব জনমতকে আশ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে ছয়দিনের যুদ্ধের পর ইজরায়েলী সরকার অবশ্য ঘোষণা করেন, অধিকৃত আরব অঞ্চলে তাদের কোন দাবী নেই। রাষ্ট্রসংঘ সনদের সঙ্গে তারা সম্পূর্ণ একমত।

কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য, কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী মহল ও আন্তর্জাতিক উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্র্যবাদী সংস্থার আর্থিক ও রাজনৈতিক সহায়তায় ইজরায়েল ঔদ্ধত্যের সংগে আন্তর্জাতিক জনমতকে অগ্রাহ্য করতে থাকে। রাষ্ট্র-সংঘের সিদ্ধান্ত সমালোচনা করে অধিকৃত অঞ্চলের ওপর অধিকার প্রমাণে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই সময়ে প্রাক্তণ প্রধানমন্ত্রী বৃদ্ধ বেন-

গুরিয়ান গোলান গিরিশৃঙ্গ ও জেরুজালেমের জর্ডানভুক্ত এলাকা দখলের আহ্বান জানান। ইজরায়েল লেবার পার্টি কংগ্রেসে সাতষট্টি যুদ্ধের আগে ইজরায়েল ও আরব দেশগুলির মধ্যকার সীমান্ত "উপযুক্ত নিরাপত্তার" জন্য পরিবর্তনের দাবী জানান হয়। কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে গোলান গিরিশৃঙ্গ, জেরুজালেমের পূর্বাংশ, গাজা এলাকা এবং শারম-অল-শেখ না ছাড়ার কথা বলা হয়। ইজরায়েল নিজেকে অধিকৃত অঞ্চলের স্থায়ী শাসকরূপে গণ্য করে— ঘোষণা করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান। সরকারী ভাবে জেরুজালেমের আরব এলাকা ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্তকরণের কথা স্বীকার করা হয়। তাছাড়া এখানকার সত্তর হাজার আরব নাগরিককে ইজরায়েলী নাগরিক হিসাবে গণ্য করা হতে থাকে।

চার ॥ আফ্রিকায় ইজরায়েল

মার্কিন ও ব্রিটিশ একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই ইজরায়েলী ছদ্মবেশে আফ্রিকায় অনুপ্রবেশ করেছে। নাইজেরিয়ার সংবাদপত্র ডেইলী এক্স্‌প্রেস লেখে: "আফ্রিকা মহাদেশে প্রবেশের পথ খুঁজে বের করার ব্যাপারে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-চেটিয়া পুঁজিপতিরা ইজরায়েলী অংশীদারদের সাহায্যে তাদের নিজস্ব পুঁজি লগ্নীর জন্য ইজরায়েলী অংশীদারদের কাজে লাগাচ্ছে··· ইজরায়েলী শাসকগোষ্ঠীর কার্যকলাপ প্রমাণ করছে যে আফ্রিকা মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদের নয়া-উপনিবেশবাদী কর্মনীতি রূপায়ণের জন্য ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদের পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে মাত্র।"

আমেরিকার বশংবদ ভৃত্যের মতই ইজরায়েল আফ্রিকায় নানা ধরণের সাম্রাজ্যবাদী কাজকর্মে লিপ্ত। স্বাধীন আফ্রিকার প্রগতির পথে ইজরায়েল হল অন্যতম প্রতিবন্ধক। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে ইন্ধন জুগিয়ে আভ্যন্তরীণ কলহ সৃষ্টি করে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংকট ডেকে আনছে। পনেরটিরও বেশী আফ্রিকান রাষ্ট্রের সঙ্গে ইজরায়েল নানা ধরণের মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়। ইজরায়েল এমন সম্পদশালী ও অর্থনীতিতে বলিষ্ঠ দেশ নয়, যে, আফ্রিকায় ব্যাপক-ভাবে সাহায্য ছড়াতে পারে। সবই মার্কিন পুঁজিপতিদের বিনিয়োগ ইজরায়েলী সংস্থার মাধ্যমে। বিভিন্ন আফ্রিকান রাষ্ট্রের উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত রয়েছে ইজরায়েলে উচ্চ শিক্ষিত বিশেষজ্ঞরা। আফ্রিকার বহু ছাত্র, সরকারী কর্মী, শ্রমনেতা, সামরিক বাহিনীর লোকজনকে ইজরায়েলে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে।

ইজরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা ইবান ১৯৪১ খৃঃ জুন মাসে ঘোষণা করেন: "আফ্রিকায় আমাদের উপস্থিতির পরিচয় বহন করছে আমাদের প্রতিষ্ঠিত উনত্রিশটি রাষ্ট্রদূতাবাস, ইজরায়েলে অধ্যয়নরত দশ হাজার আফ্রিকান ছাত্রছাত্রী, আফ্রিকায় কর্মরত এক হাজার ইজরায়েলী বিশেষজ্ঞ এবং আফ্রিকান রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে গড়ে ওঠা আমাদের যোগাযোগ।"

আফ্রিকা মহাদেশের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে আকৃষ্ট ইজরায়েলের শাসকগোষ্ঠী। আফ্রিকা মহাদেশে ইজরায়েলী সম্প্রসারণ নীতি সর্বতোভাবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ সমর্থিত। এ হল নয়া-উপনিবেশ-বাদী কর্মনীতিরই অঙ্গ। পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই লক্ষে ইজরায়েলকে মদত জোগাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্যে অবিশ্রাম আগ্রাসনে যে বিচ্ছিন্নতার ভাব দেখা দেয়, তাতে আতঙ্কিত ইজরায়েলী শাসকগোষ্ঠী আফ্রিকা জুড়ে তাদের মিত্র সন্ধানে বেরোয়। স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা চালায় যে, ইজরায়েল ও স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তাদের কাছে আদর্শ রাষ্ট্র হতে পারে ইজরায়েল। আফ্রিকায় কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও মতাদর্শগত অনু-প্রবেশে ইজরায়েলের রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যাপক কর্মনীতি অনুসরণ করতে থাকে।

স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির দরকার বৈদেশিক ঋণ, ধারে মাল পাওয়ার ব্যবস্থা ও দক্ষ বিশেষজ্ঞ। এই সুযোগে ইজরায়েল আফ্রিকায় অর্থনৈতিক, কারিগরী ও অন্যান্য সাহায্য নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু এই সাহায্যের লক্ষ অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা দূর করা নয়; ইজরায়েল ভিন্ন স্বার্থে পুঁজিবাদীপন্থা অনুসরণকারী রক্ষণশীল আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য পাঠাচ্ছে।

আফ্রিকার বাজার হল ইজরায়েলী পণ্যের অন্যতম বিক্রয়কেন্দ্র। এই বাজার বেশ লাভজনকও। ইজরায়েলী পণ্য য়ুরোপীয় বাজারে

প্রতিযোগিতায় হেরে যাচ্ছে। আরব রাষ্ট্রগুলিও আবার তাদের পণ্য বয়কট করেছে। সুতরাং আফ্রিকার বাজার না পেলে ইজরায়েল পণ্য সংকট সম্মুখীন হবে। বর্তমানে ইজরায়েলের মোট রপ্তানীর অর্ধেক যায় আফ্রিকায়।

ইজরায়েলের সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে আফ্রিকায় বহু যৌথ শিল্পসংস্থা গড়ে ওঠে। ১৯৪৩ খৃঃ মাঝামাঝি এই জাতীয় সংস্থার সংখ্যা ছিল প্রায় বিয়াল্লিশটি। একটি বৃহত্তম কারিগরি সংস্থা হল সোলেম বোনে। আক্রায় একটি আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, পূর্ব নাইজেরিয়ায় বিলাস বহুল হোটেল, বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিম নাইজেরিয়ায় সুদৃশ্য পার্লামেণ্ট ভবন তৈরী করেছে ইজরায়েল। সামরিক প্রভুত্ব বিস্তারে তার দৃষ্টিও সজাগ। ইজরায়েলের উদ্যোগে আইভোরি কোস্টে একটি সামরিক ঘাঁটি নির্মিত হয়েছে।

আফ্রিকায় ইজরায়েলী সাহায্য পরিকল্পনা রচনা করে দেয় মার্কিন বিশেষজ্ঞরা। মার্কিন গবেষক লিওপোল্ড লাফারের 'ইজরায়েল অ্যাণ্ড দি ডেভলপিং নেশনস: নিউ অ্যাপ্রোচ টু কো-অপারেশন' গ্রন্থে ইজরায়েল-আফ্রিকা যৌথ উদ্যোগের স্বরূপ উন্মোচিত হয়ে গেছে। তিনি পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছেন, এ হল সম্প্রসারণবাদী ইজরায়েলের প্রভুত্ব বিস্তারের কৌশলমাত্র। যার ফলে, আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলি অধিক মাত্রায় ইজরায়েলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মিশ্র পুঁজি সমন্বিত কোম্পানিগুলি চালু রয়েছে ঘানা, দাহোমে, লাই-বেরিয়া, সিয়েরা লিওন, আপার ভোলটা এবং অন্য কয়েকটি রাষ্ট্রে।

আফ্রিকার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে কাঁচা মাল হিসাবে সংগ্রহ করতে আগ্রহী ইজরায়েল। যার ওপর মার্কিন পুঁজিপতিদেরও লোভ দীর্ঘকালের। এই সব কাঁচা মাল আমদানী করতে পারলে ইজ-রায়েলের শিল্প বিকাশ সম্ভব হবে, অর্থনীতি সুদৃঢ় হবে। সেই সঙ্গে লাভবান হবে মার্কিন পুঁজিপাতরাও। নিজের শিল্প দ্রব্যের ঔৎকর্ষ প্রচারের জন্য ইজরায়েল আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রে ক্রমশ তার রপ্তানীর

পরিমাণ বাড়াচ্ছে। এই পরিমাণ ১৯৪৩ খৃঃ ছিল ১১'৬ মিলিঅন ডলার এবং ১৯৪৫ খৃঃ ছিল ২১'৫ মিলিঅন ডলার।

সামরিক কায়দায় গড়ে ওঠা ইজরায়েলী কৃষি ব্যবস্থা আফ্রিকায় কৌশলে রপ্তানী করা হয়েছে। তেরটি আফ্রিকান রাষ্ট্রে জাতি গঠনের কাজে লিপ্ত হয় ইজরায়েলী বিশেষজ্ঞরা। রাষ্ট্রগুলি হল : ক্যামেরুন, মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র, চাদ, দাহোমে, আইভরি কোস্ট, লাইবেরিয়া, মালয়ি, নাইজেরিয়া, সেনেগাল, তানজানিয়া, তোগো উগাণ্ডা এবং জাম্বিয়া। এইসব বিশেষজ্ঞদের আবার দেখা যায় বলিভিয়া, ইকুয়েডর, কোস্টারিকা ও সিঙ্গাপুরে।

ইজরায়েলী গুপ্তচর আফ্রিকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে, ট্রেড ইউনিয়নে, মহিলাসংগঠনে, সমবায় সংস্থায় এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। শ্রমিক সংগঠনগুলির সামরিকীকরণ হচ্ছে। এমন কি ইজরায়েলী অনুকরণে আফ্রিকান যুবসমাজকে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন করার উদ্দেশ্যে ইজরায়েলী বিশেষজ্ঞরা লাইবেরিয়া, মালয়ি লেসোথো, গাবোন ও ক্যামেরুনে বেশ সক্রিয় হয়ে ওঠে।

আফ্রিকার যেসব রাষ্ট্রের সরকার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংস্কারের পথ অনুসরণ করছে, সেখানে নাশকতামূলক কাজের দায়িত্ব ইজরায়েলের ওপর অর্পণ করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ। আফ্রিকার প্রগতিশীল আন্দোলন সম্পর্কে গোপন সংবাদ সংগ্রহ ও তাকে কাজে লাগাবার জন্য সিআইএ এবং ইজরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা চুক্তিবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষায় ইজরায়েল আফ্রিকায় জাতীয়তার উন্মেষকে ধ্বংস করতে নানা চক্রান্তের জাল ছড়িয়েছে।

আফ্রিকা এবং আরব রাষ্ট্রগুলির মুক্তি আন্দোলনে ভাঙন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র ও ইজরায়েলের মধ্যে গড়ে উঠেছে মৈত্রী। দু দেশের সেনাবাহিনী আজ একই উজি মেশিনগানে সজ্জিত। দুটি দেশকে একই লক্ষ্যে ঘাঁটি

হিসাবে ব্যবহার করছে সাম্রাজ্যবাদীরা। ইজরায়েলী নেসেতের দুইজন সদস্য ই, শোসতাক এবং শ. তামির প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ইজরায়েল দক্ষিণ আফ্রিকালীগ।' এই মিত্রতার কারণ দু দেশের অভিন্ন স্বার্থ ও সমস্যা। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ইজরায়েলে পুঁজি রপ্তানির ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে নি। ১৯৪৭ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকার উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদীরা ইজরায়েলে এক কোটি স্টার্লিং সাহায্য পাঠায়। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কোন বাধা সৃষ্টি না করে বলেন, এই সাহায্যের উদ্দেশ্য হল 'মানবিক ও দাতব্য।' দক্ষিণ আফ্রিকার গুপ্ত ফ্যাশিস্ত সংগঠন 'ব্রোয়েডর বণ্ড' ইজরায়েলে প্রচুর অর্থ সাহায্য পাঠায়। ইজরায়েলী পুঁজির ছত্রছায়ায় স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির অথনীতিতে দক্ষিণ আফিকার পুঁজিপতিরা অনুপ্রবেশ করেছে। উভয় সরকার গেরিলা বিরোধী যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে। ইজরায়েলে তৈরি আরভো বিমান যায় দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ব্রিটিশ নকশায় তৈরি ৬৫ টনের ট্যাঙ্ক পাঠায় ইজরায়েলে। আরবদের কাছ থেকে ১৯৪৭ খৃঃ ইজরায়েলে যেসব অস্ত্রশস্ত্র দখল করে, তা বিক্রয় সম্পর্কেও দু দেশের মধ্যে চুক্তি হয়।

রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে, ১৯৪৮ খৃঃ ইজরায়েলের কোন বৈমানিক ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকার বৈমানিকরা চালাত ইজরায়েলী বিমান। সংখ্যায় তারা ছিল আমেরিকানদের পরেই। সেই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের সেনাবাহিনীকে শক্তিশালী করবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইজরায়েলী দূতাবাস খোলা হয ১৯৫২ খৃ.। এই বছরের জুনে প্রধানমন্ত্রী মালান আসেন ইজরায়েল ভ্রমণে। তারপর দু দেশের মধ্যে অতিথি বিনিময় ঘটে।

আরবদের ওপর ১৯৫৭ খৃঃ ইজরায়েলী আগ্রাসনকালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষীরা তার সমর্থনে দাঁড়ায়। এমন কি ভরস্টার

সরকার আটশ স্বেচ্ছাসেবক পাঠায় ইজরায়েলকে শক্তিশালী করতে। জুনের এই আগ্রাসনের পর জোহানেসবার্গের সানডে টেলিগ্রাফ লেখে, দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েল মৈত্রীর লক্ষ্য হল 'কমিউনিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সহযোগিতা প্রশস্ত করা'।

ইজরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকা সেনামণ্ডলীর মধ্যে গভীর যোগাযোগ স্থাপিত হয় ১৯৫৭ খৃঃ জুলাই থেকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মিলিটারি কলেজ ও একাডেমিগুলিতে ইজরায়েলের ছয় দিনের যুদ্ধ ব্যাপক পর্যালোচনা করা হয়েছে প্রতিবেশী আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে আক্রমণ পরিচালনায় ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে। লণ্ডনের ইকনমিস্ট লেখে: "দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলী দৃষ্টান্তে অভিভূত। এখন বেশ বোঝা যাচ্ছে, শ্বেতাঙ্গ দক্ষিণ গেরিলা ঘাঁটি-গুলিকে বিধ্বস্ত করবে—সম্ভবত বিমান আক্রমণে এবং নির্মূল করবে।" ইজরায়েলী আগ্রাসনের পর দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দক্ষিণ রোডেশিয়ার স্মিথ সরকারকে মদত দেওয়ার উদ্দেশ্যে জিমবাবি আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়ন এবং আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিলের মুক্তিবাহিনীকে দমনের জন্য সৈন্য পাঠায়।

ইজরায়েলের সেনানায়ক, পার্টি নেতা ও গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানরা জোহানেসবার্গে ঘনঘন যাতায়াত সুরু করে। মধ্য-প্রাচ্যে বৃহত্তম বিমান নির্মাণ সংস্থা ইজরায়েলী এয়ার ক্রাফট ইণ্ডাস্ট্রীর জেনারেল ডিরেক্টর ও চিফ ইঞ্জিনিয়ার সহ একটি উচ্চ পর্যায়ের সামরিক প্রতিনিধি দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় ১৯৫৭ খৃঃ জুনের পর। সে সময়ে তেল আভিভ ও প্রিটোরিয়ার মধ্যে সম্পা-দিত চুক্তি অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরভো বিমান এবং আরবদের কাছ থেকে দখল করা অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ১৯৫৯ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণে যান প্রাক্তন ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী ডেভিড বেন গুরিয়ন এবং সামরিক গুপ্তচর বিভাগ প্রধান জেনারেল হাইম হেরজোগ। কিমবারলে-তে ওপেনহাইমারের ভবনে দক্ষিণ

আফ্রিকা গুপ্তচর বিভাগের প্রধানের সঙ্গে মিলিত হন জেনারেল হেরজোগ।

ইজরায়েল সমরাস্ত্রের ব্যবসা শুরু করেছে ১৯৫৫ খৃঃ থেকে। ইজরায়েলী সমর শিল্প বিভাগের জেনারেল ডিরেক্টর আয়রনি ইজহাক জানান, ১৯৫৭ খৃঃ তুলনায় ১৯৫০ খৃঃ পাঁচ গুণ বেশী অস্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে। ১৯৫০ খৃঃ ইজরায়েল দক্ষিণ আফ্রিকায় দশ মিলিঅন ডলারের অস্ত্র পাঠায়। পরের বছর এই পরিমাণ হল কুড়ি মিলিঅন ডলার। ইজরায়েলী অস্ত্রের বৃহত্তম ক্রেতা দক্ষিণ আফ্রিকা। বেলজিয়ামের মাধ্যমে ইজরায়েল দক্ষিণ আফ্রিকাকে উজি সাব মেশিনগান উৎপাদনের লাইসেন্স দিয়েছে। ইহুদি সংবাদ সংস্থা ১৯৫০ খৃঃ ২০ জানুআরি লণ্ডন থেকে জানায়, "সহযোগিতার নতুন অধ্যায় সূচিত হচ্ছে ইজরায়েলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সরবরাহের মাধ্যমে।" ট্যাঙ্ক ছাড়াও, দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের জন্য বিবিধ উপকরণ উৎপাদন করছে। তেলআভিভ দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নাপাম আমদানি করে। দক্ষিণ আফ্রিকা ইজরায়েলের জেরিকো ও গ্যাবরিয়েল ক্ষেপণাস্ত্র সংগ্রহ করে। তাছাড়া ইজরায়েলের ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি এবং বিমানও কিনে থাকে।

ইজরায়েলের প্রধান রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং সংস্থা টেডিরান এবং দক্ষিণ আফ্রিকার এস, এফ. ফ্কাস অ্যাণ্ড কোম্পানির মধ্যে চুক্তি অনুসারে শেষোক্ত সংস্থা অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণের লাইসেন্স পায়। টেডিরান হল মার্কিন সংস্থা জেনারেল টেলিফোন অ্যাণ্ড ইলেকট্রনিকসের সত্তর শতাংশ অংশীদার। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর এই সংস্থায় পঞ্চাশ শতাংশ শেয়ার আছে।

ইজরায়েলের এমন ক্ষমতা নেই, যার দ্বারা নিজের সম্পূর্ণ সমরাস্ত্র সংগ্রহ করতে এবং বিদেশে সরবরাহ করতে পারে! তার পশ্চিমী মুরুব্বিরা ইজরায়েলের সমর শিল্প বিকাশে ব্যাপকভাবে সাহায্য করে চলেছে। ওয়াশিংটন ও তেলআভিভের মধ্যে চুক্তি অনুসারে

তেলআভিভ ব্লুপ্রিণ্ট ও অস্ত্র নির্মাণের লাইসেন্স পায়। তেলআভিভ ১৯৫১ খৃঃ পঁচাত্তর মিলিঅন ডলার মূল্যের অস্ত্র বিক্রয় করেছে। কয়েক বছরের মধ্যে অস্ত্র বিক্রয়ের লভ্যাংশ দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়াবে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় চলেছে ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি। ইতালির সংবাদপত্র রিনাসিটা লেখে ঃ "দেশটি একটি বিরাট অস্ত্র গুদাম। যা পশ্চিমী শক্তিবর্গ অনবরত ভর্তি করছে।" সামরিক খাতে ব্যয় গত দশ বছরে বেড়েছে সাত গুণ। ১৯৫২ খৃঃ এই পরিমাণ হল পাঁচ শত মিলিঅন ডলার। একমাত্র অস্ত্রক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে দেড়শত মিলিঅন ডলার।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও ইজরায়েলের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতাকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। ১৯৫৫ খঃ থেকে ১৯৫৭ খৃঃ দক্ষিণ আফ্রিকার ইজরায়েলে রপ্তানির পরিমাণ বাড়ে দ্বিগুণ আর ইজরায়েল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় রপ্তানির পরিমাণ পাঁচগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ১০'৭ মিলিঅন ডলার। এ থেকে অবশ্য হীরকের ব্যবসাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ খৃঃ ইজরায়েল তিনশ মিলিঅন ডলার মূল্যের পরিশোধিত হীরক রপ্তানি করে। ইজরায়েল অপরিশোধিত হীরকও আমদানি করে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে।

পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে দুটি দেশের সহযোগিতা ব্যাপকরূপ নিচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পরাজিত জার্মানীর বহু নাৎসী অপরাধী ও বিজ্ঞানী দক্ষিণ আফ্রিকায় আসে উদ্বাস্তু হিসাবে। তারাই এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় পারমাণবিক গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করছে। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে আণবিক অস্ত্র নির্মাণে সক্ষম! সাফরি পারমাণবিক রিঅ্যাক্টর বেশ কয়েক বছর আগেই চালু হয়েছে। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউরেনিআম রপ্তানিতে দক্ষিণ আফ্রিকা আছে তৃতীয় স্থানে। এই রপ্তানির বেশীর ভাগ যায় ইজরায়েলের ডিমন আণবিক গবেষণাগারে। ইজরায়েলের

ইউরেনিআম পরিমাণ অনুল্লেখ্য। পশ্চিমী সংবাদপত্রের অভিমত ইজরায়েল আণবিক অস্ত্র নির্মাণ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে মৈত্রীর সুযোগ নিয়ে।

নেগেভ মরুভূমি ও ওয়াইজমান ইনস্টিটিউটে ইজরায়েলের আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে যুক্ত রয়েছে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা। বিখ্যাত মার্কিন পারমাণবিক রসায়নবিদ এলভিন রাডকোভিস্কি এখন ইজরায়েলের নাগরিক। এই ভদ্রলোক বিগত কুড়ি বছর মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

এসব থেকে সুস্পষ্ট, ইজরায়েল ও দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান মৈত্রীর লক্ষই হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থসিদ্ধি। যা জন্ম দিয়েছে দুটি যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রের—যারা আফ্রিকা ও এশিয়ার শান্তি পথে অন্যতম বিঘ্ন সৃষ্টিকারী।

আফ্রিকায় পর্তুগালের উপনিবেশিক যুদ্ধের সঙ্গেও ইজরায়েল জড়িত। অ্যাংগোলার মুক্তিফ্রন্টের ইশতেহারে প্রকাশ, "উপনিবেশিক যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা তেলআভিভ যে মাঝে মাঝে অস্বীকার করে, সেই অংশ গ্রহণ সম্প্রতি ইজরায়েলে তৈরী এবং অ্যাংগোলায় পর্তুগীজদের দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ধরা পড়ায় প্রমাণিত হয়েছে।" অ্যাংগোলার মুক্তি আন্দোলন সংস্থা গণসংগ্রাম দমনে পর্তুগালকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করায় ইজরায়েলকে অভিযুক্ত করে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ, নয়া উপনিবেশবাদের দালাল হিসাবে ইজরায়েলের ভূমিকা আফ্রিকার স্বাধীন ও মুক্তিকামী দেশগুলির কাছে ধরা পড়েছে। গিনির পররাষ্ট্র দপ্তরের সচিব দামানতাং কামার বলেন: "ইজরায়েলের সহৃদয় সেবা প্রকৃত পক্ষে আফ্রিকার ভূখণ্ড দখলকারী তার অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী অংশীদারদের দেশ জয়ের কর্মনীতির সঙ্গে যুক্ত। ইজরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র এবং ন্যাটো আফ্রিকার স্বাধীনতা ও অগ্রগতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অনুগত মিত্র।"

আফ্রিকায় ইজরায়েলী সম্প্রসারণবাদ আজ প্রচণ্ড বিরোধিতার

ইজরায়েলী বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন দেশে : আফ্রিকার পরিসংখ্যানটি বিশেষভাবে দেওয়া হল।

	মোট বিশেষজ্ঞ	আফ্রিকা
মোট	১৮১৫	১২৬১
কৃষি	৫২৩	২৬১
যুব সংগঠন	২৫৬	২৩৪
ইনজিনিয়ারিং	৬৪	৪২
ওষুধ এবং স্বাস্থ্য	২০২	১৭৩
শিক্ষা	১০৬	১০২
সহযোগিতা প্রকল্প	২৪	২১
ব্যবস্থাপনা	৬৩	৪৬
বিবিধ নির্মাণ ও গৃহপ্রকল্প	৬৫	৪৯
সমাজ কর্ম	২৩	২২
বিবিধ	৪৮৯	৩১১

ইজরায়েলে শিক্ষানবীশ বিদেশীর পরিসংখ্যান।

	মোট শিক্ষানবীশ	আফ্রিকা
মোট	৯০৭৪	৪৪৮২
কৃষি	২২৬৪	৮০৫
সহযোগিতা এবং শ্রম আন্দোলন	১০৪৮	৬৬৪
সমষ্টি উন্নয়ন	৭১২	৪৯৩
যুব নেতৃত্ব	৫২৯	২৮৫
ওষুধ এবং স্বাস্থ্য	২৬৫	২১১
বাণিজ্য, যাতায়াত	১৫৬	৩৭
শিক্ষামূলক ভ্রমণ ও সমাবেশ	১৬২২	৫৩৭
ব্যক্তিগত উচ্চতর শিক্ষা	২৬০	১০২
বিবিধ	২২৪৮	১৩৪৮

সম্মুখীন। ১৯৫৭ খৃঃ আরবরাষ্ট্রগুলির ওপর আগ্রাসনের পর াগিনি ইজরায়েলের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইজরায়েলী বিশেষজ্ঞ, কূটনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের নাশকতামূলক কাজের জন্য ১৯৫২ খৃঃ উগাণ্ডা সরকার শত শত ইজরায়েলীকে দেশ থেকে বহিষ্কার করে। ইজরায়েলী ব্যবসায়ীদের সন্দেহজনক ও অর্থনীতির পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপের জন্য কামপালায় ইজরায়েলী দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে হীরক আহরণকারী ইজরায়েলী পিটুত্র্যাস কোম্পানীর কাজকর্মও বন্ধ হয়ে যায় সরকারী নিষেধাজ্ঞায়। এই বছরেই চাদ প্রজাতন্ত্র, কংগো (ব্রাজাভিল), নাইজেরিয়া, মালী ও বুরুণ্ডী ইজরায়েলী কূটনীতিবিদ ও উপদেষ্টাদের বিতাড়ন করে।

চাদ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন ও সহযোগিতার অবসান ঘটিয়ে বলেন, উগ্র ইহুদি স্বাতন্ত্রবাদী প্রতিনিধিরা যদি চাদ প্রজাতন্ত্রে আর কিছুকাল অবস্থান করে, তাহলে আরব রাষ্ট্রগুলির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে। ব্রাজাভিলে কংগোলী লেবার পার্টির বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ইজরায়েল মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শত্রু। পার্টির মুখপত্র 'ইলাম্বায়' বলা হয়, আফ্রিকার জাতিগুলির মুক্তি আন্দোলন যখন প্রসারিত হচ্ছে তখন পৃথিবীর মানুষ এটা বুঝতে পারছে, ইজরায়েল আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদী অনুপ্রবেশের একটি অস্ত্র, নয়া-উপনিবেশবাদের একটি হাতিহার। তারা আফ্রিকায় তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে চায়। কায়রোয় জিমবাওয়ে আফ্রিকান পিপলস ইউনিয়নের প্রতিনিধি নোকো একটি ঘোষণায় বলেন: "ইজরায়েল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গের দালাল। কার্যক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, তেলআভিভের সহানুভূতি রয়েছে সম্পূর্ণভাবে আফ্রিকায় জাতিদ্বেষী ও উপনিবেশিক সরকারগুলির প্রতি, জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলির প্রতি নয়।"

পাঁচ ॥ আরব দুনিয়া

গত বিশ বছরে আফ্রিকা ও এশিয়ার অন্যতম গতিশীল ভূখণ্ড হল আরব দুনিয়া। এই অঞ্চলের উপনিবেশক ও সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি হয় বর্তমান শতকের পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে। মিশরে ১৯৫২ খৃঃ জুলাই বিপ্লব এবং ইরাকে ১৯৫৫ খৃঃ ও ১৯৫৮ খৃঃ বিপ্লবে প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের অবসান ঘটে। সিরিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রগতিশীল সরকার। আলজেরিয়ার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য মুক্তি আন্দোলনে সূচনা করে এক গৌরবজনক অধ্যায়।

আরব দুনিয়ার বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেবল মুক্তি আন্দোলনে সীমিত থাকে নি। কয়েকটি দেশে এমন কিছু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটেছে যা কেবল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অথবা সামন্ততন্ত্র বিরোধী নয়, পুঁজিবাদেরও বিরোধী। আরব দুনিয়ার প্রগতিশীলশক্তি প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শিকার হয়েছে কখনও কখনও, ইজরায়েলী আগ্রাসন রাজনীতি, অর্থনীতি ও সামাজিক জীবনে ডেকে এনেছে বিপর্যয়। প্রগতিশীল শক্তি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে নয়া সাম্রাজ্যবাদী ও উপনিবেশবাদী চক্রান্তে। তবুও স্বীকার করতে হবে একটা আভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল পরিবর্তন গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য—অঞ্চলটি য়ুরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন মহাদেশের মধ্যে সংযোগরক্ষাকারী। মার্কিন ও ইজরায়েলীদের কাছে এটি হল 'গেট ওয়ে টু আফ্রিকা।' এখানকার তৈল সম্পদ থেকে মার্কিন পুঁজিপতিদের মুনাফার পরিমাণ কম নয়।

আরব জাতিগুলির ক্রমবর্ধমান মুক্তি আন্দোলনে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদীদের আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্খা ভেঙে যেতে থাকে। তখন সেই সব স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্রজোট আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে শুরু করে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ। এই জাতীয় আগ্রাসন আরম্ভ হয় ১৯৫৬ খৃঃ মিশরের বিরুদ্ধে এবং ১৯৫৮ খৃঃ লেবাননে মার্কিন ও জর্ডানে ব্রিটেনের আক্রমণে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সব অপকর্মে অংশ নিয়েছিল নয়া উপনিবেশবাদী পন্থায় মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্খায়। তাছাড়া, মার্কিন যুদ্ধজোটে আরব রাষ্ট্রগুলিকে টেনে আনা সম্ভব হয়নি। 'আইজেনহাওয়ার মতবাদ' অনুসারে আরব দেশগুলিকে অর্থ-নৈতিক ও সামরিক সাহায্যদানের এবং কমিউনিস্ট আগ্রাসন থেকে রক্ষার জন্য মার্কিন সেনাবাহিনী নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল অথবা রক্ষণশীল সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও প্রগতিশীল চিন্তাধারা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অপ্রত্যক্ষ পথ অনুসরণ করতে থাকে। এই সব আরব রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে হাত পা বাঁধা বৃহৎ বিদেশী একচেটিয়া তেল পুঁজিপতিদের কাছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় ইজরায়েলের ওপর। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইজরায়েল বারবার সেই চেষ্টাই করছে। ইজরায়েলী আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলিকে বিরাট সেনাবাহিনী ও বিপুল সম্পদ ব্যবহারে বাধ্য করে নয়া উপনিবেশবাদ এই অঞ্চলে দীর্ঘকালের জন্য আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখতে চায়। প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাষ্ট্রনায়করা নয়া উপনিবেশবাদের শিকার হয়ে আরবদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্য ক্ষুণ্ণ করেছে। এক রাষ্ট্রকে অপরের বিরুদ্ধে উসকে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করেছে। এই হীনতার পথে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয় সৌদি আরব। ওমানের সুলতান শাহী এবং অন্যান্য আরব রক্ষণশীল শক্তিগুলির আচরণও নিন্দনীয়। ইয়েমেনের

প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সৌদি আরব সাহায্য করে ১৯৫২ খৃঃ ইয়েমেন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে। তারপর ইয়েমেনী আরব প্রজাতন্ত্র (উত্তর) এবং ইয়েমেনী জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের (দক্ষিণ) মধ্যে সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করে। সৌদি আরব মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন তৈল ধনপতিদের স্বার্থরক্ষক, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্যের বিরুদ্ধে এক জঘন্য ষড়যন্ত্রকারী।

আরব জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগ্রাম। সেক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ঐক্য ফ্রন্ট। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তেলই আরব জাতিগুলির হাতে প্রচণ্ড অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। আরবদের সংগ্রামের অন্যতম লক্ষ্য নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবানুসারে প্যালেস্টাইন আরবদের বৈধ অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা। প্যালেস্টাইন আন্দোলন ইজরায়েলী আগ্রাসক এবং আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে বিপদ স্বরূপ। সে কারণে তাদের মধ্য থেকে উঠেছে সক্রিয় ও গুপ্ত কার্যক্রম। প্যালেস্টাইন আরবদের মুক্তিযুদ্ধ স্তব্ধ করবার জন্য চলেছে অন্তহীন প্ররোচনা। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি করা হচ্ছে! ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষে থেকে থেকে মেতে ওঠে আরবরা। এর সুযোগ নিচ্ছে বিশ্ব পুঁজিবাদ, ইজরায়েল আর আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। সেজন্য প্যালেস্টাইন আরবদের মুক্তি আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর।

মধ্যপ্রাচ্যের বিরোধ কেবল মিশর, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইজরায়েলের রণাঙ্গণেই সীমাবদ্ধ নেই। প্যালেস্টাইনীদের মুক্তিযুদ্ধ তার বৃহৎ অংশ। চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি থেকে তাদের যারা উৎখাত করেছে, বিগত পঁচিশ বছর ধরে লড়াই চলেছে তাদের বিরুদ্ধে। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, জাতীয় মুক্তি ও শান্তির দাবীতে প্যালেস্টাইনীরা গড়ে তুলেছে বিভিন্ন সংগঠন। তিয়াত্তরের জুলাই মাসে

এক সাক্ষাৎকারে প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার প্রধান ইয়াসির আরাফাত বলেন, প্যালেস্টাইনী জনগণকে নির্মূলের জন্য একটি ইহুদি মার্কিন ষড়যন্ত্র রয়েছে। তিনি বলেন, প্যালেস্টাইনীদের সামনে তাদের অধিকার পুনরুদ্ধারে একটি মাত্র পথ খোলা রয়েছে, তাহল সশস্ত্র সংগ্রাম। প্যালেস্টাইনীরা দীর্ঘ পঁচিশ বছর অপেক্ষা করেছে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি।

প্যালেস্টাইন গেরিলা সংগঠন আল-ফাতাহের জন্ম ১৯৫৭ খৃঃ ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বে। প্যালেস্টাইন ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গড়ে তোলেন হাওয়াত মেহর। আর একটি গেরিলা সংগঠন পপুলার ফ্রণ্ট গড়ে ওঠে জর্জ হাবাসের নেতৃত্বে।

প্যালেস্টাইনীরা কেবল ইজরায়েলের দ্বারা আক্রান্ত নয়, মার্কিন তাঁবেদার জর্ডান ও লেবাননের সরকারও তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। সেকারণে প্যালেস্টাইনীয় গেরিলারা পিতৃভুমির মুক্তির জন্য লড়ছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে, আর আত্মরক্ষার জন্য লড়তে হচ্ছে লেবানন ও জর্ডানের সঙ্গে। লেবানন ও জর্ডান থেকে গেরিলা আক্রমণের তীব্রতা এক সময় ইজরায়েলী অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছিল। আমেরিকার তৈল স্বার্থের পাহারাদার ইজরায়েলের বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনায় সিআইএ বিস্তৃত চক্রান্ত জালে জড়িয়ে পড়ে লেবানন আর জর্ডান। আর প্যালেস্টাইন গেরিলা দমনের দায়িত্ব লেবানন ও জর্ডানের সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়।

জর্ডানের বাদশাহ হোসেনের সেনাবাহিনী প্যালেস্টাইন শরণার্থী শিবিরে নৃশংস হামলা চালায় ১৯৫০ খৃঃ সেপ্টেম্বরে। হাজার হাজার অসহায় নারীশিশুর ক্রন্দন আর রক্তবন্যায় কেঁপে উঠেছিল জর্ডানের মাটি আকাশ। শরণার্থী শিবিরগুলির বীভৎসরূপ হয়ে উঠেছিল ইজরায়েলী হানাদারদের আচরণের অনুরূপ। কিন্তু গেরিলাদের প্রচণ্ড প্রতি আক্রমণে নাভিশ্বাস ওঠে বাদশা হোসেনের। অস্ত্র

সাহায্য চাইলেন আমেরিকার কাছে। কেবলমাত্র প্যালেস্টাইনের গেরিলাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে, এই শর্তে প্রচুর মার্কিন অস্ত্র এল জর্ডানে। ব্রিটেনও জর্ডানকে সাহায্য পাঠায়। ভূমধ্যসাগরে যথারীতি মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের পাঁয়তারা শুরু হয়ে যায়। দশদিন ব্যাপী গৃহযুদ্ধে বাদশাহ হোসেনের উন্মত্ত মারণাস্ত্র সজ্জিত সুসংগঠিত বাহিনী কয়েক হাজার প্যালেস্টাইনীকে হত্যা করে। ঘটনাটি আন্তর্জাতিক মোকাবিলায় পৌঁছায়। জর্ডানে মার্কিন হস্তক্ষেপ ও সোভিয়েত হুঁশিয়ারীতে গড়ায়। প্যালেস্টাইন গেরিলা নেতা আবু দাউদ এবং অন্যান্য গেরিলাদের অভ্যুত্থান ঘটাবার অভিযোগে প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দেন বাদশাহ হোসেন।

লেবাননে গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় ১৯৫৮ খৃঃ। লে. গৃহীত সরকারের অনুরোধে মার্কিন নৌসেনা সে দেশের মাটিতে পদার্পণ করে।

লেবাননের বেশ কিছু অঞ্চলে প্যালেস্টাইন শরণার্থীদের শিবির গড়ে উঠেছিল। ১৯৫৩ খৃঃ সাতই মে রাতের অন্ধকারে সাবরা, চাটিলা ও বার্জেআল বার্জেন শরণার্থী শিবিরে ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে লেবানন বিমান বাহিনী। কামান, মর্টার ও ট্যাঙ্কের সাহায্যে আক্রমণ চালায় স্থলবাহিনী। লেবাননের হকার হান্টার জঙ্গী বিমান বা-আল-বাকের কাছে গেরিলাদের ওপর রকেট বর্ষণ করে। লেবানিজ মিরাজ বিমান খুব নীচু দিয়ে উড়ে বোমা বর্ষণ করে। অসহায় হাজার হাজার প্যালেস্টাইনীকে সেদিন এই নৃশংসতার শিকার হতে হয়েছিল। কিন্তু এই বর্বরতার প্রতিরোধ করেছিল গেরিলারা বীরত্বের সঙ্গে। লেবাননের একখানি মিরেজ তারা ভূপাতিত করে।

প্যালেস্টাইন সংবাদ সংস্থা ওয়াফা সংবাদ দেয়, লেবাননে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের নির্মূল অভিযান শুরুর পর থেকেই

জর্ডানের সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হয়। আম্মান ও অন্যান্য শহরে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

লেবানন সরকারকে বার্ষিক দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার ডলার সামরিক সাহায্য দানের সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া মার্কিন অস্ত্র কেনার জন্য অতিরিক্ত আরও এক কোটি ডলার লেবানন সরকারকে দেওয়া হয়।

সত্তরের তিক্ত গৃহযুদ্ধের পর জন্ম ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের। আজ সারা দুনিয়ায় যার আতঙ্কে চলেছে ব্যাপক ভীতি। এদের কার্যক্রম দুনিয়া জুড়ে। ১৯৫১খৃঃ পনেরই ডিসেম্বর কায়রোর এক হোটেলে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি তালকে হত্যা করে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর সদস্যরা। মিউনিখে ইজরায়েলী ক্রীড়াবিদদের হত্যা এবং খার্তুমে সৌদি আরবের দূতাবাস অভিযান এদের চরমপন্থা অনুসরণের পরিচায়ক।

অনেকে মনে করেন জর্জ হাবেশের পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইনের (পি এফ এল পি) দলভুক্ত ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গোষ্ঠী। অবশ্য তারা এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে জর্জ হাবাশের বক্তব্যের থেকে উদ্ধৃত করেন : "সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা নিষ্পেষিত জনগণের বিপ্লবের এই যুগে জনতার শিবিরের তৎপরতার কোন ভৌগোলিক বা নৈতিক সীমানা থাকতে পারে না। আজকের দুনিয়ায় কেউ নির্দোষ নয়, কেউ নিরপেক্ষ য়য়।" আবার ইজরায়েলী গোয়েন্দা রিপোর্ট থেকে জানা যায় ব্ল্যাকসেপ্টেম্বর হল আল-ফাতাহেরই গোপন শাখা। এই চরমপন্থীদের সঙ্গে তুর্কী ডেভজেন গেরিলা দল, জাপানী চরমপন্থী গেরিলা দল, পশ্চিম জার্মানীর মেইন হফ গেরিলা সংগঠনের যোগ গভীর।

প্যালেস্টাইনের তরুণরা কেন বেছে নিল এই চরম পথ? মনে রাখতে হবে এই সব দুর্ধর্ষ মানুষদের জন্ম জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া ও মিশরের শরণার্থী শিবিরে—যারা বেঁচে আছে রাষ্ট্রসংঘের ভিক্ষায়।

ওরা দীর্ঘ পরীক্ষায় আরব রাষ্ট্রনেতাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তাই আজ এগিয়ে গেছে এক চরম নৃশংসতার পথে।

আরব রাষ্ট্রগুলিও প্যালেস্টাইনীদের জন্য বিগত পঁচিশ বছরে কোন সাফল্যই এনে দিতে পারে নি। এমন কি এদের সংযত করার মত নৈতিক সাহস পর্যন্ত তাদের নেই। আবার ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের কার্যধারার কোন বিরোধিতা পর্যন্ত করতে পারে না। প্রত্যেক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষে সমর্থন জানায়।

মিউনিখ ঘটনার পর নিরাপত্তা পরিষদে বিভিন্ন দেশে গেরিলা তৎপরতা বন্ধে মার্কিন প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আরব রাষ্ট্রগুলি।

আর সোভিয়েট ইউনিয়নকে দিতে হয় ভেটো।

ইজরায়েলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানের ভাষণ থেকে জানা যায় তিয়াত্তরের প্রথমেই ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর গোষ্ঠী একশ পাঁচটি অন্তর্ঘাত তৎপরতা চালায়। এর মধ্যে আটষট্টিটি ইজরায়েলের ভিতরে, ছয়টি বিদেশে ইহুদিদের বিরুদ্ধে, সতেরটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে এবং চৌদ্দটি জর্ডানে। তারা একশ ষোল জনকে নিহত এবং একশত দুই জনকে আহত করে। তাদের নিহতের সংখ্যা তের।

প্যালেস্টাইন গেরিলা সংগ্রামে আলফাতাহের কর্ম কৌশল ও বলিষ্ঠতায় সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে সৃষ্টি হয় চরম আতঙ্কের। এর নেতৃবৃন্দকে হত্যার ব্যাপক প্রয়াস বারবার ব্যর্থ হয়ে যেতে থাকে। বেরুতে ইজরায়েলী কমাণ্ডো আক্রমণে তিনজন প্যালেস্টাইন গেরিলা নেতা নিহত হন। এই তিনজনই হলেন আল ফাতাহের বিশেষ দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ ব্যক্তি। আল ফাতাহের গোয়েন্দা সংগঠনের প্রধান নিহত কামাল আদওয়ান, জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে গেরিলা আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুতের দায়িত্বে ছিলেন। আন্তর্জাতিক তৎপরতার বিশেষ দায়িত্ব ছিল নিহত গেরিলা নেতা মোহাম্মদ নাজারের

(আবু ইউসুফ) ওপর। অপর নিহত ব্যক্তি হলেন গেরিলা আন্দোলনের মুখপাত্র কামাল নাসের।

খার্তুমে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের হাতে তিনজন পাশ্চাত্য কূটনীতিক নিহত হওয়ায় সুদান সরকার খার্তুমস্থ প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা প্রধান আবদুল লতিফ আবু হাজালিকে গ্রেপ্তার করেন সপরিবারে। সুদানের প্রেসিডেন্ট গাফ্‌ফার আল নিমেরীর প্যালেস্টাইন বিরোধী অভিযান এবং প্যালেস্টাইনীয় মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধংদেহী মনোভাবের সঙ্গে এই ঘটনা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্যালেস্টাইন মুক্তিযুদ্ধে 'চে গুয়েভাবা' নামে পরিচিত মোহাম্মদ আল-আসাদ ইজরায়েল অধিকৃত আরব অঞ্চলে একটি অ্যাকসনকালে ইজরায়েলী সৈন্যদের হাতে কয়েকজন যোদ্ধাসহ ধরা পড়েন। তাদের হত্যা করা হয়।

সমস্ত আরব রাষ্ট্রই সহানুভূতিশীল প্যালেস্টাইনীয়দের ব্যাপারে। কিন্তু তারা পুরোপুরি সামরিক প্রস্তুতি নিক এবং পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের জন্য তৈরি হোক, এরকম কোন সুবিধাই আরব রাষ্ট্রগুলি দিতে চায় না। জর্ডান ও লেবাননের ইজরায়েল সংলগ্ন সীমান্ত, যেখানে প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তুদের সংখ্যা বেশী এবং সামরিক প্রশিক্ষণের দিক থেকে উপযুক্ত, যে সব স্থান থেকেও তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। এমন কি সিরিয়ায় সহযোগিতার দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল এক সময়।

বার বার ইজরায়েল আর আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে বিপর্যস্ত হচ্ছে প্যালেস্টাইনের মানুষ। কিন্তু ওদের কাছে আজ দেশপ্রেম অনেক বড়। মৃত্যু ধ্বংস আর ঘৃণার বাষ্পে ওরা শুদ্ধ। তার মধ্যেই জন্ম মুক্তিবাহিনীর—যার লক্ষ্য পিতৃভূমির সার্বিক মুক্তি। লড়াই ছাড়া আর কোন পথ নেই ওদের। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠতা বেশী। সাহায্যের ভারও তাদের বেশী।

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব রাষ্ট্রেই ছড়িয়ে আছে প্যালেস্টাইনী শিক্ষিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী, কবি, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার

অধ্যাপক। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল উচ্চপদে আছে প্যালেস্টাইনের শিক্ষিত মানুষ। আরব জনগণকে সচেতন করবার দায়িত্ব তারা পালন করে চলেছে নিষ্ঠার সঙ্গে। প্যালেস্টাইন সমস্যা নিয়ে যে রাজনীতির খেলাই চালাতে চেষ্টা করুন না কেন আরব নেতৃবৃন্দ, প্যালেস্টাইন মুক্তি আন্দোলন কিন্তু এগিয়ে চলেছে তার স্থির লক্ষ্যে। আল ফাতাহের মুখপত্র আল মাশিরাহে বলা হয়েছে: "বিশ শতকের জনগণ বিপ্লবী আন্দোলন থেকেই নেবে বিপ্লবের অভিজ্ঞতা ও অনুপ্রেরণা এবং নিজেদের সমস্যা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করেই করবে সমাধান"

আরব দুনিয়ার হালচাল যেমন বিচিত্র, তেমনি বিস্ময়কর। দেশের অধিকাংশ মানুষ গরীব। উনিশটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের দশ কোটি আরবের মধ্যে বিত্তবানের সংখ্যা সীমিত। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ ফরাসী ও তুর্কী উপনিবেশবাদ এবং দেশীয় সামন্ততন্ত্রের অধীনে বাস করে এদের জড়ত্ব যেন আজও লেপমুড়ি দিয়ে আছে। ইজরায়েল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এদের আক্রোশ অন্তহীন। কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক নৈপুণ্যের কোন ক্ষেত্রেই এরা ইজরায়েলকে বিগত পঁচিশ বছরে হারাতে পারেনি। তার একটি প্রধান কারণ আরব রাষ্ট্রগুলির অনৈক্য।

সিরিয়া, মিশর, আলজেরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেনের লক্ষ্য সমাজতন্ত্র। এদের রয়েছে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা। সৌদি আরব, মরক্কো ও জর্ডানে রয়েছে রাজতন্ত্র। টিউনেশিয়া, মরিতানিয়া এবং লেবাননে 'উদার গণতন্ত্র' প্রচলিত থাকলেও সমাজতন্ত্রের নামগন্ধ নেই। লিবিয়া পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে চলতে চায়। সুদানে দক্ষিণপন্থী সরকার। বাহেরিন, কুয়ায়েত, ওমান, কাতার, আবুধাবি, এবং আরো ছোট ছোট কয়েকটি আরব রাষ্ট্রে চলছে আমিরী শাসন বা পারিবারিক প্রভুত্ব।

সামাজিক বিভিন্নতা এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হলেও আরবরা ভাষা ও ধর্ম বিষয়ে এক প্রাণ।

শত শত বছরের পুরোণ ঐতিহ্য আরব রাষ্ট্রগুলিতে আজও কোথাও কোথাও সজীব রয়েছে। মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যের তৈল সমৃদ্ধ দেশগুলিতে সর্বাধিক পত্নী ও উপপত্নী রাখা ছিল একটি আভিজাত্যের ব্যাপার। আজও এই ঐতিহ্য অম্লান। সৌদি আরবের বাদশা ফয়-জল এই দিক থেকে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলিকে হার মানিয়েছেন। বাদশার উপপত্নীর সংখ্যা মোট উননব্বই জন। তেল শূন্য মরক্কোর বাদশার উপপত্নীর সংখ্যা সব থেকে কম অর্থাৎ বত্রিশ।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অংশের মত মধ্যপ্রাচ্যেও উপনিবেশিক শাসন অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্ত চিহ্নিত করার কাজ অমীমাংসিত থেকে গেছে। যার ফলে আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। সীমান্ত নিয়ে ইরাক কুয়ায়েত সংঘর্ষ তিয়াত্তরের মার্চে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। সৌদি আরব এবং দুই ইয়েমেনের সীমান্ত সমস্যার কোন নিষ্পত্তি হয়নি।

ইরাক-কুয়ায়েত সীমান্ত সংঘর্ষ দীর্ঘকালের। ১৯৩২ খৃঃ ইরাক দাবী করে কুয়ায়েত তার অঞ্চল বসরা প্রদেশের অংশ। ১৯৩৫ খৃঃ জেনারেল আবদুল করিম কাসেম বলপ্রয়োগে কুয়ায়েত দখলের হুমকী দিয়েছিলেন। ১৯৩৩ খৃঃ কাসেমের পতন ঘটে। নতুন ইরাকী সরকার এবং কুয়ায়েতের মধ্যে একটা চুক্তি হলেও, সীমানা চিহ্নিত-করণের কাজ অমীমাংসিত থেকে যায়।

তিয়াত্তরের বিশে মার্চ কুয়ায়েত ঘোষণা করে ইরাকী সেনাবাহিনী তাদের দুটি সীমান্ত ফাঁড়ি সামেতা এবং উম কসর আক্রমণ করে। উম কসর নামে আর একটি স্থান ইরাকেও আছে। সেটি হল কুয়ায়েতী উম কসরের বিপরীত দিকে এবং সেখানে সোভিয়েত সাহায্যে নির্মিত হচ্ছে বন্দর। কুয়ায়েত সীমান্তের কাছাকাছি এলাকা রোমেলার সোভিয়েত সহায়তায় তেল খনির উন্নয়ণ হচ্ছে। ইরাকের সমুদ্র উপকূল খুবই ছোট। পাশেই রয়েছে ইরান ও সৌদি

আরব। তাদের সঙ্গে ইরাকের সদ্ভাব নেই। ইরান পারস্য উপসাগরে নিজেকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নৌশক্তি হিসাবে গড়ে তুলতে চায়। তাই রাজনৈতিক স্বার্থে কুয়ায়েতের প্রতি তার সমর্থন। ইরাকের শক্তি বৃদ্ধি আদৌ প্রীতিকর নয় সৌদি আরব এবং ইরানের পক্ষে।

এই সীমান্ত সংঘর্ষ কেন্দ্র করে সোভিয়েত মার্কিন ব্রিটিশ রণতরীগুলি পারস্য উপসাগরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। সৌদি আরব ইরাক-কুয়ায়েত সীমান্তে বিপুল সৈন্য সমাবেশ করে। পারস্য উপসাগরের বহু উচু দিয়ে উড়তে থাকে অসংখ্য জঙ্গী বিমান।

আজকের দুনিয়ায় বারকোটি আরবের ঐকান্তিক কামনা ঐক্য। এই ঐক্যের মধ্যেই আরবদের রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক, দুর্দশা দূর হবে এবং আরবদের মধ্যে বৈষম্য দূরীভূত হবে। অবশ্য আরব জনগণ ঠিক এইভাবে চিন্তা করে না। বলা যায়, আরব নেতারা এভাবে জনগণকে সচেতন করেন নি। আরব জনগণকে শেখান হয়েছে ইজরায়েলকে খতম করতে হলে তাদের একজোট হতে হবে।

একাদশ শতকে আরবদের ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন সালাহ উদ্দিন আইয়ুবী। তারপর আটশ বছরে আরবদের একতাবদ্ধ করবার জন্য কোন আরব নেতার আবির্ভাব ঘটেনি। বিশ শতকে এলেন নাসের। আরব রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার জন্য মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত তিনি সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস সাফল্য লাভ করে নি।

আরব ঐক্যের আহ্বান জানিয়েছেন, আরব নেতারা বার বার। কিন্তু বলা যায়, এটা একটা কথার কথা। আরব রাষ্ট্রগুলিতে রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ এবং স্বার্থগত দ্বন্দ্ব। এই দিক থেকে নিদারুণভাবে বিভক্ত রাষ্ট্রগুলি একমাত্র ইজরায়েল বিরোধিতায় অভিন্ন। মিশর এবং সিরিয়া রাজতন্ত্র ও শেখতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে, কিন্তু জর্ডান, সৌদি আরব, কুয়ায়েত ও মরক্কোয় রয়েছে রাজতন্ত্র বা

ব্যাপক শেখ স্বার্থ। মিশর, সিরিয়া ও ইরাকে রয়েছে সোভিয়েত প্রভাব। আর জর্ডান ও সৌদি আরব মার্কিন প্রভাবাধীন। লিবিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন বিরোধী (?)। আরব নেতারা সমাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদ এবং গণতন্ত্র সম্পর্কেও বিভিন্ন মতাবলম্বী। ইসলামের ভিত্তিতে আরব জাতীয়তাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায় লিবিয়া। এবং সেই সঙ্গে মধ্যযুগীয় আইন ও প্রথা প্রচলনে অভিলাষী। এই আদর্শে মিশর, সিরিয়া ও লেবাননের কোন আস্থা নেই। লেবানন ব্যস্ত তার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, হোটেল ব্যবসা এবং বিদেশী পর্যটকদের নিয়ে। লেবাননের অর্ধেক মানুষ খৃস্টান আর অর্ধেক মুসলমান। সুতরাং ধর্মীয় ভিত্তি বা ইসলামী আরব জাতীয়তাবাদ লেবাননের অস্তিত্বে প্রচণ্ড আঘাত সৃষ্টি করতে পারে।

তেল সম্পদ সমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলি অন্য শিল্প বিকাশে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি এতকাল। যা কিছু হয়েছে মিশর, আলজেরিয়া, সিরিয়া এবং ইরাকে।

সৌদি আরব, মরক্কো, তিউনিসিয়া এবং বাহেরিনে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সুদান ও উত্তর ইয়েমেনেও সম্ভবত মার্কিন ঘাঁটি আছে।

আরব দুনিয়ায় সব থেকে পুরোণ মার্কিন ঘাঁটি সৌদি আরবের দাহরাণে অবস্থিত। এখানে আমেরিকানরা ঘাঁটি তৈরী করে ১৯৪৩ খৃঃ। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে এবং সৌদি আরব ও কুয়ায়েতে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৫১ খৃঃ ১৮ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব সরকারের মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঘাঁটিটি পাঁচ বছরের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরা নেয়। রিনিউ এর ব্যবস্থা রয়েছে। চুক্তি অনুসারে মার্কিন মিশন সৌদি আরব সৈন্যদের ট্রেনিং দেয়। সৌদি আরব সরকার ১৯৬১ খৃঃ ঘোষণা করেন ইজারাদানের মেয়াদ আর বাড়ান হবে না। কিন্তু তারপর থেকে গভীর নীরবতা ও গোপনীয়তা পালন করা হতে থাকে। আশ্চর্যের বিষয় ঘাঁটি এখনও বর্তমান।

মরক্কোয় মার্কিন সামরিক ঘাঁটি তৈরি করা হয় ফরাসী আমলে। স্বাধীনতা লাভের পরও ঘাঁটিগুলি মার্কিন সরকার ব্যবহার করছে। ষষ্ঠ নৌবহরের পারমাণবিক শক্তিচালিত পোলারিস ক্ষেপণাস্ত্রবাহী ডুবো জাহাজের জন্য আছে একটি ঘাঁটি। বাকী তিনটি বিমান ঘাঁটি। মরক্কোর বিরোধী দলগুলির মতে এইসব ঘাঁটিতে আণবিক বোমা মজুত করা হচ্ছে। মরক্কোর জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির চাপে পড়ে রাবাত সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। চুক্তি অনুসারে ১৯৩০ খৃঃ মধ্যে ঘাঁটিগুলি অপসারণ করার কথা ছিল। কিন্তু মরক্কোর বাদশা হোসেন এবং পরলোকগত মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জন এফ কেনেডির মধ্যে চুক্তি অনুসারে ঘাঁটি আজও গুটিয়ে নেওয়া হয়নি।

তিউনিসিয়ার বিজার্তে ত্রিশ কিলোমিটার এলাকায় নির্মিত মার্কিন নৌ ঘাঁটিটি হল—এই জাতীয় বিশ্বের বৃহত্তম নৌঘাঁটি।

আরব উপসাগর থেকে ১৯৩০ খৃঃ ব্রিটেনের অপসারণের পর বাহেরিনের জুফায়েরে একটি সামরিক ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। আমেরিকা ও বাহেরিণের মধ্যে চুক্তি অনুসারে মার্কিন সৈন্যরা ত্রিশ বছর এই ঘাঁটিটি ব্যবহার করতে পারবে।

মিশরের আয়তন দশ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। কিন্তু চাষের জমির পরিমাণ মাত্র পঁচিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার। কায়রো শহরের মধ্যে মিশে গেছে নীল নদ। শহরের আয়তন দুশ চৌদ্দ বর্গ কিলোমিটার; লোক সংখ্যা চল্লিশ লক্ষ।

ইস্রায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর মিশরের নেতৃত্বে ঘটেছে ১৯৪৮ খৃঃ ১৯৫৬ খৃঃ, এর যুদ্ধ!

ফিল্ডমার্শাল আব্দেল হাকিম আমের এবং প্রধানমন্ত্রী গামাল আবদুল নাসের সুদীর্ঘকালের বন্ধু। সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের এই দুই কর্ণধার তাঁদের জীবনে অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন; সাতষট্টির বিপর্যয়ের পর প্রেসিডেণ্ট নাসেরের পদত্যাগ এবং জনগণের দাবীতে

তাঁর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত চেহারাটা পরিষ্কার ছিল। আমের সন্দেহ করেছিলেন বিপর্যয়ের সমস্ত দায়িত্ব হয়ত তাঁর ওপর পড়তে পারে। বিশেষ করে বহু উচ্চপদস্থ সমর নায়কদের সঙ্গে যখন তাঁকেও গ্রেপ্তার করা হয়, তখন তাঁর পক্ষে সমস্ত পরিবেশ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। একটি গোপন ষড়যন্ত্রও ঠিক এই সময়ে ফাঁস হয়ে যায়। আমের প্রথম আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। কিন্তু দ্বিতীয়বার সফল হয়ে তিনি সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিলেন।

১৯৫২ খৃঃ মিশরে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়। তারপর থেকে এই ক্ষুদ্র দেশটিকে নানান প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং বাইরের চাপ প্রতিরোধ করে প্রেসিডেন্ট নাসের দেশ গঠনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেন। তিনটি বৃহত্তর সংঘর্ষে তাঁকে বিব্রত হতে হয়েছে। দেশের বৃহৎ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছে স্বল্প শক্তি নিয়ে। অন্তরঙ্গ সুহৃদদের সহযোগিতায় এবং দেশের সাধারণ মানুষের আন্তরিক সমর্থনে যে ক্ষমতা পান তা এক বিরাট পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।

রাজা ফারুকের নিদারুণ দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনব্যবস্থা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তাঁর যথেচ্ছ স্বৈরাচার আর ব্যক্তিজীবনে কল্পনাতীত অনাচার দেশের মানুষের কাছে যে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল, সে সব কথা সকলেরই জানা। তাই ১৯৫২ খৃঃ ২৩ জুলাই তারিখে যখন মিশরীয় বাহিনীর একদল তরুণ অফিসার ক্ষমতা দখল করে বিপ্লবী পরিষদ গঠন করে দেশের শাসনভার হাতে নিলেন, তখন তা জনসাধারণের কাছ থেকে বিপুল সমর্থন পায়। এই বিপ্লবী পরিষদে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ব্যক্তিজীবনের পটভূমি বিভিন্ন ধরণের। যেমন গামাল আবদেল নাসের একজন ডাক কর্মচারীর ছেলে; আব্দেল হাকিম আমের এবং আনওয়ার সাদাত কৃষকের সন্তান, আলি সাব্রি প্রভৃতি

কয়েকজন ধনী ঘরের সন্তান। এরা সকলেই ছিলেন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রতিজ্ঞায় ঐক্যবদ্ধ।

ব্রিটিশ শক্তির অসহনীয় উপনিবেশিক শোষণ, সামন্ততন্ত্রের বিষহ বোঝা জমিদারদের পার্টিগুলির (ওয়াফদ, সাদী, লিবারেল ন্যাশনালিস্ট ইত্যাদি) ভাঁড়ামী এবং ব্রিটিশদের আর রাজপরিবারের সঙ্গে তাদের স্বার্থের সংযোগ দেশকে সর্বদিক থেকে এক ভয়ঙ্কর সর্বনাশের গহ্বরে ক্রমেই ঠেলে দিচ্ছিল। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতির সীমা ছিল না। রাষ্ট্রশক্তি হয়ে পড়েছিল অনাচার অত্যাচার আর অবিবেকী কার্যকলাপের কেন্দ্র। ফারুকের বিতাড়ণ-পর্ব আর বিপ্লবী পরিষদ কর্তৃক ক্ষমতা দখল প্রকৃতপক্ষে বিনারক্তপাতেই ঘটেছিল। এই বিপ্লবী পরিষদ খুব গোপনে নিজেদের সংগঠিত করে। প্রথমে তাদের সদস্য সংখ্যা ছিল এক হাজারের মত।

বিপ্লবী পরিষদের কর্মসূচী প্রথম দিকে ছিল অস্পষ্ট। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ফারুককে অপসারিত করে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, উপনিবেশিক শোষণ থেকে জনগণকে মুক্ত করে জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ সাধনে যে তাঁদের প্রতি দেশের সাধারণ মানুষের পূর্ণ সমর্থন আছে, তা তাঁরা বুঝেছিলেন এবং কর্তব্য নির্ধারণে অগ্রসর হন।

ক্ষমতাদখলের পর এই বিপ্লবী সরকার প্রথমেই যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, সেগুলির মধ্যে প্রধান হল লক্ষ লক্ষ একর জমির মালিক জমিদারদের একটি সীমাবদ্ধ পরিমাণের অতিরিক্ত সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করে গরীব কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া—যেটাকে জনসাধারণ বিপুলভাবে স্বাগত জানায়। এই ব্যবস্থা অবলম্বন করতে গিয়ে ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল নতুন সরকারকে।

নতুন সরকারের প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি সর্বতোভাবে পরিচালিত হয় বিদেশী শোষণ আর দেশীয় সামন্ত প্রথা থেকে জাতীয় অর্থনীতিকে, দুর্নীতিগ্রস্ত অফিসার আর সমাজদ্রোহীদের কবল থেকে

দেশের মানুষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে। উপনিবেশিকশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সমস্ত আরব জাতিকে, আফ্রিকেয় জাতিকে ও মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হবার জন্যে তাঁরা আহ্বান জানান। সৈয়দ আর সুয়েজ বন্দরে মোতায়েন ব্রিটিশ ফৌজের বিরুদ্ধে একদিকে কূটনৈতিক অভিযান আর অন্যদিকে গেরিলা যুদ্ধ ১৯৫৪ খৃঃ শুরু হয়—যার ফলে মিশর ছেড়ে চলে যেতে হয় ব্রিটেনকে। এটা একটা বিরাট সাফল্য। কিন্তু আরও কঠিন সংগ্রাম মিশরীয়দের চালাতে হয়েছে বৃহৎ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে।

যে কোন স্বাধীন দেশের মতোই, স্বাধীন মিশরেরও ব্রিটিশ তত্ত্বাবধান থেকে সেনাবাহিনীকে মুক্ত করার প্রয়োজন দেখা দেয় সর্বাগ্রে। মার্কিনরা মিশরকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করতে রাজি হয় একমাত্র এই শর্তে যে, তাকে মধ্যপ্রাচ্যচুক্তিতে (পরবর্তীকালে "বাগদাদ চুক্তি") যোগদান করতে হবে। ফ্রান্স দাবী করে যে অস্ত্রশস্ত্রের জন্যে চড়া দাম তো দিতেই হবে, সেই সঙ্গে উত্তর আফ্রিকায় ফরাসী উপনিবেশগুলির বিরুদ্ধে মিশর কোনরকম প্ররোচনা চালাবে না, এমন কি কোন কথাও বলতে পারবে না। এই সব দাবীর প্রতি কর্ণপাত না করে নাসের চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র কেনার এক চুক্তি করেন ১৯৫৪ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে। তারপর নাসের সরকারকে এক নিদারুণ সঙ্কটে পড়তে হয়।

এর পরের মাসেই মিশর সরকার ছয় দফা এক কর্মসূচী পেশ করেন: (১) দেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদকে ও তার সমর্থকদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করা, (২) সব রকমের সামন্ত প্রথার উচ্ছেদ সাধন, (৩) একচেটে সংস্থাগুলির অধিকার অবসান ঘটানো, (৪) সামাজিক ন্যায়বিচার ও সকলের জন্যে একই আইনকানুন প্রবর্তন (৫) শক্তিশালী একজাতীয় সেনাবাহিনী গড়ে তোলা এবং (৫) দেশে গণতান্ত্রিক নীতিগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

মিশরের বিপ্লবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রবণতা গোড়া থেকেই

সুস্পষ্ট ছিল। অস্ত্র ক্রয়ের ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, সেইটেই আরও তিক্তভাবে মিশরীয়রা উপলব্ধি করে আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। এই আসোয়ান বাঁধ যে শুধু মিশরের প্রায় পনের লক্ষ একর জমিকেই সুফলা করে তুলবে তাই নয়, বিপুল পরিমাণে বিজলী উৎপাদন করে মিশরের শ্রম শিল্পেরও বিরাট অগ্রগতি ঘটাবে। এর জন্যে ১৯৫৪ খৃঃ থেকেই মিশর পশ্চিমী শক্তিগুলির সঙ্গে ঋণ পাওয়ার জন্যে কথাবার্তা চালাচ্ছিল। কিন্তু সুদের খুব চড়া হার ছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন সেই ঋণ দানের বদলে বাস্তবিক পক্ষে মিশরের পররাষ্ট্রনীতিকে আর তার অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা দাবী করে।

অনেক টালবাহানার পর ১৯৫৬ খৃ: জানুআরি মাসে আসোয়ান বাঁধের জন্য ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক কুড়ি কোটি ডলার ঋণ দিতে রাজী হয় এবং ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও সাত কোটি ডলার ঋণ দিতে 'নীতিগতভাবে' সম্মত হয়। কিন্তু কয়েক মাস বাদেই এই দুই দেশ ওই ঋণ দিতে সরাসরি অস্বীকার করে বসে।

মিশরীয়রা আসোয়ান বাঁধ সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিন ঘোষণার জবাব দিল সুয়েজ খালকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে—যে ঘটনাটি উপনিবেশবাদের বিশ্ব অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলে এক প্রচণ্ড আঘাত হানে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য তিন মাস বাদে (অক্টোবর, ১৯৫৬ খৃঃ) মিশরের ওপরে মার্কিন পৃষ্ঠপোষিত ইঙ্গ-ফরাসী-ইজরায়েলী আক্রমণ চলে এবং সে ক্ষেত্রেও উপনিবেশিক এই শক্তিগুলিকে আরেকটি অপমানজনক পরাজয় বরণ করতে হয়।

আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের ফলে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের জনগণ উপকৃত হয়েছেন ব্যাপক ভাবে। মোট ১,২৫০,০০০ ফেদান নতুন জমি চাষ হচ্ছে। নীল নদের সর্বনাশা বন্যা ও খরার হাত থেকে দেশটি রক্ষা পেয়েছে। নীল নদের ধারা এখন সুনিয়ন্ত্রিত। সারা বছর ধরে বাঁধ থেকে জল সরবরাহ করায় দুটি কি তিনটি ফসল তোলা সম্ভব

হচ্ছে। নাসের হ্রদে বছরে পনের হাজার টন মাছ ধরা পড়ছে। আসোয়ান বাঁধ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের জনগণের জীবনে এনে দিয়েছে নতুন দিগন্ত। বহু যুগের যন্ত্রণা মুক্ত হয়েছে তারা। মরুভূমি আজ শস্য শ্যামলা, বিদ্যুৎশক্তি দেশে শিল্প বুনিয়াদকে সুদৃঢ় করেছে।

খালের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করেই সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র তার আধুনিকীকরণ ও আরও সুপরিকল্পিত ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। দুইদিকে জাহাজ চলাচল এবং বহু টন ভারী জাহাজের উপযোগী করে খালকে আরও গভীর করার পরিকল্পনা রচিত হয়। জাতীয়-করণের পর প্রথম দশ বছরে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র সরকার খালের উন্নতিকল্পে যে অর্থ ব্যয় করেন তার পরিমাণ পূর্ববর্তী আশি বছর ধরে সুয়েজখাল কোম্পানী যে অর্থ ব্যয় করেছে তার পরিমাণের তিন গুণ।

পশ্চিমী বিশেষজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণ করে খালটি আগের চেয়ে অনেক ভালভাবে কাজ করে। ১৯৫৫ খৃঃ চৌদ্দ হাজার সাত শত জাহাজ খাল পার হয়, ১৯৬০ খৃঃ আঠার হাজার সাত শত জাহাজ, ১৯৫৫ খৃঃ একুশ হাজার দুই শত জাহাজ খাল পার হয়। সুয়েজ খালই দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। এই উপার্জনের ওপর দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নির্ভরশীল।

এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে বিশ্ব উপনিবেশবাদ যে প্রচণ্ড মার খায়, তার ফলে মিশরের আভ্যন্তরীন অর্থনীতি ক্ষেত্রেও বড় রকমের পরি-বর্তন ঘটে। দেশের ভিতরে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও বিদেশের ওপর নির্ভরশীল শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। মিশর সরকার ব্রিটিশ ও ফরাসী ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে এবং যেসব মিশরীয় প্রতিষ্ঠানে তাদের দশ শতাংশের বেশী পুঁজির অংশ আছে তাদের বাজেয়াপ্ত করেন। যার ফলে মিশরে ব্যবসায়রত সমস্ত জয়েন্ট স্টক কোম্পানীগুলির মোট পুঁজির এক পঞ্চমাংশেরও বেশী রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসে। তেল, তৈল-জাত পণ্য, তুলো ইত্যাদি বিদেশী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়। সেই

সঙ্গে যেসব মিশরীয় সংস্থার উৎপাদন দেশের প্রতিরক্ষার পক্ষে গুরুত্ব-পূর্ণ, সেগুলিকে বিশেষ সামরিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়।

মিশরের বিপ্লবের চরিত্রটা ছিল গোড়ার দিকে জাতীয়তাবাদী ধরণের। শীঘ্রই সেটা এক সামাজিক বিপ্লবাত্মক চরিত্র অর্জন করে এবং আরও গভীরে সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে।

সুয়েজের পরে মিশর সরকার দেশের অর্থনীতিকে বিদেশী নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে তথাকথিত 'মিশরীকরণ'-এর যে কার্যসূচী নিয়েছিলেন (১৯৫৫-৫০), তা সাময়িকভাবে দেশী পুঁজিপতিদের উল্লসিত করেছিল। তারা ভেবেছিল যে এবারে তারা বিদেশী পুজিপতিদের স্থান দখল করবে এবং মিশরে ধনতন্ত্রের সমৃদ্ধি ঘটবে! কিন্তু তাদের সে আশায় ছাই পড়তে বেশী দেরী হয় নি!

এর পরেই মিশরের বিপ্লবে খুব একটা জটিল অবস্থা দেখা দেয়। সিরিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের (সংযুক্ত আরব সাধারণ-তন্ত্র ফেব্রুআরি ১৯৫৮ খৃঃ) ব্যর্থতা এবং সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির দ্বারা এই অধ্যায়টি চিহ্নিত। কিন্তু খুব শীঘ্রই সেই কাল মেঘ কেটে যায়।

এক ডিক্রিজারী করে মিশরীয় বৃহৎ মালিকদের অধীন সমস্ত শ্রমশিল্প প্রাতষ্ঠানকে ও অন্যান্য ব্যবসায় সংস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। তারপর পরপর কতকগুলি ডিক্রিজারী করে সমস্ত ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা সংস্থা, বড় ও মাঝারী দোকান ও ডিপার্টমেণ্ট স্টোর ইত্যাদিকে জাতীয় মালিকা—ধীনে আনা হয়। কৃষি প্রগতিতে এক বিরাট পদক্ষেপ হল দ্বিতীয় ভূমিসংস্কার আইন যে আইন বলে জমিদারী প্রথার সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। চৌষট্টির মার্চে গৃহীত মিশরের নতুন সংবিধানে এক পূর্ণ বিকশিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাকেই দেশের ও জাতির লক্ষ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

মিশর সরকার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় দেশের

শিল্প বিকাশের জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যেতে থাকেন। জাতীয়করণের ফলে শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রবল হচ্ছে। শিল্প উৎপাদনের শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ এবং কৃষি উৎপাদনের শতকরা কুড়ি থেকে পঁচিশ ভাগ সরকারী নিয়ন্ত্রণে। সাত থেকে আট ঘণ্টা কাজের দিন নির্দিষ্ট হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প পরিচালনায় রয়েছে শ্রমিক প্রতিনিধি। কৃষি সংস্কার আইনের জন্য দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গরীব কৃষক পরিবার জমি পেয়েছে। পঞ্চাশ ফেদানের (১ ফেদান = ০.৪২ হেক্টর) বেশী জমি কেউ রাখতে পারবে না। দেশের সমস্ত ধরণের প্রশাসনিক কাজে, এমন কি পার্লামেণ্টে পর্যন্ত এক-অর্ধাংশ পদ শ্রমিক ও কৃষকদের জন্য সংরক্ষিত। দেশের একশত উনচল্লিশটি পরিকল্পনা রূপায়ণের দায়িত্ব পড়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর। যার তিরাশিটির কাজ শেষ হয়েছে ইতিমধ্যে। তার মধ্যে আছে আসোয়ানের জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, আলেকজান্দ্রিয়ায় জাহাজ নির্মাণ কারখানা এবং আবুজাবালায় ওষুধ তৈরীর কারখানা। দেশের শিল্প উৎপাদন বেড়েছে শতকরা চারশ ভাগ; চালের উৎপাদন তিনশ ভাগ; গম ভুট্টা ও জোয়ার শস্য আনুমানিক শতকরা পয়ষট্টি ভাগ। আরব সাধারণতন্ত্রের রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে আছে ট্রানজিসটার রেডিও, ফ্রিজ, টেলিভিশন, ট্রাকটর, মোটর গাড়ী, বাস, তুলা, শুকনো ফল ও তাঁত বস্ত্র। প্রতিটি শিশুর জন্য রয়েছে অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা। ১৯৫২ খৃঃ দেশের আশিভাগ লোকই ছিল নিরক্ষর। সেই হার নেমে গেছে পঞ্চাশের নীচে। কারিগরি ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ঘটেছে।

ইহুদি নেতা বেন গুরিআন বলেছিলেন: "নাসেরকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনি একজন দেশপ্রেমিক। মিশরের মঙ্গলের জন্য তিনি কাজ করেন। মিশরকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী জাতি হিসাবে গড়ে তুলতে নাসেরের অবদান অতুলনীয়।" সাম্রাজ্যবাদী শাসনের কুফল

দূর করতে নাসেরের উদ্যম সক্রিয় না হলে এই ব্যাপক উন্নয়ণ সম্ভব হত না।

আরব সাধারণতন্ত্র বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠভাবে অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীর ভূমিকা। দেশের প্রগতিশীল শক্তিকে উৎখাতের জন্য বুর্জোয়া ও প্রাক্তন বৃহৎ ভূস্বামীর এখনও সক্রিয়। বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা দখলের পর থেকে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলি এবং আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি নাসের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করবার চক্রান্ত চালিয়েও ব্যর্থ হয়। ছাপ্পান্ন সালের ইজরায়েলী আগ্রাসনের পর প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলি প্রকৃত মিত্রের সন্ধান পায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কেন, সদ্য স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের স্পষ্ট কোন ধারণাই ছিল না। যার ফলে উদার সহযোগিতার প্রস্তাব থাকা সত্বেও, আরব সাধারণতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে সাহস পায়নি। সেই পথ মুক্ত করে দেয় সাতষট্টির বিপর্যয়।

কিন্তু যে সুয়েজ খালের ওপর সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র নির্ভরশীল, যার থেকে আয়েই দেশের অর্থনৈতিক ভিত গড়ে উঠেছে, তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় সাতষট্টির শোচনীয় সামরিক ব্যর্থতায়। অবশ্য খার্তুমে সম্মিলিত আরব রাষ্ট্র প্রধানরা এই ক্ষতি পূরণের জন্য উপার্জিত অর্থের প্রায় অর্ধেকটা দিতে সম্মত হন। আপাত সংকট দূরীভূত হলেও ভবিষ্যৎ চলেছে সম্পূর্ণ অনিশ্চতের পথে। খাল খোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ না করে, তাকে কিছু অর্থদানের মধ্যেই সংকট দূরীকরণের প্রয়াসে লাভবান হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ।

১৯৩৭ খৃঃ খাল বন্ধের পর থেকে বর্তমান বছরে এসে ক্ষতির মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার কোটি ডলারেরও বেশী। সুয়েজ খাল বন্ধ হওয়ার পর জাহাজগুলিকে ঘুরপথ অবলম্বন করায় মাল পরিবহণের ভাড়া বেশী দিতে হচ্ছে। জাহাজ কোম্পানীগুলির লাভ বেড়েছে। ১৯৫০ খৃঃ সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে জাহাজযোগে মাল

পরিবহন করা হয় সাত কোটি ত্রিশ লক্ষ টন। দশ বছর পরে এই পরিমাণ হয় ষোল কোটি নব্বই লক্ষ টন। ১৯৩৬ খৃঃ সেই পরিমাণ দাঁড়ায় চাব্বিশ কোটি কুড়ি লক্ষ টন। যা হল বিশ্বের মোট সমুদ্র বাণিজ্যের শতকরা চৌদ্দভাগ। এই বছরে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলি তাদের উৎপাদিত তেলের শতকরা ছত্রিশভাগ সুয়েজ খালের ভিতর দিয়ে চালান করে এবং পশ্চিম য়ুরোপ তার আমদানীকৃত তেলের একতৃতীয়াংশ সুয়েজখালের ভিতর দিয়ে নিয়ে যায়। সাতষট্টি সাল পর্যন্ত পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের বন্দরগুলির শতকরা এক চল্লিশভাগ মাল পরিবহণ হত সুয়েজ খাল দিয়ে। পূর্ব আফ্রিকা ও লোহিত সাগর তীরবর্তী বন্দরগুলির ক্ষেত্রেই হার ছিল শতকরা বত্রিশভাগ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশীয় বন্দরগুলির ক্ষেত্রে শতকরা চব্বিশভাগ। অবশ্য এই হিসাবে তেল বাদে অন্য মাল পরিবহনের হিসাব উল্লেখ করা হচ্ছে।

নাসের মারা যান ১৯৭৯ খৃ; ২৯ সেপ্টেম্বর। চরম ও নরমপন্থী নাসেরাইটরা ক্ষমতা দখলের লড়াই-এ মেতে ওঠে। প্রেসিডেণ্ট সাদাত নরমপন্থীদের অধিকার সুদৃঢ় করতে আলী সাবরি, সারোয়ারী গোমা মাহমুদ ফৌজী এইসব চরমপন্থীদের ক্ষমতাচ্যুত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত হয় পনের বছরের মৈত্রী চুক্তি। কিন্তু মিশরীয়দের কাছে এ ক্ষমতা লড়াই-এর কোন দাম ছিল না। তারা দেখল দিন ঘুরে যায়, বছর পেরিয়ে যায়, কিন্তু হারান জমি ফিরে আসে না। ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে মিশরীয় যুব সমাজ। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুসলীম ন্যাশনালিস্ট কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী গাদ্দাফী প্রেসিডেণ্ট সাদাতকে বোঝালেন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছুই করবে না। তিনি বোঝালেন লিবিয়ার অর্থ আর মিশরের লোকবল আরব দুনিয়ায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে। সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়জল পরামর্শ দিলেন মিত্র বদলের। এই সময়ে মাকিন পররাষ্ট্র সচিব রজার্স এমন কূটনৈতিক খেলা চালালেন, যার ফলে

সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্রের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার স্বরূপ নীচের পরিসংখ্যানটি থেকে মোটামোটি বোঝা যাবে। অবশ্য সাম্প্রতিক বিপর্যয়ের পর এর অনেকখানি পরিবর্তন করতে হচ্ছে।

স্টীল উৎপাদন	৩৭৭,৪০০ টন	৪৯০,০০০ টন	২,২৫০,০০০ টন
যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা	৪০০ ইউনিট	৫২০ ইউনিট	৮,১৫০ ইউনিট
সার	৮৫০,০০০ টন	২,০০০,০০০ টন	৩,৭০০,০০০ টন
পেপার ও কার্ড বোর্ড	৯৫,০০০ টন	১৪৫,০০০ টন	৪৫৯,০০০ টন
সিন্থেটিক উড	৮,০০০ টন	৭০,০০০ টন	১৩৬,০০০ টন
প্লাস্টিক নির্মিত দ্রব্য	২,৭০০ টন	৭,৫০০ টন	৩৭,৫০০ টন
টায়ার	৭,০০০ টন	১৬,২০০ টন	৩১,০০০ টন
কাঁচা তেল	৬,১০০,০০০ টন	৭,৫০০,০০০ টন	১২,০০০,০০০ টন
পরিশোধিত তেল	৩,১০০,০০০ টন	৩,৬০০,০০০ টন	৪,৫০০,০০০ টন
কেরোসিন	৮০০,০০০ টন	৯০০,০০০ টন	১,১০০০,০০০ টন
ডিজেল অয়েল	৩০০,০০০ টন	৪০০,০০০ টন	৫০০,০০০ টন
বেনজিন	৩০০,০০০ টন	৫০০,০০০ টন	১,০০০,০০০ টন
চিনি	৩৫৫,০০০ টন	৬৩০,০০০ টন	১,০০০,০০০ টন
সিমেন্ট	২,৪০০,০০০ টন	২,৪০০,০০০ টন	৪,০০০,০০০ টন
অতিরিক্ত স্টীল উৎপাদন	২০০,০০০ টন	৩০০,০০০ টন	৭০০,০০০ টন
কাচ	৩১,০০০ টন	৪৪,০০০ টন	৭৫,০০০ টন
কয়লা	———	১২,০০০ টন	৬২০,০০০ টন
কনক্রেট	৬০০,০০০ টন	১,৫০০,০০০ টন	৪,০০০,০০০ টন
ট্রাক বাস ট্রলি	২,৪৫০ ইউনিট	৪,৬০০ ইউনিট	৬০,০০০ ইউনিট
ট্রাকটর	৬৩২ ইউনিট	৩,০০০ ইউানট	৫,০০০ ইউনিট
অটোমোবাইল	৫,৫০০ ইউনিট	১২,৬০০ ইউনিট	২৫,৬০০ ইউনিট
মটর সাইকেল	———	১৪,৫০০ ইউনিট	২৫,০০০ ইউনিট
বাইসাইকেল	৪২,০০০ ইউনিট	৬০,০০০ ইউনিট	১৫০,০০০ ইউনিট

মিশর থেকে বিশ হাজার সোভিয়েত সামরিক উপদেষ্টাকে বিদায় নিতে হল। লিবিয়া-মিশর-সিরিয়া নিয়ে গড়ে উঠল: ফেডারেশন। কিন্তু আমেরিকার সাহায্য না পেয়ে সাদাত আবার মস্কোর সঙ্গে মৈত্রী জোড়া লাগালেন।

ক্ষমতা হাতে নিয়ে প্রেসিডেণ্ট সাদাত মিশরীয় জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ইজরায়েল অধিকৃত সিনাই পুনরুদ্ধার করা হবে এবং সুয়েজখাল মুক্ত হবে। তাঁর দীর্ঘসূত্রতা এবং কর্তব্য নির্ধারণে অক্ষমতায় জনগণ, সেনাবাহিনী ও ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

সিনাই উদ্ধারের ব্যাপারটিকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার খুঁটি হিসাবে ব্যবহার করেছেন মিশরীয় নেতারা। জনগণের মধ্যে জঙ্গী মনোভাব গড়ে তোলা হয়েছে। সেনাবাহিনীকে আক্রমণ উপযোগী শিক্ষা দিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। তিন লাখ সৈন্য দীর্ঘ ট্রেনিং নিয়েছে। বাঙ্কারে বাঙ্কারে কাটিয়েছে নির্দেশের অপেক্ষায়। ক্রমশ তারা হতাশ হয়েছে। সেই সঙ্গে দানা বেঁধেছে প্রচণ্ড বিক্ষোভ। তাদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে কঠোর হাতে দমন করেছেন প্রেসিডেণ্ট। একশর বেশী সিনিঅর অফিসারকে গ্রেপ্তার অথবা পেনসন নিতে বাধ্য করা হয়েছে। এমন কি সেনাবাহিনীর স্বাধীন চলাচলও পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়। বেশী সৈন্য এক সঙ্গে ট্রাকে চলাফেরা করতে পারে না। বেশ কিছু ইউনিট আটক ব্যারাকের মধ্যে।

সাতষট্টির যুদ্ধে মিশর সিরিয়ার যত ক্ষতি হয়েছিল, সবই পুষিয়ে দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। মিশর সিরিয়ার সেনাবাহিনীকে ট্রেনিং দিয়ে সম্পূর্ণ আধুনিক করা হয়েছে। অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও এসেছে। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট সাদাত জানতেন সিনাই উদ্ধার কঠিন ব্যাপার। তা সম্পূর্ণ সোভিয়েত-মাকিন সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল।

মিশরের পার্লামেণ্ট সদস্যরা বাহাত্তরের দশই ডিসেম্বর সরকারের

সমালোচনা করে বলেন যে, ইজরায়েল অধিকৃত এলাকা উদ্ধারের উদ্দেশ্যে দেশকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করার পরিকল্পনা নেওয়ার কথা সরকার প্রচার করলেও বাস্তবে তা হয় নি। সরকারী ব্যর্থতাকে কঠোরভাবে সমালোচনা করেন পার্লামেণ্ট সদস্যরা।

সরকারের দক্ষিণপন্থী প্রবণতা ও জনগণের মধ্যে ধর্ম উন্মাদনা জাগিয়ে তোলার সুপরিকল্পিত কার্যক্রমের বিরুদ্ধে মিশরের পাঁচশরও বেশী লেখক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীর একটি বিবৃতি গোপনে প্রচার করা হয়। তারা বলেন, বিভিন্ন ধরণের বিধিনিষেধের চাপে মিশরীয় সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটেছে। এসবের মধ্যে আছে সংবাদপত্রের ওপর বিধি-নিষেধ, ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গোঁড়ামী, দুর্নীতি। বাম-পন্থীদের দেশের শত্রু হিসাবে অভিহিত করেন আলেকজান্দ্রিয়া মসজিদের ধর্মপ্রচারকারীরা। বিদেশী পত্রপত্রিকা ও বই আমদানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবী জানান হয়।

প্রেসিডেন্ট নাসের গণতন্ত্রায়ন ও উদারনীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেন। সাদাত সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষার স্বীকৃতি জানালেও, কঠোরতা আরও প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। সরকারের শ্বাসরুদ্ধকর প্রতি-ক্রিয়াশীল নীতিসমূহ প্রত্যাহারের দাবী জানান বুদ্ধিজীবীরা।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার জন্য ১৯৩৮ খৃঃ মিশরীয় ছাত্ররা ধর্মঘট করে। বাহাত্তরের শেষে বিভিন্ন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে দেড়শ ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়। দেশের সর্বত্র ধর পাকড় শুরু হলে ছাত্ররা দিকে দিকে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু করে এবং শ্রমিকরাও ধর্মঘট করে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোক-দের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষ ব্যাপক আকার নেয়। প্রায় দুই হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। অনেককে অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদের পর ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিক্ষুব্ধ জনগণকে শান্ত করতে সাদাত সরকার ভুলত্রুটি প্রকাশ্যে স্বীকার করেন। কিছু কিছু বিধিনিষেধ শিথিল করা হয়। সুয়েজ

খাল বন্ধের জন্য সৌদি আরব, কুয়ায়েত এবং লিবিয়া যে বার্ষিক বার কোটি টাকা দেয় তার সবই জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করতেই ব্যয় করা হয়। শ্রমিকদের মজুরি বাড়ান হয়েছে পঁচিশ শতাংশ। চাষীদের ঋণ মকুব হয়েছে! রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য তাদের উৎসাহিত করা হয়েছে ইসলামী আইন কানুনে। অবশ্য লিবিয়া ও সৌদি আরব এই পথ নিয়েছে ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্যই প্রেসিডেন্ট সাদাত মিশর লিবিয়া সংযুক্তিতে সমর্থন জানান। তার ফলে লিবিয়ার সম্পদের ভাগীদার হবে মিশরীয় জনগণ। সংযুক্তিতে তাঁর আন্তরিক সমর্থন ছিল না।

মিশর ও লিবিয়া একত্রীকরণের জন্য লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়ামে গাদ্দাফির উৎকণ্ঠা এক সময় আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ব্যাপক প্রচার লাভ করে। সেজন্য মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাহাত্তরের ডিসেম্বর থেকে লিবিয়া মিশরকে সুয়েজ খাল বন্ধ বাবদ ক্ষতিপূরণ প্রদান বন্ধ করে দেয়। সৌদি আরব খাল বন্ধের দরুন রাজস্ব বাবদ লোকসান পুষিয়ে দিতে মিশরকে বছরে আট কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ডলার প্রদানের নিশ্চয়তা দেয়। লিবিয়ার সঙ্গে সংযুক্তির প্রশ্নে মিশরের নেতারা খুবই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। গাদ্দাফী বলেন মিশরে সমাজের যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে ঠিক লিবিয়ার ধরণে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালিত হওয়া দরকার। গাদ্দাফী হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন মিশর যদি ধর্ম নিরপেক্ষতা পরিহার না করে এবং ইসলামী আইন-কানুনে ফিরে না যায় সে ক্ষেত্রে তিনি মিশরের সঙ্গে লিবিয়ার সংযুক্তি চান না।

কর্ণেল গাদ্দাফীর মতে লিবিয়ার সাংস্কৃতিক বিপ্লব প্রেসিডেন্ট নাসেরের বিপ্লবেরই সম্প্রসারণ, "আপনাদের এখানে একটি বিপ্লব দরকার, আরও গণতান্ত্রিক চিন্তা, মত প্রকাশ ও কাজের আরো স্বাধীনতা দরকার।"

মিশরীয় সমাজব্যবস্থাকে তীব্র আক্রমণ করে গাদ্দাফী বলেন, "আপনারা কি করে এত সব বার, নাইট ক্লাব, মদ ও জুয়ার সুযোগ রেখেছেন। এগুলো কোন বিপ্লবী সমাজের বৈশিষ্ট নয়। একজন মাতাল কিরে নিজের ও দেশের উন্নতি করতে পারে? একজন মাতাল কি করে সিনাই-এ শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বে?"

আরব দুনিয়ার সব থেকে বিত্তশালী দেশ সৌদি আরবের শিল্পায়ন যেমন অনুল্লেখ্য, কৃষি সম্পদও তেমনি কিছুই নয়। আরব উপ-দ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে অবস্থিত এই দেশটির সর্বময় কর্তা হসেন বাদশাহ ফয়জল ইবনে আব্দুল আজিজ আল সউদ। তার পিতা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন ১৯২৩ খৃঃ থেকে ১৯২৬ খৃঃ মধ্যে। দেশে কোন রাজনৈতিক দল নেই। লোকসংখ্যা ষাট লক্ষের কিছু বেশী। পশ্চিমাঞ্চলেই বাস করে পাঁচ ভাগের তিন ভাগ মানুষ। বেশীর ভাগ মানুষ হল আরব। আমেরিকান ও য়ুরোপীয় আছে বেশ কিছু। প্রায় সাত হাজার পাঁচশ। পূর্ব প্রদেশের তেলাঞ্চল আল-হাসাতেই প্রধানত এদের বাস। আমেরিকানরা বেশীর ভাগ আছে দাহরাণ বিমানঘাঁটির কাছে। সরকারী ভাষা আরবী হলেও, ব্যবসায়ের জন্য ইংরেজি প্রচলিত। রাজধানী রিয়াদে সরকারী অফিসের বেশীর ভাগ থাকলেও, জেদ্দায় হল বিদেশ দপ্তর। পৃথিবীর পাঁচটি বৃহত্তম তৈল উৎপাদনকারী দেশ, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভেনেজুয়েলা এবং ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের নাম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীতে মজুত তেলের একুশ শতাংশই আছে এদেশে। তেল কোম্পানীগুলির সঙ্গে সৌদি আরব সরকারের চুক্তি অনুসারে সৌদি আরব তেল সম্পদের একান্ন শতাংশের মালিকানা পাবে ১৯৩২ খৃঃ নাগাদ। ১৯৩২-৩৩ খৃঃ আট বছরে তৈল মুনাফার পরিমাণ ছিল তিনশ মিলিঅন ডলার। আগামী দশ বছরে এই মুনাফার হার বছরে শতাংশ করে বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

উত্তর আফ্রিকার অন্যতম সম্পদশালী রাজ্য আলজেরিয়ার সঙ্গে

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির ঘটনাবর্ত যেন জড়িয়ে গেছে ওতপ্রোতভাবে। এই দেশে ফরাসী প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়েছিল ১৮৪২ খৃঃ; একদা ফরাসী সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে দাবী করা হত। আলজেরিয়ার মানুষ সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৮৬২ খৃঃ ৩ জুলাই স্বাধীনতা লাভ করে। দেশের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। এক কোটি কুড়ি লক্ষ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই রাষ্ট্রের অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য মদ, ফল, লোহা, জিঙ্ক, তামাক, খাদ্যদ্রব্য। ১৮৬৫ খৃঃ প্রেসিডেণ্ট বেনবেল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী কর্ণেল বুমেদিন রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করেন।

আলজেরিয়া সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে বিরাট সাফল্যের মুখোমুখি। কিন্তু তারও রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। এই সব সমস্যা স্থানীয় ও জাতীয়, আভ্যন্তরীণ ও বহির্দেশীয়; দেশের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে তা জড়িয়ে আছে। আলজেরিয়ার নীতি হল গোষ্ঠি নিরপেক্ষতার নীতি। আলজেরিয়া সক্রিয়ভাবে এগিয়ে এসেছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা ও উপনিবেশবাদ বিরোধিতার অবস্থান থেকে। আলজেরিয়াবাসীরা মনে করেন যে, তাদের নিজেদের প্রগতিশীল বিকাশের স্বার্থের জন্যই প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে, জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে, পুঁজিবাদী দেশগুলির গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সঙ্গে এবং সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সঙ্গে সংহতি ও সহযোগিতাকে শক্তিশালী করা দরকার।

স্বাধীন বিকাশের পথ গ্রহণ করে, আলজেরিয়া বেশ কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়াস থেকেই উদ্ভূত হয় পুরোন বাণিজ্যিক সম্পর্কের পরিবর্তন এবং বিদেশী ভোগ্য পণ্য আমদানির ওপর বিধিনিষেধ প্রবর্তন, আর সেই সঙ্গে শিল্প-সংক্রান্ত সাজসরঞ্জাম আমদানী বৃদ্ধি। আলজেরিয়া রপ্তানী ও আমদানী উভয়েরই নিয়ন্ত্রণভার হস্তান্তরিত করেছে জাতীয় কোম্পানিগুলির কাছে এবং সমস্ত বৈদেশিক বাণিজ্যিক লেনদেনের ওপরে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে।

আজকের আলজেরিয়ার লক্ষ্য হল—সুদৃঢ় জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজ প্রগতি।

তেল উৎপাদন, নিষ্কাষণ এবং বিক্রয় এখন পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে। তেল শিল্পের জাতীয়করণকালে বিপ্লবী সরকারকে বিপদাপন্ন করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস নিষ্কাষণে এখন আলজেরিয়ার বিশেষজ্ঞরা পশ্চিমীদের সমকক্ষ। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ণের ভূমিকা স্মরণযোগ্য

প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রগুলির প্রথম সারিতে ইরাকের স্থান। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদী বেষ্টিত দেশটির পূর্বনাম মেসোপটেমিয়া। এক সময় ছিল তুরস্কের অধীন। ১৯২২ খৃঃ নবগঠিত ইরাকের রাজা হন মক্কার রাজা হুসেনের পুত্র আমির ফৈজল। স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ইরাক রাষ্ট্রসংঘ সদস্য হয় ১৯৩২ খৃঃ। ১৯৫৮ খৃঃ সামরিক অভ্যুত্থানে রাজা ফৈজল নিহত হন। দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৩ খৃঃ আর একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রধান সম্পদ তেল, যা ব্যাপক বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে।

১৯৫৮ খৃঃ বিপ্লবের পর প্রথম কৃষি আইন পাশ হলেও, জমিদারদের জমি কৃষকরা পায়নি। কারণ আইনের ফাঁক দিয়ে বৃহৎ ভূমির মালিকরা নিজেদের অধিকার বজায় রেখেছিল। নতুন আইন প্রবর্তন করে কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা হয়। সমবায় আন্দোলনকে কৃষি সংস্কারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে স্বীকার করায়, জমিদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করা জমির আশি শতাংশের কৃষক মালিক চৌদ্দশত সমবায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যৌথ খামার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। সমবায়ের জমিকে সমাজের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করা হবে। কৃষি সংস্কারের কাজে ইরাকী বাথ পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

ইরাকের অগ্রগতির গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন হল বিদেশী তেল

কোম্পানীগুলির জাতীয়করণ এবং নিজস্ব পথে তেল উৎপাদন। উত্তর রুমেলিয়ার তৈলক্ষেত্রগুলিতে উৎপাদন ও কর্মী প্রশিক্ষণের কাজ করছে জাতীয় তেল কোম্পানী।

ইরাকী প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এ এইচ বাকর ইরাকী পেট্রো-লিআম কোম্পানী জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ১৯৩২ খৃঃ ১ জুন। অসুবিধা সৃষ্টির চেষ্টা করেও কোম্পানী ব্যর্থ হয়। কয়েকটি পেট্রোলিআম সংস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এর ফলে তেল নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে।

দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিকে সম্মিলিত করণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ঐক্য স্থাপনের জন্য বিভিন্ন পার্টি অনুসৃত কর্মনীতির ভিত্তিতে যে খসড়া সনদ তৈরি হয়েছে—তার জন্য প্রচার চালায় বাথ পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং কুরদিশ গণতান্ত্রিক পার্টি।

ইরাকের উত্তরাংশে বসবাসকারী কুর্দরা হল জন সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ। অতীতে আরব-কুর্দ সংঘর্ষের ফলে কোন বৈপ্লবিক পরি-বর্তন ঘটান সম্ভব হয়নি। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে। কুর্দ সমস্যা সমাধানের মধ্যেই ইরাকের সামাজিক অর্থনৈতিক রূপান্তর এবং অগ্রগতি নির্ভরশীল। প্রজা-তান্ত্রিক সরকার কুর্দ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৩০ খৃঃ ১১ মার্চ সাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কুর্দদের ইরাকের অভ্যন্তরে স্ব-শাসনের অধিকার স্বীকৃত হয়। বাথ পার্টি, কুরদিশ গণতান্ত্রিক পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টিকে নিয়ে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট গঠনের চেষ্টা চলেছে, যা ইরাকের রাজনৈতিক জীবনকে উন্নত করবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অন্যতম মিত্র শরীফ হোসেনের বংশধর জর্ডানের বাদশাহ হোসেন। শরীফ হোসেন ইংরেজের সঙ্গে মিত্রতার পুরস্কার স্বরূপ দুই পুত্র আবদুল্লাহ ফয়জলের জন্য দুটি রাজ্যলাভ করেন—একটি জর্ডান এবং আরেকটি ইরাক।

ইরাকে ফয়জল এবং জর্ডানে আবতুল্লাহ বসেন রাজা হিসাবে। আব-তুল্লাহের পুত্র বর্তমান বাদশাহ হোসেন ইবন তালাল। জর্ডানের অধিকাংশ মানুষ মুসলমান। শতকরা বার জন খৃস্টান। মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত ভেদাভেদ রয়েছে। জর্ডান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, বিশেষ করে জর্ডান উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব সব থেকে বেশী। জনগণের শতকরা আশি ভাগ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষি থেকেই আসে জাতীয় আয়ের শতকরা সত্তর ভাগ। জর্ডানের কৃষি জমির মাত্র তিন ভাগের ওপর চাষ হয়। বাকী জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে আছে। অবশ্য কৃষি ব্যবস্থা অনুকূল আবহাওয়ার ওপর নির্ভরশীল। সে রকম অবস্থায় উৎপাদন পরিমাণ দাঁড়ায় তু লক্ষ চল্লিশ হাজার থেকে তু লক্ষ আশি হাজার টনে। জলপাই, কলা, গম, বার্লি, বিন, খেজুর বিদেশে ব্যাপক রপ্তানী হয়। সাবান, সব্জী সংরক্ষণ, জলপাই তেল উৎপাদন হয় ব্যাপক ভাবে। বস্ত্রবয়নদ্রব্য, ভোগ্যপণ্যও উৎপাদিত হচ্ছে। আসবাবপত্র, ব্যাটারী, কাঁচ, ষ্টীলও বর্তমানে তৈরী হচ্ছে। প্রধান রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে আছে ফসফেট, পেট্রোল এবং সিমেণ্ট। জর্ডান থেকে কুয়ায়েত, লেবানন, সিরিয়া, সৌদি আরব, ভারত, যুগো-শ্লোভিয়া, চীন ও তুরস্কে রপ্তানি হয়। আমদানী হয় প্রধানত ব্রিটেন থেকে। তাছাড়া আসে পশ্চিম জার্মানী, লেবানন, সিরিয়া, জাপান ও ইতালি থেকেও।

বাদশাহের কাছে আরব স্বার্থের চেয়ে সিংহাসনের দাম বেশী। অতিমাত্রায় পাশ্চাত্য ঘেঁষা—এই প্রীতির অন্যতম কারণ সিংহাসন। জর্ডানের বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন প্যালেস্টাইনী। প্যালেস্টাইনীদের ভয় পান বাদশা হোসেন।

সম্প্রতি জেরুজালেম মুক্তি কমিটির সমাবেশে এক ভাষণে জর্ডানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সুলেমান নাবুলাস বলেন, রাজনৈতিক দল গঠনের স্বাধীনতা দিয়ে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেণ্ট

গঠন করতে হবে। গণতান্ত্রিক সরকারই প্যালেস্টাইনীদের সমস্যার সমাধান ও ইজরায়েল অধিকৃত পশ্চিম জর্ডানের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারবে। বাদশাহ হোসেনের নেতৃত্বাধীন রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা স্বৈরাচারী সরকার। জর্ডানে রাজতন্ত্র থাকার জন্যই জর্ডান ও প্যালেস্টাইনী জনগণের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

বাদশা হোসেন জর্ডান নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীর যুক্ত করে একটি নতুন ফেডারেশন গঠনের যে প্রস্তাব দেন, মিশর, সিরিয়া ও লিবিয়া সম্মিলিতভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে। প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্যালেস্টাইন সমস্যা বাতিল করা এবং আরব জাতীয়তাবাদকে ভেঙে ফেলা। আল ফাতাহ হোসেনের এই পরিকল্পনার জবাবে জর্ডান থেকে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবী জানায়।

বাদশা হোসেন সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রগঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য ওয়াশিংটন যান। ইজরায়েলী উদ্যোগও কম ছিল না। জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ফউজী প্যালেস্টাইনের একদল প্রতিনিধিকে বাদশাহের প্রস্তাবের বিরোধিতার পরিণতি সম্পর্কে হুশিয়ার করে দেন। এই ব্যাপারে তারা আম্মানে কোন আরব কিংবা অন্য বিদেশী দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলে, জর্ডান সরকার কঠোর ব্যবস্থা নেবেন। কায়রোতে আয়োজিত প্যালেস্টাইন জাতীয় অধিবেশনে প্যালে-স্টাইনের আমন্ত্রিত নেতাদের যোগ দিতে পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। ফ্যাসিস্ত নির্যাতন চালিয়ে জর্ডানের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার ইজরায়েলের স্বার্থরক্ষা করে চলেছেন।

পারস্য উপসাগরের পশ্চিমতীরে অবস্থিত কুয়ায়েতের প্রধান সম্পদ হল তেল। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন শেখ। তার উত্তরাধিকারী হলেন প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান শাসক শেখ সাবাহ আস সেলিম আস সাবাহ। প্রধানমন্ত্রী শেখ জাবির আল আহমদ আল জাবির আস সাবাহ। ১৯৩৩ খৃঃ কুয়ায়েতের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন হয়।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় চার বছর অন্তর। দেশে কোন রাজনৈতিক দল নেই।

তুরস্কের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ১৮৯৯ খৃঃ একুশে জুন শেখ ব্রিটেনের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। চুক্তির ফলে কুয়ায়েতের পররাষ্ট্র নীতির দায় দায়িত্ব চলে যায় ব্রিটেনের হাতে। ১৯৩১ খৃঃ এই চুক্তি অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কুয়ায়েত পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণে স্বীয় অধিকার ফিরে পায়।

মধ্যপ্রাচ্যে কুয়ায়েতের তৈল সঞ্চয় সব থেকে বেশী—বিশ্বের মোট তৈলাংশের ষোল ভাগ। কুয়ায়েতের রাজস্বের পাঁচ ভাগের চার ভাগ আসে তেল থেকে। বাহাত্তর সালে তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল পনের কোটি কুড়ি লক্ষ টন। আর এই তেল উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা ছিল ইঙ্গ মার্কিন মালিকানাধীন কুয়ায়েত অয়েল কোম্পানীর (ব্রিটিশ পেট্রোলিআম এবং মোবিল অয়েল কোম্পানী)। তেল উৎপাদনে জাতীয় প্রতিষ্ঠান কুয়ায়েত ন্যাশনাল পেট্রোলিআম কোম্পানী বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৯৩১ খৃঃ দিনে তিন মিলিয়ন ব্যারেল তেল নিষ্কাষণ হয়েছে। উৎপাদন বাড়ছে বছরে আট শতাংশ। তেলের প্রধান বাজার য়ুরোপ এবং ব্রিটেন। তেল উৎপাদনে এখন জাপান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।

তেল সম্পদ থেকে কুয়ায়েত সরকার বছরে দেড়শ কোটি ডলার উপার্জন করে। সেই অর্থ ব্যয় করা কুয়ায়েতের আজ এক প্রবল সমস্যা: আট লক্ষ ত্রিশ হাজার জন অধ্যুষিত দেশের আয়ের পরিমাণ এত বেশী যে জনসংখ্যা অনুপাতে খরচ করার পরও বিরাট পরিমাণ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা পড়ে। কুয়ায়েতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ এর মধ্যেই ছয় শত কোটি থেকে নয়শত কোটি ডলারের মধ্যে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ সাতচল্লিশ হাজার তিনশত পঁচাত্তর ডলার। বিশ্ব ব্যাংকের মতে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের পরে কুয়ায়েতের স্থান। শত শত বিত্তবান লোকে

দেশ ভরা। কোটিপতিরও অভাব নেই। সীমিত আয়ের লোকেরা সরকারী সাহায্য পায়।

বর্তমান সাতলক্ষ পঞ্চাশ হাজার জন সমষ্টির মধ্যে তিনলক্ষের কিছু বেশী হল কুয়ায়েত এবং বাকি জনসংখ্যা হল ইরানীয় এবং প্যালেস্টানীয়। তাছাড়া আছে মিশরীয়, ইরাকী, সিরীয়, জর্ডানীয় ভারতীয় এবং পাকিস্তানী। চার হাজার থেকে পাঁচ হাজার আমেরিকান এবং য়ুরোপীয়ও বাস করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিআম এবং কয়েকটি পূর্ব য়ুরোপীয় দেশ থেকে কুয়ায়েত একশত কুড়ি কোটি ডলারের অস্ত্র কেনার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শেখ সদে আলআবদুল্লাহ ঐসব দেশ সফর করেন। সরকার নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে।

অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলেও, ইরাকের সঙ্গে বিবাদ বর্তমান।

সৌদি আরব ও লোহিত সাগরের সীমান্তে অবস্থিত ইয়েমেন একটি স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। ১৯৩২ খৃঃ এক সামরিক অভ্যুত্থানে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। একহাজার বছরের সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়ে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন মার্শাল আবদুল্লা সাল্লাল। প্রথম অন্তবর্তী সংবিধান ঘোষিত হয় ১৯৩৩ খৃঃ ১৩ এপ্রিল। ১৯৩৭ খৃঃ গদিচ্যুত হন সাল্লাল। ইয়েমেন জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সানা। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। উত্তর ইয়েমেন অর্থাৎ ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র সৌদি আরবের ছত্র ছায়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ইজরায়েলীরের দ্বারা প্রতিপালিত। ১৯৩২ খৃঃ থেকে ইয়েমেনের দুই অংশে বিবাদ লেগেই আছে।

রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত অনুসারে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে

লিবিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫১ খৃঃ ২৭ ডিসেম্বর। আইন পরিষদে দুটি সভা—সিনেট ও প্রতিনিধি সভা। সিনেটে চব্বিশ জন এবং প্রতিনিধি সভায় আছেন ছাপ্পান্ন জন সদস্য। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ লিবিয়ার কৃষি দ্রব্যের মধ্যে আছে খেজুর, জলপাই, তরিতরকারী, গম, তামাক, টমেটো, আঙুর। তাছাড়া পাওয়া যায় প্রচুর মাছ। বছরে বাদাম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ছয় হাজার টন। জনসংখ্যা আঠার লক্ষ।

প্রধান রপ্তানী দ্রব্য তেল। মোট রপ্তানির প্রায় ৯৯'৫ শতাংশই হল তেল। প্রায় বাইশটি দেশে লিবিয়ার তেল যায়। তার মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশই যায় ইতালি, পশ্চিম জার্মানী এবং ব্রিটেনে। অন্য রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে আছে বাদাম, পশুশুষ্কচামড়া, রেড়ীর বীজ, খেজুর, বিভিন্ন ধাতু মিশ্রণ।

আমদানী দ্রব্যের মধ্যে আছে যন্ত্রপাতি, ট্রাক, মোটরগাড়ী। লিবিয়ার মোট আমদানির পঁয়ত্রিশ শতাংশই হল এই সব দ্রব্য। অন্য উৎপাদিত দ্রব্যের আমদানী পরিমাণ চব্বিশ শতাংশ। খাদ্য দ্রব্য আমদানী হয় পনের শতাংশ। উৎপাদিত আমদানী দ্রব্যের মধ্যে আছে গৃহনির্মাণ উপকরণ, লোহার পাইপ, টিউব প্রভৃতি। একসময় প্রচুর সিমেণ্ট আসত। এখন লিবিয়াতেই সিমেণ্ট উৎপাদিত হচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতি এবং অনুসন্ধান চালাবার যন্ত্রপাতিও বিদেশ থেকে আনতে হয়।

জীবনধারণের মান বেড়ে যাচ্ছে ১৯৫১ খৃঃ পর থেকে। জনগণের হাতে খরচ করবার মত পয়সা আসছে। আর বিদেশ থেকে আমদানী হচ্ছে আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিক উপকরণ, রেডিমেড পোশাক, গৃহদ্রব্য, জুতো এবং রেডিও।

দেশের অর্থনীতির শতকরা নব্বইভাগ পেট্রোলিয়াম নিয়ন্ত্রিত হলেও, গত ছয় বছরে কৃষি উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে। জনগণের তিনভাগের দুইভাগের বাস কৃষি প্রধান অঞ্চলে। তৈল শিল্পে

নিযুক্ত মাত্র চার হাজার লিবীয়, সেক্ষেত্রে কৃষির ওপর নির্ভরশীল তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ। অবশ্য শ্রমিকের সংখ্যা কম হওয়ায় কৃষি ব্যবস্থাও যন্ত্রের ওপর নির্ভর করেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি উৎপাদন চাহিদার মোট চল্লিশ শতাংশ পূরণ করতে পারছে।

আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভেনেজুয়েলা, ইরাণের সঙ্গে সঙ্গে লিবিয়াও বিশ্বের একটি বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। তেল অতি উৎকৃষ্ট ধরণের। তাছাড়া ভৌগোলিক দিক থেকে লিবিয়ার অবস্থান বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল। ১৯৫১ খৃঃ প্রথম থেকে লিবিয়ার তৈল উৎপাদন ছিল দিনে ৩.৩ মিলিঅন এবং ৩৪ মিলিঅন ব্যারেল। কিন্তু দেশের তৈল সঞ্চয়কে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য সরকারী অনুরোধে এই উৎপাদন দিনে ২.২ মিলিঅন ব্যারেল নামিয়ে আনা হয়। ১৯৫১ খৃঃ বারশত পঁচিশ মিলিঅন ব্যারেল উৎপন্ন হলেও, ১৯৫২ খৃঃ উৎপাদন হয় দশ শত দুই মিলিঅন ব্যারেল। অপরিশোধিত তেলের দাম ১৯৫২ খৃঃ চৌদ্দ শতাংশ বাড়াবার ফলে চাহিদাও আঠার শতাংশ হ্রাস পায়। আমেরিকান, জার্মাণ, ফরাসী, অ্যাঙলো-ডাচ, স্প্যানিশ, ইতালীয় ও ব্রিটিশ কোম্পানী তৈল নিষ্কাষণের কাজ চালায়। লিবিয়ার সাতাশিভাগ তেল কেনে পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশ। প্রথম স্থান ইতালির; তারপর পশ্চিম জার্মানী ও ব্রিটেনের স্থান। নতুন ক্রেতা হল আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, রুমানিয়া এবং তুরস্ক।

সম্প্রতি লিবিয়া তিউনিসিয়ার সংগে সংযুক্ত হয়ে ইসলামিক আরব প্রজাতন্ত্র গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রজাতন্ত্রে একটি সংবিধান, একটি পতাকা, একজন প্রেসিডেণ্ট এবং একটি সেনাবাহিনী রাখবার সিদ্ধান্ত হয়। এই সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র কতদূর সার্থক হবে সে বিষয়ে প্রথম থেকে ছিল যথেষ্ট সন্দেহ। দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বৈসাদৃশ্য অন্তঃহীন। তিউনিসিয়ার প্রেসিডেণ্ট বারগুইবা হলেন ধর্মনিরপেক্ষ উদারচিত্তের

আধুনিক মানসিকতার অধিকারী। লিবিয়ার কর্ণেল গাদ্দাফী হলেন ইসলাম জাতীয়তাবাদে আস্থাশীল নিষ্ঠাবান ধর্ম বিশ্বাসী।

কিন্তু কোন আরব রাষ্ট্রেরই সংযুক্তিকরণ চূড়ান্ত সাফল্যলাভ করতে পারেনি। ১৯৫৮ খৃঃ মিশর ও সিরিয়া সংযুক্তিকরণ ঘটলেও তা ভেঙে যায়। এই বছর মে মাসে জর্ডান ও ইরাকের মধ্যে যে ফেডারেশটি গঠিত হয় তা ভেঙে যায় ছয় মাসে। ১৯৫১ খৃঃ মিশর সিরিয়া—ইয়েমেনের মধ্যে গঠিত কনফেডারেশনটিও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ১৯৫১ খৃঃ থেকে মিশর ও লিবিয়া এককীকরণের যে প্রয়াস চলেছে আজও তা কার্যকরী হয়নি।

তিউনিসিয়ার অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত। কিন্তু দেশটি অত্যন্ত গরীব। অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষিত দক্ষ কারিগর ও বিশেষজ্ঞে সমৃদ্ধ দেশটি লিবিয়ার তৈল সম্পদকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধিশালী হবে, সম্ভবত এই আশার আলো দেখে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বারগুইবা। কিন্তু তা সফল হয়নি।

উনত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার জনসংখ্যা বিশিষ্ট লেবাননের ইসলাম ও খৃস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের ব্যাপক বসবাস রয়েছে। ভাষা হল আরবি, ফরাসী ও ইংরেজি। বেরুত ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় সত্তর হাজার আর্মেনিআন বাস করে। তাছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক আসিরিয়ানের বাসও আছে লেবাননে। বসবাসকারী ছয় হাজার আমেরিকান প্রধানত বাণিজ্য জাহাজী কারবার, শিক্ষা প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত। ফরাসীরা সংখ্যায় পাঁচ হাজার সাতশ এবং ইংরেজ পাঁচহাজার তিনশ। একদা অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লেবানন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে দখল করে মিত্রশক্তি। ফরাসী শাসনে ছিল ১৯৪১ খৃঃ পর্যন্ত। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৪৪ খৃঃ ১ জানুআরি। ঐতিহ্যানুসারে দেশের প্রেসিডেন্ট হবেন খৃস্টান, প্রধান মন্ত্রী ও পার্লামেন্টের স্পীকার হবেন যথাক্রমে সুন্নী ও শিয়া মুসলমান। পার্লামেন্টের

সদস্য সংখ্যা নিরানব্বই। সদস্যরা নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। প্রেসিডেণ্টের কার্যকাল ছয় বৎসর।

সংবিধান অনুসারে দেশের প্রতিটি মানুষের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কোন রাষ্ট্রীয় ধর্ম নেই। রাষ্ট্রীয় রীতি অনুযায়ী প্রতিটি ধর্ম সংগঠনই নিজেদের বিদ্যালয় রাখতে পারে। প্রধান দুটি ধর্ম খৃস্টান হল শতকরা তিপান্ন এবং মুসলমান শতকরা ছেচল্লিশ। এদের মধ্যে নানা সম্প্রদায় ভেদও আছে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম বাণিজ্য কেন্দ্র লেবানন। বেরুত মুক্তাঞ্চল। সামান্য কলকারখানা আছে। প্রধানত কৃষি প্রধান দেশ। খেজুর, কলা, জলপাই, আঙুর, আপেল, তাল, তরমুজ, পিঁয়াজ, ধান, গম, বার্লি, ভুট্টা উৎপন্ন হয়। চার হাজার একর জমিতে বছরে চার হাজার টন তামাকের চাষ হয়। দেশের কৃষি যোগ্য জমির পরিমাণ হল চল্লিশ শতাংশ। চাষ হয় তার মধ্যে ত্রিশ শতাংশে।

লেবানন সরকার বাণিজ্যের ওপর কোন কড়াকড়ি আরোপ করেন নি। আবগারী শুল্ক থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পশ্চিম য়ুরোপের শিল্পোন্নত দেশগুলি লেবাননে ব্যাপক বাণিজ্য চালায়। আমেরিকার বাণিজ্য পড়তির মুখে। জাপান লেবাননে তার বাণিজ্য প্রসার করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির বাণিজ্যও ক্রমবর্ধমান। সুতিবস্ত্র কারখানা, সিমেণ্ট কারখানা, সিল্ক বস্ত্র কারখানা আছে। বছরে প্রায় দুই মিলিঅন টন অপরিশোধিত তেল যায় বিভিন্ন তৈল শোধনাগারে। চিনি উৎপাদন কারখানা, জিপসাম কারখানা, কাগজ, ও কার্ডবোর্ড কারখানা তৈরী হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে তৈরী হবে, কার্পেট, গৃহনির্মাণ উপকরণ, গৃহস্থালীর উপকরণ, ওষুধ, বস্ত্র ছাপার কারখানা। লেবাননের শিল্প দ্রব্যের প্রধান ক্রেতা সৌদি আরব, ইরাক, জর্ডান, সিরিয়া, কুয়ায়েত এবং লিবিয়া। ১৯৫০ খৃঃ লেবাননের মোট রপ্তানির

শতকরা বাষট্টি ভাগই গিয়েছিল। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে, অবশ্য বেশীর ভাগই যায় সৌদি আরবে।

মিশর আরব সাধারণতন্ত্র, লিবিয়া এবং সিরিয়া আরব সাধারণ-তন্ত্র নিয়ে গঠিত ফেডারেশন অফ আরব রিপাবলিকের সদস্য সিরিয়া। সিরিয়ার বাথ সোসালিস্ট পার্টি এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে ১৯৫৩ খৃঃ। দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর ১৯৫৬ খৃঃ তেইশ ফেব্রুআরি আরও একটি অভ্যুত্থান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে সিরিয়ায় সামরিক অভ্যুত্থান একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে ওঠে। একসময় সিরিয়া ছিল অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রসংঘের ম্যাণ্ডেটেড অঞ্চলের রাজা নির্বাচন নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। ফরাসী সরকার ১৯৩৬ খৃঃ পরীক্ষা-মূলকভাবে তিনবছরের জন্য সিরিয়ার স্বাধীনতা দানের সিদ্ধান্ত নিলেও, তাদেরই কারসাজিতে তা বাতিল হয়ে যায়। ১৯৪১ খৃঃ মিত্রশক্তি সিরিয়া অধিকার করে, তার স্বাধীনতা স্বীকার করে। ১৯৪৯ খৃঃ এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ব্রিগেডিয়ার শিসাকলি শাসন ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৪ খৃঃ সামরিক অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন হাসেম আটাসি। সিরিয়া ও মিশর সংযুক্ত হয়ে আরব সাধারণতন্ত্র গঠিত হয় ১৯৫৮ খৃঃ। ১৯৫১ খৃঃ সামরিক অভ্যুত্থানের পর এই সাধারণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে।

স্বাধীনতা লাভের পর সিরিয়ায় এগারবার সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছে। ১৯৫০ খৃঃ সর্বশেষ সামরিক অভ্যুত্থানের পর হাফেজ আসাদ ক্ষমতায় আসেন এবং বাথ পার্টিতে স্বীয় প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা করতে থাকেন। তার সম্প্রদায়ের লোকদের সরকারী ও বেসরকারী গুরুত্বপূর্ণ পদে বসান। আসাদ হলেন উত্তর সিরিয়ার পার্বত্যাঞ্চলের আলাওয়াইত সম্প্রদায়ভুক্ত। এরা যথেষ্ট বিত্তশালী হওয়ায়—সুন্নী মুসলমানরা এদের প্রতি বিরাগভাজন। সিরিয়ায়

মোট জনসংখ্যার শতকরা সত্তর জনই সুন্নি মুসলমান এবং আলাওয়াইত সম্প্রদায়ের লোকসংখ্যা শতকরা মাত্র দশ ভাগ। সুন্নি সম্প্রদায় থেকে প্রেসিডেন্ট আসাদকে হত্যার চেষ্টা হওয়ায় আসাদ বেশী মাত্রায় আলাওয়াইত সম্প্রদায়ের ওপর নির্ভরশীল।

ষাট সালের অর্থনৈতিক মন্দা ছিল সংকটজনক। তা কাটিয়ে সিরিয়া উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছিল। বার্ষিক মোট উৎপাদন শতকরা তের ভাগ বেড়ে যায়। ফোরাত বাঁধ প্রকল্প সোভিয়েত সহযোগিতায় দ্রুত সমাপ্তির পথে।

মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ দশ বৎসরের বেশী বয়স্ক জনগণ সম্পূর্ণ অশিক্ষিত। রোগের প্রতিষেধক এখনও তাবিজ ইত্যাদি। এদের আধুনিক জগতের সামনে হাজির করতে প্রেসিডেন্ট আসাদের প্রয়াস অন্তহীন, সেখানে একদল রক্ষণশীল সৃষ্টি করছে প্রবল প্রতিকূলতার। তাই প্রেসিডেন্ট আসাদ আজ সঙ্কট সম্মুখীন—বাইরের থেকে যত নয়, তার থেকে বেশী দেশের ভিতরে।

বর্তমান জনসংখ্যা ষাট লক্ষের ওপর। বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার একলক্ষ ত্রিশ হাজার। একলক্ষ আর্মেনিয়ানের বাস আছে এদেশে। উত্তর ও মধ্য সিরিয়ায় পঞ্চাশ হাজার কুর্দ বাস করে। শতকরা পঁচাশি জনই সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমান।

বিদেশ বাণিজ্যের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হল তুলা (কাঁচা তুলা, সুতো এবং বস্ত্র)। সব্জী, ফল, উল, পশু চর্ম, সব্জীজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশ থেকে আসে যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত, বস্ত্র, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, ওষুধ, সিল্ক, যানবাহনের উপকরণ, খাদ্য এবং কাঠ।

সিরিয়ার শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় যৌথ ও বেসরকারী উদ্যোগ বর্তমান। দেশের সামগ্রিক শিল্প বিনিয়োগে শতকরা চৌষট্টি ভাগই সরকারী নিয়ন্ত্রণে।

ছয় ॥ তিয়াত্তরের সংকট

আবার যুদ্ধ !

"সাম্রাজ্যবাদীরা মনে করে এটা নাসেরের ব্যক্তিগত পরাজয়। কিন্তু এ হল সমগ্র আরব জনতার পরাজয়। আরব জনগণ তা মেনে নেবে না।"

—প্রেসিডেন্ট নাসের

'আমরা দুর্বল, আমরা তেমন কিছু করতে পারব না, এই ভেবে বসে থাকলে আমেরিকা তার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ভুল করবে। এখানকার অবস্থা ভিয়েতনামের চেয়েও খারাপ হবে। এখানে আমেরিকার গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ রয়েছে। আমেরিকানরা জিও-পলিটিক্যাল ইকুয়েশনের অঙ্ক কষে কম্প্যুটারে। আর তা সবসময় তাদের ভুল ফল যোগায়। যেমন ম্যাকনামারা জনসনকে বলেছিলেন কম্পুটারে ভুল তথ্য দিয়ে আপনি ভুল উত্তর পাচ্ছেন। ম্যাকনামারাই ঠিক ছিলেন, জনসনকে সরতে হয়েছে। কম্প্যুটারে ভিয়েতনামীদের মানসিকতার বিষয়টি দেওয়া হয়নি। তেমনি এখন তারা আরব মানসিকতাকে হিসাবে নিচ্ছে না। কিন্তু সব দুর্দৈবের অবসানের জন্য বড় রকমের একটা দুর্দৈব আরবরা মাথা পেতে নেবে এবং তাতে কিন্তু ক্ষতি হবে সবারই।"

—প্রেসিডেন্ট আনওয়ার সাদাত

প্রেসিডেন্ট সাদাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার বছর ছিল ১৯৫১ খৃঃ। একাত্তর পেরিয়ে গেল কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হল না। বাহাত্তরও অতিক্রান্ত হল; কিন্তু 'না যুদ্ধ না শান্তি' নীতির কোন পরিবর্তন

ঘটল না, কেবল একটা আতঙ্ক, একটা দুর্যোগের আভাস টেনে দিয়ে বছর শেষ হয়ে গেল। এটা বুঝতে সম্ভবতঃ কোন অসুবিধা হবে না, সাতষট্টিতে অধিকৃত আরব অঞ্চল যতদিন ইজরায়েল ছেড়ে দেবে না, ততদিন মিশরে রাজনৈতিক স্থিরতা আসা অসম্ভব।

সাতষট্টি সালের বিপর্যস্ত পশ্চাদপসরণের পর বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির কার্যকলাপের ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখে। সেই সঙ্গে আরব নেতারা হৃত মনোবল ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। আন্তর্জাতিক জনমতকে সংগঠিত করবার চেষ্টা চলছিল। বৃহৎ পঞ্চশক্তি জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবং পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলির কাছে প্রেসিডেন্ট সাদাত বারবার জানিয়েছেন, "আপনারা দখলীকৃত আরব ভূখণ্ড সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু ফয়সালায় আসতে ইজরায়েলকে বাধ্য করুন।"

কিন্তু তাঁর আবেদনে কেউ কর্ণপাত করেনি। মার্কিন নেতাদের কাছে সাদাত শান্তির প্রস্তাব রেখেছেন। ১৯৫১ খৃঃ এবং ১৯৫২ খৃঃ কয়েকবার মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগও করেছেন। কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে। তাই ১৯৫২ খৃঃ নিউজ উইক পত্রিকার সাংবাদিককে ক্ষুব্ধকণ্ঠে সাদাত বলেছিলেন: "আমাদের ব্যাপার আমাদেরই হাতে নিতে হবে। এ জন্য যুদ্ধ অনিবার্য। আর সেটা ১৯৫২ সালেই হবে।"

শান্তির প্রতি অথবা সংকট নিরসনে আরব রাষ্ট্রগুলির অনীহা কখনও প্রকাশ পায় নি। বরং ইজরায়েলী আগ্রাসন ক্রমশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। ইজরায়েলী সেনারা লিবিয়ার অসামরিক বিমানকে গুলি করে নামিয়ে একশ আটজন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। ১৯৫০ খৃঃ সুয়েজ খাল থেকে কিছু দূরে যুদ্ধবিরতি এলাকা অতিক্রম করে মিশরীয় অসামরিক এলাকায় বোমা ফেলে।

ছয় বছরের 'যুদ্ধ নয়---শান্তি নয়' অবস্থা এবং মিশরের কূটনৈতিক উদ্যোগের প্রতি আন্তর্জাতিক ঔদাসীন্য প্রেসিডেন্ট সাদাতের পক্ষে

সামরিক ব্যবস্থাগ্রহণ অনিবার্য হয়ে উঠতে থাকে। প্রেসিডেণ্ট সাদাতের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হাফেজ ইসমাইলের ওয়াশিংটন মিশন ব্যর্থ হয়। ঠিক সেই সময় ওয়াশিংটন ইজরায়েলকে আরো ফ্যাণ্টম জঙ্গী বোমারু বিমান এবং অন্যান্য অস্ত্র দেওয়ার কথা ঘোষণা করে।

মিশরের অবস্থা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠতে থাকে। প্রেসিডেণ্ট সাদাতের কাছে একটি সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। বিশ্বের বৃহৎ শক্তি-বর্গের মধ্যপ্রাচ্য জটিলতার প্রতি ঔদাসীন্য ভেঙে ফেলবার একমাত্র পথ হল দুঃসাহসিক সামরিক তৎপরতা। তার বক্তব্যে বারবার আসন্ন সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হতে থাকে। প্রেসি-ডেণ্ট সাদাত তাঁর পঁয়ত্রিশ মিলিঅন দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ইজরায়েলের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘর্ষের মুহূর্ত এগিয়ে আসছে। তার প্রস্তুতির জন্য তিনি প্রেসিডেণ্ট, সর্বাধিনায়কের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ও সামরিক গভর্ণর জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন। ইউনিফর্ম পরিহিত নেতা সীমান্ত পরিদর্শনে যান। ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধের পর থেকে মিশরে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় বছরে একশত কোটি স্টার্লিং।

এবার কিন্তু মিশরের যুদ্ধ ও শক্তিকে ভাওতা হিসাবে মেনে নিতে পারেনি ওয়াশিংটন। কারণ, তাদের কাছে তথ্য রয়েছে সামরিক দিক থেকে মিশরের ব্যাপক যুদ্ধাস্ত্র সমাবেশের। তাছাড়া সৌদি আরবের বাদশাহ আগেই তাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন, "ইজরায়েলের সঙ্গে নতুন করে যুদ্ধ বাধলে সৌদি আরব মিশরের প্রতি সংহতির নিদর্শনস্বরূপ ভ্রাতৃসম আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গেই যোগ দেবে।" আবার যুদ্ধ বাধলে লিবিয়া, সৌদি আরব, শেখ শাসিত পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলির তেল সরবরাহও বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সৌদি আরব স্পষ্ট ভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল, এইসব রাষ্ট্র যদি তেল সরবরাহ বন্ধ নাও করে, তবু তেল

খনি সমূহে কার্যরত হাজার হাজার প্যালেস্টাইনীরাই নিশ্চিতভাবে কাজটি সমাধা করবে।

কিন্তু তা সত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যায়নি। নীরবতার মধ্যে কালক্ষেপ করেছে, অথবা ইজ-রায়েলকে সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছে। তাছাড়া ভিয়েতনাম সম্পর্কে একটি সমঝোতায় না পৌঁছান পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে তার সামরিক কার্যকলাপকে ব্যাপক করার অসুবিধা ছিল অনেক।

মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হাসান জায়াত ইজরায়েলে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহকে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে ঘোষণা করে বলেন, ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেনামে আরবভূমি দখল করে রাখছে। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলি না। আমরা বলি অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করুন।

পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট সাদাত সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন, মিশর তার এলাকা পুনরুদ্ধারের জন্য ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। এই যুদ্ধ আমাদের করতেই হবে। আলজেরিয়া, লিবিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন আগামী যুদ্ধে আমাদের সাহায্যের প্রতি-শ্রুতি দিয়েছে। মস্কো আমাদের যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করছে, কিন্তু সোভিয়েত সৈন্য দিয়ে যুদ্ধ করতে চাই না।

প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রবাসী প্যালেস্টাইন সরকার গঠনের জন্য প্যালেস্টাইনীয়দের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালে, তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যাখান করে বিভিন্ন প্যালেস্টাইন মুক্তিসংস্থা।

ওয়াশিংটন থেকে ব্যাপকহারে অত্যাধুনিক সমর সম্ভার আসতে থাকে ইজরায়েলে। বাহাত্তরের অক্টোবরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে ঘোষণা করা হয় যে, আমেরিকা শিগগিরই ইজরায়েলকে আরো ছয় কোটি পঁচিশ লক্ষ ডলার সাহায্য দেবে। সমরাস্ত্র ক্রয় এবং ইজরায়েলের সেনাবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের বিপুল ব্যয় নির্বাহে

এই সাহায্য। ১৯৫৫ খৃঃ থেকে ইজরায়েল সামরিক খাতে ব্যয় ছয়গুণ বৃদ্ধি করে।

তিয়াত্তরের মার্চে প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারকে প্রেসিডেণ্ট নিক্‌সন চার স্কোয়াড্রন জেট জঙ্গী বিমান সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। মার্কিন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতরের সূত্রে জানা যায়, চুক্তি অনুযায়ী চব্বিশটি এফ-৪ জঙ্গী বোমারু বিমান এবং চব্বিশটি এ-৪ হালকা আক্রমণকারী বিমান দেওয়া হয়। তাছাড়া ১৯৫১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট নিকসনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ইজ-রায়েলকে বিয়াল্লিশটি এফ-৪ এবং প্রায় আশিটি এ-৪ বিমানও দেওয়া হয়। দুদেশের মধ্যে সর্বশেষ চুক্তি অনুযায়ী ইজরায়েলী সুপার মিরেজ তৈরিতে সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে ফরাসী মিরেজ সিরিজের বিমানের অনুকরণে উন্নতমানের বিমান তৈরি হবে। ইঞ্জিন লাগান হবে জেনারেল ইলেকট্রিকের জে-৭৯ জেট ইঞ্জিন। এফ-৪ বিমানেও এই ইঞ্জিন ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিয়াত্তরের শেষে ইজরায়েলের হাতে চুক্তি অনুযায়ী একশ কুড়িটি এফ-৪ বিমান এবং চুয়াত্তরের মাঝামাঝি দুইশতটি এ-৪ বিমান সরবরাহ করেছে মার্কিন সরকার। নতুন পাওয়া বা প্রতিশ্রুত সাহায্যের হিসাব বাদ দিয়েই অবশ্য এই তথ্য। একটি ফ্যাণ্টম জেট বিমানের দাম বিয়াল্লিশ লক্ষ ডলার এবং একটি স্কাই হক বিমানের দাম চল্লিশ লক্ষ ডলার।

ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক মেয়ার ভেলনার ১৯৫২ খৃঃ জুনে পার্টি কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবে বলেছিলেন :

ইজরায়েলী নেতাদের দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মনীতি দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থগুলিকে বিপন্ন করেছে। সামরিক সাফল্য ইজরায়েলী শাসকদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে, কিন্তু যেহেতু সর্বোপরি এই

সাফল্যের ভিত্তি হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, ভূমধ্যসাগরে মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের উপস্থিতি এবং মার্কিন 'ফ্যানটম' বিমানগুলি—সেইহেতু এই সাফল্য সাময়িক হতে পারে। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এবং আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী প্রমাণ করেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী সাহায্য নির্ভরযোগ্য নয়। আমাদের পার্টি হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে যে, যদি রাজনৈতিক উপায়ে সংকটের সমাধান না হয় তাহলে সামরিক কার্য-কলাপ আবার শুরু হওয়ার বিপদ দ্রুত বৃদ্ধি পাবে।

ইজরায়েল কমিউনিস্ট পার্টি নিম্নরূপ শান্তির কর্মসূচী উপস্থাপন করছে: ১৯৫১ খৃঃ শেষ দিকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাবগুলির দ্বারা অনুমোদিত নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৫৭ খৃঃ ২২ নভেম্বরের প্রস্তাবের সম্পূর্ণ রূপায়ণ, ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের জনগণসহ আমাদের এলাকার সমস্ত জাতির অধিকার মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে ইজরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা; ১৯৫৭ খৃঃ ৫ জুন যে সীমানা ছিল সেই সীমানাকেই শান্তি-সীমানা হিসাবে গণ্য করতেই হবে এবং সেই সীমান্তেই ইজরায়েলী সৈন্য সরিয়ে আনতে হবে; সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিহার করতে হবে এবং এই এলাকার সমস্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা ও স্বীকৃত ও নিরাপদ সীমানার মধ্যে তাদের শান্তিতে অবস্থানের অধিকার মেনে নিতে হবে; প্যালেস্টাইনের আরব শরণার্থীদের সমস্যার ন্যায়সঙ্গত সমাধানও রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের অধিকার মেনে নেওয়া; সুয়েজ খাল তিরান প্রণালীতে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত ইজরায়েলের নৌ চলাচলের স্বাধীনতা।......

মিশর সরকার ১৯৫১ খৃঃ ৮ ফেব্রুআরি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সম্পাদকের বিশেষ দূত জি, যারিং-এর স্মারকলিপির যে ইতিবাচক জবাব দেন তাতে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবগুলি রূপায়িত হলে অর্থাৎ অধিকৃত ভূখণ্ড দখলে না রাখার এবং সকল জাতির অধিকার

মেনে নেওয়ার ভিত্তিতে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় মিশরের সম্মতির কথা জানান হয়।

ইজরায়েলী সরকার জি, যারিং-এর প্রস্তাবগুলি অগ্রাহ্য করেন বলে জানা গেছে! এর ফলে আমাদের এলাকায় ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টাকে ক্ষুন্ন করা হয়। ইজরায়েলী সরকারের কর্মনীতির লক্ষ্য হচ্ছে কালক্ষেপ করা এবং যা ঘটে গেছে তাই মেনে নেওয়ার কর্মনীতি অবলম্বন করে অধিকৃত অঞ্চলগুলিতে উপনিবেশ স্থাপনের কাজ চালিয়ে যাওয়া।......

আরব ভূমি অধিকারের অবসান ঘটানোর প্রধান প্রতিবন্ধক হল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।... মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ইজরায়েলী দখল-দারীকে স্বরাষ্ট্রীয় ও পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে আরবদের নতি স্বীকার করতে বাধ্য করার এবং এই অঞ্চলে হারান সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান ফিরে পাওয়ার জন্য কাজে লাগাচ্ছে। ইজরায়েলী সরকার এবং তার মার্কিন সমর্থকদের যে কর্মনীতি সমস্ত শান্তি প্রচেষ্টাকে বানচাল করে দিচ্ছে তার পরিণতি ঘটতে পারে পরবর্তী সমস্ত ফলাফল সহ আর একটি সামরিক বিস্ফোরণে......।"

ইজরায়েল ভিন্নদেশের ভূখণ্ড দখলে রাখতে কৃত সংকল্প। শান্তির শত্রুরা শুধু প্রতিক্রিয়াশীল ও জাত্যাভিমানী নয় হঠকারীও বটে। এদের কর্মনীতি জীবন্ত বাস্তবতা এবং শান্তি মিটমাটের জন্য জনগণের আকাঙ্খার বিরোধী।

ইজরায়েলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানের ঘোষণা থেকেই জানা যায় যে ১৯৫৭ খৃঃ তের জুন থেকে ১৯৫৯ খৃঃ ত্রিশ নভেম্বর পর্যন্ত ইজরায়েল মিশর ক্ষেত্রে তিন হাজার নয় শত একাত্তর বার সামরিক তৎপরতা চালায়, জর্ডান ক্ষেত্রে তিন হাজার নিরানব্বই বার এবং সিরিয়া ক্ষেত্রে তিনশত পাঁচ বার। ১৯৫০ খৃঃ প্রথম থেকে মিশর, সিরিয়া, জর্ডান ও লেবাননের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্ররোচনার বিবরণ:

জানুআরি মাসের এক দুই ও তিন তারিখে বাল্লা ও এল কান্তারে

মোতায়েন মিশরীয় সৈন্যদের উপরে ইজরায়েলী বিমান বারবার হামলা চালায় এবং দক্ষিণ লেবাননে শান্তিপূর্ণ গ্রামের ওপর বোমা বর্ষণ করে।

জানুআরির চার ও পাঁচ তারিখে ইজরায়েলী বিমানবহর এল-কান্তার অঞ্চলে এবং সুয়েজ খালের ওপরে অনেকগুলি হামলা চালায়। সাত জানুআরি নিচু দিয়ে উড়ে আসা ইজরায়েলী বিমান বহর দামহুর, ইনশাস, তেল-কেবির ও সুয়েজ অঞ্চলে মিশরের আকাশ পথে প্রবেশের চেষ্টা চালায়। আবার তার পরদিন ইজরায়েলী বিমান মিশরীয় ভূখণ্ডে যুদ্ধ বিরতি রেখার সত্তর মাইল উত্তরে লক্ষ্যবস্তুগুলির ওপরে আঘাত হানে। আট থেকে দশ জানুআরি প্রতিদিন ইজরায়েলী বিমান মিশরের ভূখণ্ডে আক্রমণ চালায়, কায়রো থেকে পনের মাইল দূরে আল-হাইক ও তৈল এল-কেবির অঞ্চলে অবস্থিত সামরিক লক্ষ্য বস্তুর ওপরে বোমাবর্ষণের চেষ্টা করে।

জানুআরি চৌদ্দ থেকে সতের ইজরায়েল সুয়েজ খাল অঞ্চলে মিশরীয় বাহিনীর ওপরে বারবার বোমাবর্ষণ করে। ইজরায়েলী বিমান বহর জর্ডানেও আক্রমণ চালায়, অসামরিক, জনসমষ্টির ওপরে ক্ষেপণাস্ত্র ও মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে। মিশর, সিরিয়া ও জর্ডানের আকাশ সীমায় প্রবেশের চেষ্টা চলে তেইশ জানুআরি পর্যন্ত। তিনটি ক্ষেত্রেই ইজরায়েলী বাহিনী কামানের গোলা আর মেসিন-গানের গুলি চালায় রণাঙ্গণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সুয়েজ খাল ও জর্ডান নদী পার হওয়ার জন্য কমাণ্ডো তৎপরতার আবরণ হিসাবে। চব্বিশ থেকে একত্রিশ জানুআরি ইজরায়েলী বাহিনী মিশর, জর্ডান ও সিরিয়া —এই তিনটি ক্ষেত্রেই তাদের গোলাবর্ষণ তীব্র করে তোলে।

কেবলমাত্র, ১৯৫১ খৃঃ ইজরায়েলী সেনাবাহিনী ইজরায়েলের বাইরে চার হাজারের বেশী সশস্ত্র প্ররোচনা চালায়, যদিও সরকারী ভাবে স্বীকার করা হয় মাত্র পাঁচ শতটির কথা।

বাহাত্তরের পনেরই অক্টোবর ইজরায়েলী বিমান লেবাননের

চারটি এবং সিরিয়ার একটি গেরিলা ঘাঁটি আক্রমণ করে। তেল-আভিবের একজন সামরিক মুখপাত্র বলেন উত্তর সিরিয়ার মাসকাই-য়েতের পূর্ব দিকে ঐ গেরিলা ঘাঁটিটি ছিল কমানডোদের শিক্ষাকেন্দ্র। দক্ষিণ বেরুত থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে লেবানীজ সহর সৈদার শহরতলী অঞ্চলে ও সারফনদের উপকূলবর্তী এলাকায় ইজরায়েলী বিমান বহর বোমাবর্ষণ করে। কোন রকম হুঁশিয়ারি ছাড়াই আক্রমণ শুরু হয় এবং প্রায় ত্রিশ মিনিট ধরে চলে। অসংখ্য অসামরিক ব্যক্তি হতাহত হয়।

দামাসকাসের উপকণ্ঠে চব্বিশ অক্টোবর ইজরায়েলী বিমান অসামরিক এলাকায় বেশ কয়েকবার বোমাবর্ষণ করে। ত্রিশ অক্টোবর সিরিয়ার চারটি গেরিলা ঘাঁটির ওপর রকেট ও বোমাবর্ষণ করা হয়। দামাসকাসের কাছে ইজরায়েলী বিমান আক্রমণে নারী শিশুসহ বহু লোক হতাহত হয়।

ইজরায়েলের এই ধরণের আগ্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে সোমালি, যুগোশ্লাভিয়া ও গিনি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা গৃহীত হওয়ার পথ বন্ধ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে, যাতে সিরিয়া ও লেবাননের শান্তিপূর্ণ এবং জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে ইজরায়েলী বোমাবর্ষণ ও আগ্রাসন সম্পর্কে একটি শব্দও ছিল না। বরং ম্যুনিখ হত্যাকাণ্ডের দায় ভার আরব দেশগুলির ওপর চাপিয়ে, সিরিয়া ও লেবাননে ইজরায়েলী আগ্রাসী কার্যকলাপকে ন্যায্য প্রমাণের জন্য বলা হয়, এসব তেল আভিভের প্রতিশোধমূলক কাজ। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে যেতে থাকে।

লেবাননের নাহর এল-বারেদের নিকটবর্তী অঞ্চলে ইজরায়েলী বোমাবর্ষণের পর, পরিদর্শনে যান প্রাভদার সংবাদদাতা ভি, পিরিসাদা। তিনি লেখেন 'মানুষের দুঃখ চোখে দেখা যায়

না।' যেখানে মানুষ কাজ করছিল শান্তিপূর্ণ ভাবে, সেখানে বোমা ফেলে, রকেট আক্রমণ ও মেশিনগানের গুলি চালিয়ে ইজরায়েলী বৈমানিকরা বহু মানুষকে হতাহত করে, ব্যাপক ধ্বংসকাণ্ড চালায়।

ইজরায়েলী বিমান বহর সুয়েজখালের উত্তরাঞ্চলে মিশরের আকাশসীমা লংঘন করে ১৯৫২ খৃঃ জুনে। সেই একই দিনে লেবানন উপকূলের অদূরে ইজরায়েলী স্পীডবোটের আবির্ভাব ঘটে। লেবানন ও সিরিয়া ভূখণ্ডের ওপরে ইজরায়েলীরা বেশ কয়েকদিন বিমান থেকে পর্যবেক্ষণ চালায়।

ইজরায়েলী বিমান সিরিয়া ও লেবাননের দশটি অঞ্চলের ওপরে বোমাবর্ষণ করে ১৯৫২ খৃঃ সেপ্টম্বর মাসের প্রথম দশ দিনে। এখানে বসবাস করত প্যালেস্টাইন শরণার্থীরা। আগ্রাসনে শিশু, নারীও বৃদ্ধ সমেত চারশয়ের বেশি লোক হতাহত হয়।

এক সপ্তাহ পরে, ১৬ সেপ্টেম্বর বিমানবাহিনীর সমর্থনে ইজরায়েলী ট্যাংকগুলি লেবাননের দক্ষিণাংশে হামলা চালায়। বেশ কয়েকটি ছোট ছোট শহর এবং প্রায় কুড়িটি গ্রাম দখল করে ইজরায়েলী সৈন্যরা সেখানে অমানবীয় বর্বরতা ও নির্যাতন চালায়। বিধ্বস্ত হয় অজস্র ঘরবাড়ি, ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেতু, টেলিফোন লাইন, পাম্প-হাউস, কূপ ইত্যাদি।

সিরিয়ার দায়েল গ্রামের ওপরে ইজরায়েলী বিমানের বর্বর হামলায় গ্রামটির সমস্ত লোক নিহত হয় ১৯৫৩ খৃঃ ৮ জানুআরি। রাতের অন্ধকারে ইজরায়েলী কমাণ্ডোরা বেরুত ও সইদায় প্রবেশ করে ১৯৫৩ খৃঃ ৯ এপ্রিল। বেশ কিছু বাড়ি উড়িয়ে দেয়। প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ অন্দোলনের কয়েকজন নেতাকে হত্যা করে এবং প্যালেস্টাইন শরণার্থী শিবিরে গুলিবর্ষণ করে। অনেক ব্যক্তি, হতাহত হয়। এই হামলায় মার্কিন দূতাবাসের যোগ ছিল গভীর। আক্রমণ পরিকল্পনা তৈরি করে দেয় সিআইএ। লেবাননের

সেনাবাহিনী ইজরায়েলী হানাদারদের বাধা দেয় নি। দামাস্কাসের আধী-সরকারী আলি সাওরা, বাগদাদে বাথ পার্টির মুখপত্র, কুয়া-য়েতি পত্রিকা, আলজেরিয়ার সরকারী পত্রিকা আল মুজাহিদ, মরক্কোর বিরোধী দলীয় পত্রিকা লা ওপিনিয়ন—বেরুত হামলায় মার্কিন যোগাযোগের প্রতি ইঙ্গিত করে। কুয়ায়েতের দৈনিক আলবাই আলআম মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার তৈল স্বার্থ ও অন্যান্য স্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানায়। আল মুজাহিদ বলে, ব্যাপক আমেরিকান সাহায্য ছাড়া ইজরায়েল এমন ঢালাওভাবে বিশ্ব জন-মতকে বুড়ো আঙুল দেখাতে পারত না। মুজাহিদ আমেরিকার বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামে তেলকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের আহ্বান জানায়।

দুটি ইজরায়েলী জঙ্গীবিমান লেবাননের আকাশ সীমায় হানা দেয় ১৯৫৩ খৃঃ দশই অগাস্ট। একটি লেবাননী যাত্রীবাহী বিমানকে ইজরায়েলের একটি বিমানবন্দরে অবতরণ করতে বাধ্য করে।

ইজরায়েল ১৯৫৩ খৃঃ দুই জানুআরি থেকে আঠোরোই অগাস্ট পর্যন্ত লেবাননে একশ চারবার উসকানি মূলক তৎপরতা চালায়। ইজরায়েলী বিমান বিরাশিবার লেবাননের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে এবং সেনাবাহিনী উনিশবার সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ করে। তাছাড়া ইজরায়েলের সামরিক মোটর বোটগুলি তিনবার লেবাননের জলসীমা লঙ্ঘন করে।

মিউনিখ অলিম্পিকে ব্ল্যাক সেপ্টেম্বরের হাতে ইজরায়েলী ক্রীড়াবিদদের নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ার। তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন একশত বে-সামরিক আরবকে উড়ন্ত অবস্থায় আকাশে হত্যা করে। সিনাইতে পথ হারিয়ে যাওয়া শতাধিক যাত্রীবাহী একটি লিবিয় বোয়িং ৭২৭ বিমানকে ইজরায়েলী বিমানবাহিনী গুলি করে ধ্বংস করে।

আরোহীরা কেউ বেচে ছিল না। ৯ সেপ্টেম্বর ইজরায়েলী বিমান হামলায় রাকিদের ত্রিশজন এবং নহর আলবদর উদ্বাস্তু শিবিরের পাঁচজন আহত হয়। হতাহতের অধিকাংশ নারী ও শিশু। ১৯৫৩ খৃঃ পর এটাই ইজরায়েলীদের বৃহত্তম বিমান হামলা। সিরিয়া ইজরায়েলে প্রচণ্ড আকাশ যুদ্ধ, সিরিয়া ইজরায়েলী বিমান এবং ইজরায়েল তিনটি সিরীয় বিমান গুলি করে ভূপতিত করে। লেবানন সমুদ্র উপকূলে একটি গেরিলা জাহাজ ডুবে যায়। ইজরায়েলী বিমান লেবাননের তিনটি গ্রামের ওপর বোমা, রকেট ও মেশিনগানের গুলিবর্ষণ করে। নিহত বার জনের মধ্যে দশজনই শিশু। এই শিশুদের মধ্যে সাতটি ছিল ভাই বোন। আহত কুড়ি জনের মধ্যে পনেরটি আট থেকে পনের বছর বয়সের বালক বালিকা। সিরিয়া ও লেবাননে অবস্থিত প্যালেস্টাইনী উদ্বাস্তু শিবিরে ইজরায়েলী বিমান হামলায় একষট্টিজন নিহত এবং দুইশ-তাধিক আহত হয়। সিরিয়ার আলহাম সমতলভূমি ও শাম আলগাটন এলাকার বসতিপূর্ণ এলাকায় ইজরায়েলী বিমানের গোলাবর্ষণে একজন নিহত, কয়েকজন মহিলা ও শিশু আহত হয়।

ইজরায়েলী জেট বিমান, ট্যাঙ্ক ও গোলন্দাজ সমর্থন পুষ্ট একটি পদাতিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে বড় রকমের অভিযান চালায়। তেলআভিভ থেকে বলা হয়, লেবানন থেকে সাম্প্রতিক গেরিলা আক্রমণের দরুন সেখানকার গেরিলা ঘাঁটিগুলি নিশ্চিহ্ন করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য। ইজরায়েলী বাহিনী ত্রিমুখী অভিযান চালিয়ে উইনাব তিয়ের, এবং বিন্তে জাবেল দখল করে। ইবরিখা ও তাইবেতে ট্যাঙ্কের সাহায্যে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। একটি সাঁজোয়া কলাম সীমান্তের দশ মাইল এলাকা জুড়ে এই অভিযান চালায় এবং দশটি লেবাননী গ্রামে তল্লাসী চালিয়ে গেরিলাদের ব্যবহৃত ঘরবাড়ী উড়িয়ে দেয়। এদিকে ইজরায়েলী জেট জঙ্গী বিমান রামেশ, ইন

এবেল, বিন্‌ত জাবেল, আইনাতা, ইনাতা মোট নয়টি গেরিলা ঘাঁটির ওপর ব্যাপক বোমাবর্ষণ করে।

একজন ইজরায়েলী মুখপাত্র বলেন.যে, নহবতীয়ে তখ্‌ত এলাকায় দু হাজারের মত গেরিলা তৎপর রয়েছে এবং সেখানে তাদের ও অন্যান্য সংস্থার সদর দফতর অবস্থিত। তরী, বেত ইয়াপুন, আসিদ্‌ আল-আদিসা, কাফরা এবং মাজমি গ্রামেও ইজরায়েলী হামলা চলে।

ইজরায়েলী মুখপাত্র বলেন যে, যে সব গ্রামে গেরিলাদের ঘর বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেছে সেগুলি উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। লেবাননী সেনাবাহিনী এই অভিযানে বাধা দেয় এবং এজন্য তাদের ওপরও আঘাত হানা হয়। ইজরায়েলী বিমান হামলার পরিপ্রেক্ষিতে রাজধানীর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ ঘোষিত হয়।

মোট চৌষট্টিটি ইজরায়েলী বিমান সিরিয়ার আকাশ সীমায় হানা দেয় ১৯৫৩ খৃঃ তেরই সেপ্টেম্বর।

ইজরায়েলের এই আগ্রাসী তৎপরতা আরব রাষ্ট্রনায়কদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধাভিমুখী হতে বাধ্য করে। বছরের প্রথম থেকেই মিশরের যাবতীয় শান্তি প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায়। মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে বার বার গোপন আলোচনা চলে। অবশেষে রাষ্ট্রনায়ক এবং সেনানায়করা সম্মিলিত হয়ে গ্রহণ করেন সার্বিক যুদ্ধের সিদ্ধান্ত। ঠিক কোন সময়ে যুদ্ধ শুরু করা হবে, তা নিয়ে যুদ্ধ শুরুর মাত্র কয়েকদিন আগে সিরিয়ার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। ত্রিশে সেপ্টেম্বর যুদ্ধের সাংকেতিক নাম সিরিয়াকে জানান হয়। চৌদ্দশত বছর আগে মহানবী হজরত মোহাম্মদের (দঃ) প্রথম যুদ্ধের নামানুসারে স্থির হয় 'বদর'। অকটোবরের দু'তারিখ সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদের সঙ্গে কথা বলে চরমক্ষণটি স্থির করা হয়।

অকটোবরের ছয় তারিখ, স্থানীয় সময় দুপুর দুটায় দুশত মিশরীয় এবং একশত সিরীয় বিমান শত্রুর প্রতিরক্ষা ঘাঁটির ওপর আঘাত হানা

শুরু করে। একই সঙ্গে দুই হাজার কামান থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হয়। আর ঠিক একই সময়ে মিশরীয় বাহিনী সুয়েজ খাল পার হতে থাকে। বিমান ও কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে খালের উত্তর দিকে অবস্থিত দ্বিতীয় বাহিনী সেতু নির্মাণে সক্ষম হয়। দক্ষিণ দিকে ভূ গঠনের প্রতিকূলতায় তৃতীয় বাহিনী সেতু নির্মাণে খানিকটা অসুবিধায় পড়ে। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টায় পাঁচটি মিশরীয় ডিভিশন খালের পূর্ব তীরে হাজির হয়।

মিশরের সুবিধার কথা বিবেচনা করেই যুদ্ধের তারিখ স্থির হয়। এই চরম মুহূর্তে ছিল উজ্জ্বল চাঁদের আলো। সুয়েজে অনুকূল স্রোত। ফলে মিশরীয় বাহিনী সহজেই খাল অতিক্রম করে। রমজান মাসে মিশরীয়দের আক্রমণ ইজরায়েল আশা করে নি। তা ছাড়া তারা তখন ব্যস্ত ছিল সাধারণ নির্বাচনের ব্যাপারে।

প্যারিস বেতারের জনৈক সংবাদদাতা জানান যে, মিশর ও সিরিয়া ছই অক্টোবর বিকেলে আক্রমণ করবে বলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ দিন ভোর রাত চারটায় ইজরায়েলকে সতর্ক করে দেয়। রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ারকে এ ব্যাপারে সজাগ করেন এবং মেয়ার মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকেন।

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহম্মদ এল জায়াৎ সাতই অক্টোবর মার্কিন টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎ করে বলেন, মিশর সুয়েজখাল এলাকায় স্থল যুদ্ধ শুরু করেছে। তিনি বলেন, ইজরায়েল জলপথে আক্রমণ করতে যাচ্ছিল বলেই মিশরকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হয়েছিল। মিঃ জায়াৎ বলেন, মিশর শান্তি চায় কিন্তু আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিসর্জন দিয়ে নয়। ১৯৫৭ খৃঃ থেকে আরব জগত ইজরায়েলের অধিকৃত আরব অঞ্চল ফিরে পেতে চাইছে। তিনি বলেন, আমরা ইজরায়েলে গিয়ে ইজরায়েলীদের ওপর গুলি চালাই নি।

যুদ্ধ আরম্ভ থেকে যুদ্ধবন্দী বিনিময় পর্যন্ত কয়েকটি তারিখ :

অক্টোবর ৬ : মিশরীয় বাহিনীর সুয়েজখাল অতিক্রম করে এবং গোলান মালভূমিতে সিরীয় বাহিনীর আক্রমণ।

অক্টোবর ৯-১৩ : গোলান মালভূমিতে ইজরায়েলী সেনা সমাবেশ ও প্রতি আক্রমণে সিরীয় বাহিনীর পশ্চাদপসরণ ; সিরীয়দের সঙ্গে ইরাকী ও জর্ডানের সাঁজোয়া বাহিনীর যোগদান ; দামাস্কাস এবং সিরিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে ইজরায়েলী বোমাবর্ষণ।

অক্টোবর ১০ : সোভিয়েত ইউনিয়ন আরব বাহিনীর জন্য সমরাস্ত্র পাঠান শুরু করে।

অক্টোবর ১৫ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে ইজরায়েলের হারান সমরাস্ত্র পুরনের জন্য যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র সরবরাহ শুরু করেছে।

—ইজরায়েলী বাহিনী দামাস্কাসের ৪০ কিলোমিটার (চব্বিশ মাইল) দূরে তাদের অবস্থান সুদৃঢ় করে। বিটার লেকের উত্তর দিয়ে ইজরায়েলী বাহিনী সুয়েজখাল অতিক্রম করে।

অক্টোবর ১৭ : তেল রপ্তানীকারক দশটি আরব রাষ্ট্র প্রতি মাসে পর্যায়ক্রমে পাঁচ শতাংশ তেল উৎপাদন কমাবার সিদ্ধান্ত নেয়। ইজরায়েল আরব এলাকা ত্যাগ না করা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকবে।

—সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের তিনদিন কায়রো অবস্থিতি।

অক্টোবর ২০ : সোভিয়েত সরকারের অনুরোধে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ব্যাপারে আলোচনার জন্য মিঃ কিসিঙ্গারের মস্কো সফর।

অক্টোবর ২২ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত।

অক্টোবর ২৩ : নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব কার্যকর করার জন্য মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইমের প্রতি রণাঙ্গণে পর্যবেক্ষক-দল পাঠাবার অনুরোধ জানায়। সিরিয়া যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেয়।

অক্টোবর ২৭ : সুয়েজের পশ্চিম তীরে ইজরায়েলী ও মিশরীয় পদস্থ অফিসারদের প্রথম বৈঠক।

অক্টোবর ২৮ : সুয়েজ শহরে রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর আগমন।

অক্টোবর ৩১ : প্রধানমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের ওয়াশিংটন গমন; মিঃ কিসিঙ্গারের সঙ্গে বিভিন্ন আরব কূটনীতিকদের আলোচনা।

নভেম্বর ৫-৮ : মিঃ কিসিঙ্গারের আলজেরিয়া, মরক্কো, তিউনিসিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, লিবিয়া এবং কায়রো সফর।

নভেম্বর : মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে ছয় দফা শান্তিচুক্তি সাক্ষর।

নভেম্বর ১৫ : মিশর ও ইজরায়েল যুদ্ধবন্দী বিনিময় সুরু।

যুদ্ধের প্রথমেই লোহিত সাগরের মুখে বার-এল মাণ্ডেভ প্রণালী অবরোধ করায় ইজরায়েলের এইলাত বন্দরে তেরখানি মালবাহী জাহাজ আটক পড়ে। তেল-আভিভের দৈনিক ম্যারিভ-এ বলা হয়, মিশর বিপুলসংখ্যক ডুবোজাহাজ, টর্পেডো বোট ব্যবহার করে এই অবরোধ চালায়। আরব ইজরায়েলী যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর একখানি জ্বালানী মালবাহী জাহাজ শুকনো মাছ নিয়ে এইলাত বন্দর ত্যাগে সক্ষম হয়।

প্রথম চারদিনের যুদ্ধে সিনাই-এ মিশর একশতের বেশী ইজরায়েলী ট্যাঙ্ক ধ্বংস করে এবং বিপুল সংখ্যক ইজরায়েলী বিমান নষ্ট হয়। সুয়েজের পূর্ব পাড়ে দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কানতারা দখলের পর মিশরীয় বাহিনী সিনাই মরুভূমির পনের কিলোমিটার ভিতরে এগিয়ে যায়। সুয়েজখাল কিনারা বরাবর প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয়ে যায়। ইজরায়েলী সামরিক সূত্র স্বীকার করে, যে যুদ্ধের মোকাবিলা তাদের করতে হয়, তা খুব একটা সহজ নয়। মিশর আকাশ থেকে উপযুক্ত সাহায্য ছাড়াই মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই সুয়েজ খালের পূর্ব পাড়ে সত্তর হাজার সৈন্য এবং পাঁচশত থেকে সাত শত ট্যাঙ্ক

নিয়ে যাওয়ায় বিশ্বের সামরিক বিশেষজ্ঞরা হতভম্ব হয়ে যান। সামরিক দিক থেকে এটা ইজরায়েলের শোচনীয় পরাজয়।

ইজরায়েলী বাহিনী তাদের অবস্থান ছেড়ে পিছু হটতে থাকে। মিশরীয় বাহিনী চারশ ট্যাঙ্ক, বিশাল সাঁজোয়া বহর এবং শক্তিশালী বিমান বিধ্বংসী ইউনিট ও দুর্ভেদ্য এয়ার কভার নিয়ে দুর্বার বেগে এগিয়ে চলে সিনাই এর আরও গভীরে। এই অভিযানে মিশর দুই ডিভিশন সৈন্য নামায়। সুয়েজের দীর্ঘ একশ মাইল বিস্তীর্ণ পূর্ব উপকূল জুড়ে মিশরীয় বাহিনীর সামরিক তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। মিশরীয় সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল সাদ এল চাজলি বলেন, সিনাই অঞ্চলে আনীত এক হাজার ট্যাঙ্কের আটশত যুদ্ধে যোগ দেয়। ইজরায়েল এস-১১ ট্যাঙ্ক বিধংসী রকেট এবং হেলিকপ্টার বহনযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সহ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে। মধ্য রণাঙ্গণে যুদ্ধের গুরুত্বের কারণ হল, এইটিই সিনাই উপদ্বীপের প্রধান পথ। এই পথ গেছে উপকূল ভাগের আল আরিশ শহর, দক্ষিণে মিটলা গিরিবর্ত্ম এবং মধ্যাঞ্চলে সিনাই-এ। এখানকার যুদ্ধ জয়ের ওপরই উভয় পক্ষের লাভ লোকসানের পরিমাণ নির্ধারিত হত। চারশ ইজরায়েলী একটি ট্যাঙ্ক ও দুটি রাডার কেন্দ্র সম্পূর্ণ ধবংস হয় এখানে। সুয়েজের ওপরেই একটি ইজরায়েলী নৌবহর সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যায়। সিনাই রণাঙ্গণে মিশর ইজরায়েলের যে ট্যাঙ্ক ব্রিগেডকে সম্পূর্ণ ধবংস করে দেয়, তার অধিনায়ক মিশরীয় বাহিনীর হাতে বন্দী হন। তাকে কায়রো টেলিভিশনে দেখান হয়।

সিনাই মরুভূমির ট্যাঙ্ক যুদ্ধকে কায়রোর সংবাদপত্রগুলি বিশ্বের বৃহত্তম ট্যাঙ্কযুদ্ধ রূপে বর্ণনা করেন।

তেলআভিভে ইজরায়েলী সশস্ত্র বাহিনীর চীফ অফ স্টাফ মেজর জেনারেল আহারণ ইয়ারিভ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান যে, আরব বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য অগ্রাভিযানের মুখে টিকতে না পেরে ইজরায়েলী বাহিনী সুয়েজের পূর্ব উপকূল থেকে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত

হয় এবং ঐ এলাকায় ইজরায়েলী সামরিক ঘাঁটিগুলিতে মিশরের বিজয় পতাকা ওড়ে। তিনি স্বীকার করেন যে ইজরায়েলী স্থল ও বিমান বাহিনী মিশরীয়দের অগ্রাভিযান থামাতে ব্যর্থ হয়। বারলেভ লাইন দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধেই মিশরীয় বাহিনী অতিক্রম করে।

ইজরায়েলী পত্রিকা জেরুজালেম পোস্ট সিনাই রণাঙ্গণে মিশরীয় বাহিনীর সাহসিকতার ভূয়সী প্রসংসা করে লেখে, মিশরীয় সশস্ত্র বাহিনী প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছে। তাদের একত্রিত দৃঢ় সংকল্প এবারের যুদ্ধে এক বিরাট বিস্ময়।

যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরদিন বন্দী হন গিডিঅন গোল্ডমান। দুজন ইজরায়েলী সৈন্যের সঙ্গে তিনি ছিলেন একটি ঘাঁটি পাহারায়। গিডিয়ন বলেন, "মিশরীয়দের সুয়েজখাল পার হতে দেখে আমি অবাক। আমি মিশরীয়দের মোটেই যুদ্ধ করতে দেখিনি। তারা আমাদের একেবারেই কাবু করে ফেলে। আমরা পাল্টা আঘাতের সুযোগ পাইনি। এত তাড়াতাড়ি তারা আমাদের পরাজিত করে।"

উভয় পক্ষের সংগ্রামের গতি তীব্র হয়ে উঠতে থাকে। লেবাননের আকাশে ইজরায়েল ও আরবদের মধ্যে বিমান যুদ্ধ ঘটে। গোলান এলাকায় ইজরায়েল যুদ্ধ বিরতি রেখা অতিক্রম করে সিরিয়ার অভ্যন্তরে আক্রমণ চালায়। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ কুনেইত্রা শহরের চারপাশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকে। সিনাই রণাঙ্গনে ইজরায়েলের অবস্থা সুবিধাজনক ছিল না। ইজরায়েলী সৈন্যদের সংগে লণ্ডনের ডেলি মেল পত্রিকার সংবাদদাতা জানান, মিশরীয়রা ইসমাইলিয়ার পূর্বে সিনাই-এর ষোল কিলোমিটার ভিতরের ঘাঁটিগুলি দখল করে আছে।

দামাস্কাসে অসামরিক জনবসতিতে ইজরায়েল ব্যাপক ভাবে বোমাবর্ষণ করে। অকটোবরের নয় তারিখ বোমাবর্ষণে মারা পড়ে তিনজন ভারতীয় মহিলা এবং একটি শিশু। সোভিয়েত দূতাবাসটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং প্রায় ত্রিশজন সোভিয়েত নাগরিকের

প্রাণহানি ঘটে। নরওয়ের তিনজন নাগরিকও ইজরায়েলী বোমায় মারা পড়ে। লেবাননের রাজধানী বেরুত ও বারুফ পার্বত্য এলাকায় রাডার কেন্দ্রের ওপরও ইজরায়েলী বিমান আক্রমণ চালায়। ইজ-রায়েলী বিমানের জর্ডানের আকাশ সীমা লঙ্ঘনের খবর পাওয়া যায়।

কায়রো-আলেকজান্দ্রিয়া সড়কে ইজরায়েলের বিমান আক্রমণে যাত্রী বোঝাই একটি বাস এবং একটি রেস্তোরা সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় বাসের বিয়াল্লিশ জন যাত্রী নিহত এবং সতের জন গুরুতর আহত হয়। রেস্তেরায় নিহত হয় ত্রিশজন। তাছাড়া বাসের জন্য অপেক্ষমাণ ছয়জন যাত্রী বোমার আঘাতে নিহত এবং মাঠে কর্মরত কুড়িজন আহত হয়। সড়কে কর্মরত তের জন শ্রমিক মারা পড়ে।

সিরিয়ার টারটাস ও নাটাকিয়া বন্দরের কাছে ইজরায়েলী নৌ-বহরের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে একটি রুশ, একটি জাপানী ও একটি গ্রীক বাণিজ্য জাহাজ ডুবে যায়। দুজন গ্রীক নাবিক নিহত এবং কয়েকজন রুশ ও জাপ নাবিক সামান্য আহত হয়।

ইজরায়েলী বিমান সিরিয়ার তৈল শোধণাগার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, বিদ্যুৎ প্রকল্প, মিশরীয় বিমান ঘাঁটি, লেবাননের রাডার কেন্দ্র, কায়রো এবং দামাস্কাসে বোমাবর্ষণ করে। ইজরায়েল নীল ব-দ্বীপের বেসামরিক এলাকায় আড়াই শত থেকে পাঁচশত কিলো ওজনের মারাত্মক বিস্ফোরক বোমা ফেলে। তাছাড়া বেসামরিক এলাকায় বহুমুখী ব্যবহারযোগ্য মার্কিন জিএবি বোমা এবং বিলম্বিত বিস্ফোরক বোমাও ফেলা হয়।

মিশরীয় পার্লামেন্টে প্রেসিডেন্ট সাদাত ঘোষণা করেন, মিশর আজ দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। বিগত ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধে মিশর যা হারিয়েছিল ১৯৫৩ খৃঃ এগার দিনের যুদ্ধে তা আজ তার হাতের নাগালে। তিনি হুশিয়ারী করে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে ইজরায়েলের পক্ষে আকাশ-সেতু রচনা করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একথা ভালোভাবেই

জানা উচিত যে বর্তমানে এমনও ক্ষেপণাস্ত্র আছে, যা দিয়ে ইজ-রায়েলের একেবারে বুকের মাঝখানে আঘাত হানা যায়।

সিনাই প্রাঙ্গণে অগ্রগতি সত্বেও ইজরায়েলী বাহিনী সুয়েজ খালের পশ্চিম পাড়ে সুয়েজ শহরের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। মিশরীয় সমর নায়কদের মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসও এর জন্য অনেকখানি দায়ী। তৃতীয় বাহিনীর একটি বিরাট অংশ, প্রায় বিশ হাজার সৈন্যকে ঘিরে ফেলে ইজরায়েলী সৈন্য। দ্বিতীয় মিশরীয় বাহিনীর প্রাধান্য সুয়েজ খালের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে ছিল সমান। আর প্রথম বাহিনী কায়রো ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে প্রতিরক্ষায় নিযুক্ত ছিল।

গোলান পার্বত্য অঞ্চলে সিরীয় বাহিনীর প্রাথমিক সাফল্য ইজরায়েলী বাহিনীর প্রবল প্রতি আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যায়। তারা যখন দামাস্কাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন সিরিয়ার আক্রমণও প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। ইজরায়েলী বাহিনীর অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

অবশেষে রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গ্রহণ এবং তা কার্যকরী করতে রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনী এগিয়ে আসে। এবারের যুদ্ধে ইজ-রায়েল মিশরের অভ্যন্তরে চারশত পঁচাত্তর বর্গ মাইল এবং সিরিয়ার তিনশত বর্গ মাইল অঞ্চল দখল করে নিয়েছে। মিশর ইজরায়েলের পূর্ব পাড়ের বিস্তৃত অঞ্চল ফিরিয়ে নিয়েছে। সতের দিনের মাথায় যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব গৃহীত হলেও ইজরায়েল প্রকৃত পক্ষে আরও তিনদিন যুদ্ধ চালায়।

সুয়েজ খালের পূর্ব পাড়ে সিনাই উপদ্বীপের একশত বর্গ মাইল উত্তরে পোর্ট সৈয়দ থেকে দক্ষিণে সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত খাল বরাবর গোটা এলাকা মিশরের দখলে রয়েছে। সুয়েজ খালের পশ্চিম পাড়ে সুয়েজ বন্দর ও আদারিয়া বন্দর ইজরায়েলী অধিকারে থাকে। ঐ দুটি বন্দরের সঙ্গে কায়রোর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আদারিয়া সুয়েজ উপসাগরের পশ্চিম তীরে সুয়েজ বন্দরের দশ মাইল দক্ষিণে

অবস্থিত। যুদ্ধ বিরতি প্রস্তাব লঙ্ঘন করে ইজরায়েল সুয়েজ শহর দখলের লড়াই চালায় দূর পাল্লার কামানের গোলাবর্ষণের আড়ালে। রাষ্ট্রসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর কর্মকর্তা নভেম্বর তিন তারিখে জানান, সুয়েজ নগরী মিশরীয় বাহিনীর অধিকারেই আছে, শহরতলীতে ইজরায়েলী সৈন্য থাকলেও, কোন ইজরায়েলী সৈন্য নগরীতে প্রবেশ করতে পারেনি।

দুবার যুদ্ধ বিরতির পরও ইজরায়েল সুয়েজ খালের দক্ষিণ প্রান্তে সুয়েজ শহরে মিশরীয় সৈন্য ও বেসামরিক জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপণাস্ত্র ও নাপাম বোমাসহ আক্রমণ চালায়। যুদ্ধ বিরতির আড়ালে মিশরের বিরুদ্ধে নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়। সিরিয়া ফ্রণ্টে বিমান ও স্থল যুদ্ধে ইজরায়েলী আগ্রাসী তৎপরতা প্রকট হয়ে ওঠে। লেবাননের রাচেয়া আলফখর এবং কাওবেল গ্রামে ইজরায়েলী কামানের গোলা ও বোমাবর্ষণে ব্যাপক ক্ষতি হর।

কায়রোর আল আহরাম পত্রিকায় বলা হয়, ইজরায়েলীদের মর্টারের গোলায় টহলদানরত রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর দুজন সদস্য আহত হয়।

ইজরায়েলী কর্তৃপক্ষ আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রতিনিধিদের সুয়েজ আহত সৈন্যদের দেখতে যেতে বাধা দেয়। সুয়েজের আল গানেইন এবং আমেয় গ্রামের দুইশত আটানব্বই জন বাসিন্দাকে জোর করে তাদের বাড়ীঘর থেকে নিকটতম মিশরীয় সামরিক অবস্থানে তাড়িয়ে দেয়।

অকটোবরের ত্রিশ তারিখে ইজরায়েলী সৈন্যরা গনেইফা, ফায়েদ, কেব্রিত, আবু সুলতান, আইনউসিম এবং সেরাপিয়াসের বেসামরিক জনসাধারণকে বিতাড়িত করে। ছয়শত ব্যক্তিকে ক্যাম্পে ধরে রাখে। এ হল জেনেভা কনভেনশানের বিরোধী। ইজরায়েলী সৈন্যরা এই অঞ্চলে গবাদি পশুকে গুলি করে হত্যা করে এবং ফায়েদ ও ফানাবার দোকানপাট ধ্বংস করে।

এবারের যুদ্ধে মিশরের শ্রেষ্ঠতম সাফল্যের নিদর্শন বারলেভ লাইনে ইজরায়েলের শোচনীয় বিপর্যয়। সিনাই উপদ্বীপে ইজ-রায়েলীদের প্রথম প্রতিরক্ষা ব্যূহ বার-লেভ-লাইন ছেড়ে সরে আসতে বাধ্য হয় ইজরায়েলী বাহিনী। ইজরায়েল সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের সহকারী মেজর জেনারেল আহারণ ইয়ারিভ জাতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত এক টেলিভিশন বিবৃতি বলেন সুয়েজ খালের পূর্বতীরে মিশরের এখন চারশতটি ট্যাঙ্ক আছে এবং ইজরায়েলের ভূ ও বিমান সৈন্যরা খালের ওপার থেকে আরও রসদ ও সাঁজোয়া বাহিনী আমদানিতে বাধা দিতে পারছে না। মিশরীয় সৈন্যরা বার-লেভ লাইনে কংক্রিটের কতকগুলি পরিত্যক্ত বাঙ্কার দখল করে নিয়েছে।

এই বারলেভ লাইন ইজরায়েলীদের কাছে ম্যাজিনো লাইন হিসাবে পরিচিত ছিল। মিশরীয় মেজর জেনারেল জামাল মোহাম্মদ আলী এই লাইন সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধের পরই বারলেভ লাইন তৈরির কাজ শুরু করে ইজরায়েল। বারলেভ লাইনের ত্রিশটি স্থান দুর্ভেদ্য করে তৈরি করা হয়। এই সব স্থানে স্থল বাহিনীর প্রায় এক কোম্পানী থেকে এক ব্যাটেলিয়ান সৈন্য থাকত এবং পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সবগুলি স্থানে যোগাযোগ রাখা যেত।

ইতিহাসের এই অন্যতম দুর্ভেদ্য লাইন নির্মাণ করতে ইজরারেলের ব্যয় হয় তেইশ কোটি আশি লক্ষ মার্কিন ডলার। লাইনের ত্রিশটি ঘাঁটির প্রতিটি ছিল কাটা তার দিয়ে ঘেরা, দুশ গজ দূর পর্যন্ত মাইন পোতা ছিল, আর ছিল একমাস চলার উপযোগী আহার এবং অস্ত্রশস্ত্র। ঘাঁটির প্রতি ধারে ছিল গোলন্দাজ মর্টার ও ট্যাংক বাহিনী থাকার জায়গা, আরও ছিল দাহ্য পদার্থে ভরা ট্যাংক অগ্নি বলয় যাতে মিশরীয়রা এ বাধা অতিক্রম করতে না পারে।

ঘাঁটিগুলিতে গুলিবর্ষণের জন্য পৃথক কিন্তু পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ক্ষেত্র ছিল! আর আশ্রয় নেওয়ার জন্য ঢেউ তোলা লোহার পাত, রেলের স্লিপার এবং বালি ভর্তি থলের পুরু আস্তরণ। এভাবে

নির্মিত আশ্রয়স্থলের এক হাজার পাউণ্ডের গোলার আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা ছিল।

এই লাইন ভাঙতে পারা যাবে কিনা সে সম্পর্কে মিশরীয় সামরিক কমাণ্ড বাহাত্তর সালে তিনশ বারেরও বেশীবার লাইনের মডেল তৈরি করে পরীক্ষা চালায়। নীল নদের কৃষি খালগুলিকে অভিযানের বিকল্প হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল সুয়েজ খাল অতিক্রমের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হিসাবে। বারবার তারা পরীক্ষার পর, অবশেষে সুয়েজ খাল অতিক্রম করে সাফল্যের সঙ্গে।

যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিদিন সাতশ থেকে আটশ টন অস্ত্র পাঠাতে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমানে গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র পাঠায় ইজরায়েলে। এর মধ্যে ছিল বোমা, রাইফেল, ট্যাংকের যন্ত্রপাতি এবং রকেট। আমেরিকা ইজরায়েলের প্রত্যেকটি নষ্ট হওয়া অস্ত্রপূরণের নীতিগ্রহণ করে। মার্কিন বৈমানিকরা চল্লিশটি বিমান চালিয়ে নিয়ে যায় ইজরায়েলে। এর মধ্যে কয়েকটি হল ফ্যাণ্টম জঙ্গী বোমারু। ১৩৫ মিলিমিটার কামানের গোলা, হাউটজার, কয়েকটি সি—৫ গ্যালাক্সি বিমান, ২২০ হাজার পাউণ্ড ওজনের অস্ত্র বহনের উপযোগী বিমান পাঠান হয়। ফ্যাণ্টম জেটের সঙ্গে যায় স্কাইহক বোমা (বিমান থেকে মাটিতে ফেলার উপযোগী)।

ইজরায়েলের ফ্যাণ্টম বিমানের একজন বন্দী পাইলট কায়রোয় এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন যে, মার্কিন পাইলটরা নতুন জঙ্গী ফ্যাণ্টম বিমানগুলি চালাচ্ছে এবং আশাদোদ এবং হাইফা বন্দরে আমেরিকার স্কাইহক বিমান নামান হয়।

পশ্চিম জার্মানীর বিমানকে গোয়েন্দা বিমান হিসাবে ব্যবহার করে ইজরায়েলী বাহিনী। কায়রোতে বন্দী ইজরায়েলী পাইলট গুণ্টার কিরমিস জানান খুব উঁচু দিয়ে উড়তে সক্ষম ভোরনিয়ার-২৮ বিমান তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

সিনাই-এ বন্দী ইজরায়েলী পাইলটের নাম স্কোয়াড্রন লীডার গৌরী বেল গরুজ। মিশরের একটি সামরিক ক্ষেপণাস্ত্র বিমানটিকে ভূপাতিত করে। তিনি জানান, বিমান ঘাঁটিতে ছয়টি ফ্যান্টম বিমানকে তিনি খালাস হতে দেখেছেন। তাছাড়া লিড্ডা বিমান বন্দরে প্রতি পনের মিনিটে আমেরিকার বিমান বোঝাই বোমা, ক্ষেপণাস্ত্র এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম খালাস করা হতে থাকে।

ইজরায়েলের নষ্ট হওয়া বিমান ও সমরসম্ভার পূরণ করার জন্য সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি এবং কংগ্রেসের অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। সিনেটর কেনেডি প্রধান প্রধান ইহুদি সংগঠনের সভাপতিদের তাড়াহুড়া করে আহূত এক বৈঠকে বক্তৃতা করছিলেন। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগেই ইজরায়েলকে এই আশ্বাস দিয়ে রেখেছে যে, সে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র ইজরায়েলকে দেবে। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এবং সমস্ত রাষ্ট্রের পক্ষে ইজরায়েলের অস্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে মেনে নিতে যত দীর্ঘ সময়ই লাগুক না কেন, আমরা এই প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকব।

ইজরায়েলী বিমান বাহিনীর কমাণ্ডার জেনারেল বেন হামীন পেলেড টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানান, মধ্যপ্রাচের বর্তমান যুদ্ধের আগে ইজরায়েলী সমর শক্তি যা ছিল, এই যুদ্ধের পর তা একই পর্যায়ে রয়েছে। পেলেড বলেন, এই যুদ্ধে আমাদের বিমান বাহিনী প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। যদি আবার এ ধরণের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়, তাহলে এবারের যুদ্ধের চেয়ে আরও উন্নতমানের রণনৈপুণ্য প্রদর্শিত হবে। তিনি বলেন যে, একমাত্র স্যাম ব্যবহার করেই আরবরা তাদের বিমান ঘায়েল করেছে। আমরা জানতাম প্রতিপক্ষের কাছে স্যাম আছে। তবে এত বেশী আছে তা আমরা জানতাম না। এটাই এই যুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কারণ।

মিশরীয় বার্তা প্রতিষ্ঠান প্রচার করে, মার্কিন ষষ্ঠ নৌবহরের এফ—৪ ফ্যাণ্টম জেট বিমানগুলি সুয়েজখাল এলাকায় মিশরীয় অবস্থানে বোমাবর্ষণ করে। দামাস্কাসে আমেরিকান বৈমানিক চালিত কতকগুলি মার্কিন বিমান ভূপাতিত হয়। বিমানের প্যানেলে লেখা ছিল 'মার্কিন নৌবাহিনী' আমেরিকান ইলেকট্রনিক ইন কর্পোরেশন, লা মিরাজ, ক্যালিভোর্নিয়া, মার্কিন সম্পত্তি। ইজরায়েলী বিমানের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার মিরেজ বিমান মিশরীয় বিমান বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, এবং একটী দক্ষিণ আফ্রিকান মিরেজ গুলি করে নামান হয়।

মার্কিন হেলিকপ্টারবাহী জাহাজ আইওজিমাকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে মহড়া বন্ধ করে ষষ্ঠ নৌবহরের সঙ্গে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য ষষ্ঠ নৌবহরে দুটি বিমানবাহী জাহাজসহ আঠারটি রণতরী রয়েছে। ষষ্ঠ নৌবহরকে আরও শক্তিশালী করার জন্য দু হাজার নৌসেনা পাঠান হয়।

মার্কিন সরকারী কর্মচারীরা জানান, বিভিন্ন ঘাঁটি থেকে মার্কিন বিমানযোগে ইজরায়েলে গোলন্দাজ ও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র পাঠাতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ তাড়াতাড়ি শেষ করার জন্য বিমানের উত্তপ্ত স্থানে অর্থাৎ কেবলমাত্র ইতিহাসে আঘাত করতে পারে, এমন উত্তাপসন্ধানী ক্ষেপণাস্ত্র এবং আকাশ থেকে আকাশে ক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যাপকভাবে ইজরায়েলে পৌঁছায়। প্রতিরক্ষা দপ্তরের মুখপাত্র রবার্ট ম্যানক্লসকি জানান, যুদ্ধে ইজরায়েলের যে সব সমরাস্ত্রের ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলে সমরসম্ভার পাঠায়।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নিকসন ঘোষণা করেন ইজরায়েলের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক হস্তক্ষেপে প্রস্তুত। তারপরই সাহায্য পরিমাণ ব্যাপক হয়ে ওঠে। ইজরায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার স্বেচ্ছাসেবককে প্রস্তুত রাখা

হয়। এরা সবাই ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত। ইজরায়েলে বিমান-যোগে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার জন্য মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর বিমান বাহিনীর কিছু সংখ্যক সৈন্য তলব করা হয়।

জিবরালটার প্রণালী থেকে এগার শত মাইল দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে আজোরেস দ্বীপপুঞ্জের লাগেস দ্বীপের মার্কিন বিমান ঘাঁটি থেকে প্রতি পনের মিনিট অন্তর মার্কিন পরিবহন ও জঙ্গী বিমানগুলি ইজরায়েল অভিমুখে রওনা হতে থাকে। এখান থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টায় আনুমাণিক ছ'শত বিমান ইজরায়েলে যায়। এগুলি প্রধানত বোয়িং ৭০৭, সি—১৩০, সি—১৪১ ও সি—৫৪ বিমান। প্রথম তিন ধরণের বিমানে যথাক্রমে ৮০০, ৯২ এবং ১৫৪ জন লোক বহন করা যায় এবং শেষেরটি এক লক্ষ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড যুদ্ধাস্ত্র বহনে সক্ষম। লোহিত সাগরে ইথিওপিয়ার ইরিত্রিয়া রাজ্যের রাজধানী আসমারার কাছে ক্যানরো সামরিক ঘাঁটি থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর পরিবহন বিমানগুলি অস্ত্রশস্ত্র ইজরায়েলে পৌঁছে দেয়।

বনের জনৈক সরকারী মুখপাত্রের স্বীকৃতিতে প্রকাশ ইজরায়েলে সমরাস্ত্র প্রেরণে পশ্চিম জার্মানীর মার্কিন ঘাঁটিগুলি ব্যবহৃত হয়েছে।

মার্কিন কৃত্রিম উপগ্রহ বা গোয়েন্দা বিমান মিশরীয় বাহিনী কোন এলাকায় সব থেকে কম শক্তি সমাবেশ করেছে, সে সম্পর্কে ইজরায়েলকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে। এই এলাকাটি ছিল বিটার লেকের কাছকাছি সম্ভবতঃ এটা মিশরীয়রা প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসাবে ব্যবহার করতে গিয়ে ইজরায়েলী বাহিনীকে সুয়েজখাল পারের সুযোগ করে দেয়।

ছয়দফা চুক্তি স্বাক্ষরের পরও মার্কিন সরকার ইজরায়েলকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই যেতে থাকে। ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর পত্রিকায় প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায় প্রতিদিন বিশটি মার্কিন পরিবহন বিমান ট্যাঙ্ক, রকেট, বোমা এবং অন্যান্য নানা ধরণের সমরাস্ত্র

ইজরায়েলে নিয়ে যেতে থাকে। আমেরিকা মোট প্রায় তিনশত কোটি ডলার মূল্যের সমরাস্ত্র সরবরাহ করে।

মার্কিন সপ্তম নৌবহরের টাস্ক ফোর্স নিয়ে বিমানবাহী জাহাজ জন হ্যানকক ভারত মহাসাগরে হাজির হয়। হ্যানককের সঙ্গে আছে পাঁচটি ডেস্ট্রয়ার ও একটি তেলবাহী জাহাজ। ভারত মহাসাগরে বিমানবাহী জাহাজ পাঠাবার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের উভয় পার্শ্বেই মার্কিন যুদ্ধ জাহাজ মোতায়েন করা হয়। ভারত মহাসাগরে কুড়িটি সোভিয়েত নৌ জাহাজ থাকলেও, তাদের নৌ তৎপরতা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। সপ্তম নৌবহরের টাস্ক ফোর্স প্রেরণ, গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে শক্তি প্রদর্শনের প্রস্তুতি ছাড়া কিছুই নয়। মার্কিন বিমান ক্যারিয়ায় কূটনীতির শেষ প্রদর্শন ১৯৫১ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে বিগত ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারত মহাসাগরের দিয়োগোগোর্সিয়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি ছোট যোগাযোগ কেন্দ্র আছে, কিন্তু অভিযান চালাবার মত কোন ঘাঁটি নেই তৈরি হচ্ছে।

কৃষ্ণসাগর থেকে পাঁচটি সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজ এবং একটি বিশালকায় সামরিক পরিবহন জাহাজ পশ্চিম এশিয়ার রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে ভূমধ্যসাগরে হাজির হয়। পাঁচটি যুদ্ধ জাহাজের সবগুলিই হল ট্রুপসল্যাণ্ডি; বা সৈন্য অবতরণ জাহাজ। এগুলি এক থেকে চার হাজার সৈন্য অবতরণে সক্ষম।

সোভিয়েত বিমানগুলি যুগোশ্লাভ বিমান বন্দর ব্যবহার করে। বিরাটকায় অ্যাণ্টেনভ—১২ বিমানগুলি সমরসম্ভার নিয়ে দিনে পঞ্চাশবার যুগোশ্লোভিয়ার উপর দিয়ে উড়ে যায় মধ্যপ্রাচ্যে। জ্বালানীর জন্য তাদের টিটোগ্রাডে নামতে দেখা যায়।

প্যারিসে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন, যত দিন না মধ্য-প্রাচ্য সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হবে, ততদিন আরব দেশগুলিতে অস্ত্র সাহায্য অব্যাহত থাকবে।

যুদ্ধবিরতি ?

যুদ্ধের প্রথমেই মিশর সরকার কায়রোতে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের জানান, ইজরায়েল পুরো সিনাই উপদ্বীপ ছেড়ে দিলে মিশর যুদ্ধবিরতিতে রাজি হবে। মিশর বর্তমান যুদ্ধরেখা বরাবর অথবা বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়ায় আগেকার যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে না।

সেনেগালের প্রেসিডেন্ট মিঃ লিওপোল্ড সেংঘরকে এক তার-বার্তায় মিসেস গোল্ডামেয়ার বলেন, ইজরায়েল দখলীকৃত সকল আরব এলাকা ছেড়ে দিতে রাজী আছে যদি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ইজরায়েলের সীমান্তকে আরবরা মেনে নেয়, আর নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়।

অক্টোবরের ষোল তারিখে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন কায়রো যান মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি এবং পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে। মিঃ কোসিগিন প্রেসিডেন্ট সাদাতের কাছে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ থামাবার ব্যাপারে চারদফা প্রস্তাবে বলেন— (১) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং যৎসামান্য রদবদল করে ইজরায়েলী বাহিনীকে ১৯৫৭ খৃঃ সীমান্তে নিয়ে যেতে হবে। (২) নতুন সীমান্তের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ভার থাকবে রাষ্ট্রসংঘের স্বস্তি পরিষদের সদস্যদের ওপর। (৩) দুই বৃহৎশক্তির বাহিনীসহ আন্তর্জাতিক বাহিনী যুদ্ধবিরতি চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবে। (৪) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে অথবা অন্যান্য রাষ্ট্রের সাহায্যে এইসব সীমান্তের নিরাপত্তা যাতে ক্ষুণ্ন না হয় সেই

গ্যারান্টি দেবে। প্রেসিডেন্ট সাদাত তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। ফেরার পথে তিনি সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তার প্রতিক্রিয়া অবশ্য জানা যায়নি।

ক্রেমলিনে ফিরে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী শান্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য প্রেসিডেন্ট নিকসনকে অনুরোধ জানান ডঃ কিসিঙ্গারকে মস্কো পাঠাবার। ডঃ কিসিংগারের নেতৃত্বে একটি জরুরী মিশন মস্কো উপস্থিত হয়। সেই আলোচনার ফলশ্রুতি নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত রুশ মার্কিন যৌথপ্রস্তাব।

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিকসন যুদ্ধ বন্ধে তৎপর হয়ে ওঠেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কিসিংগারকে নির্দেশ দেন নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করতে।

নিরাপত্তা পরিষদ ২২ অক্টোবর বার ঘণ্টার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতির আহ্বান সম্বলিত একটি যুগ্ম সোভিয়েত মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইজরায়েল ও মিশর একে অপরে মেনে নেওয়ার শর্ত সাপেক্ষে যুদ্ধ বিরতির আহ্বান মেনে নেয়। নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে যুদ্ধে লিপ্ত সকল পক্ষের প্রতি প্রস্তাবটি গ্রহণের বার ঘণ্টার মধ্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকেই গোলাবর্ষণ বন্ধ করার এবং সবরকম সামরিক তৎপরতা বন্ধের আহ্বান জানান হয়। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবটি সর্বাংশে বাস্তবায়ন শুরু করার আহ্বান জানান হয়। প্রস্তাবের তৃতীয় সঙ্গে বিবদমান পক্ষগুলির প্রতি অবিলম্বে এবং যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সঙ্গে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের আওতায় মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠার আলোচনা শুরুর আহ্বান জানান হয়। ১৪—০ ভোটে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। চীন ভোটদানে বিরত থাকে।

চীনা প্রতিনিধি হুয়াং হুয়া বলেন, প্রস্তাবটি দুটি মহাশক্তির নির্লজ্জ মিতালি। তিনি এটাকে মহাশক্তিগুলির তরফ থেকে

আরব জনগণের ওপর আর একটি 'যুদ্ধ নয় শান্তি নয়' পরিস্থিতি চাপিয়ে দেওয়ার নতুন প্রয়াস বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে, ইজরায়েলী হামলার নিন্দা করতে হবে। অবিলম্বে আরব এলাকা থেকে সৈন্য সরাতে হবে এবং প্যালেস্টাইনীদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফী যুদ্ধবিরতির নিন্দা করেন এবং এটিকে একটি 'মেয়াদী বোমা' বলে অভিহিত করেন। আলজেরিয়ায় প্যালেস্টাইন মুক্তিফ্রণ্টের প্রতিনিধি আবু খলিল বলেন, এখন হোক আর পরে হোক মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধবিরতির সঙ্গে প্যালেস্টাইন বিপ্লবের কোন সম্পর্ক নেই।

চব্বিশ অক্টোবর তিউনিসে ফ্রণ্টের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ বিরতির সঙ্গে প্যালেস্টাইনের গেরিলা-দের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং তাদের প্রতিরোধ চলবেই। বিবৃতিতে বলা হয়, প্যালেস্টাইন ভূখণ্ডের পূর্ণ মুক্তি এবং মুসলমান খৃস্টান এবং ইহুদিদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্যালেস্টাইন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। মুক্তিফ্রণ্ট প্রতিনিধি আবু নাবিল নিরাপত্তা পরিষদের সমালোচনা করে বলেন, এই সংস্থা কখনও ইজরায়েলের ওপর তার সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সক্ষম হয়নি।

আলজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদীন চূড়ান্ত মীমাংসা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতি আরো গুরুতর ও বিপজ্জনক যুদ্দের পথকেই প্রশস্ত করবে। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ন্যায়সঙ্গত সমাধান করতে হলে আরব দেশগুলির অখণ্ডতা এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের ন্যায্য অধিকার পুণ প্রতিষ্ঠার বিধান তাতে থাকতে হবে।

২২ অকটোবরের যুদ্ধবিরতি রেখায় সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে নির্দেশ দিয়ে স্বস্তি পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, ইজরায়েল ক্রমাগত তা অমান্য করে চলে। এই অভি-

যোগ জানান রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব কুর্ট ওয়ালডহাইম যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত রিপোর্টে। রিপোর্টটি স্বস্তি পরিষদের সরকারী দলিল হিসাবে প্রচারিত হয়।

ওয়াশিংটনে মিসেস গোলডামেয়ার বলেন যে, ২২ অকটোবরের যুদ্ধ বিরতিকালে উভয়পক্ষের কে কোথায় ছিল সেটা কেউ পুনঃ নির্ধারণ করতে পারবে না। এবং তিনি ইজরায়েলের এককভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের বিরোধী। এই সময় তিনি আরো বলেন যে, ২২ অকটোবরের যুদ্ধবিরতি রেখা হচ্ছে বিশ্বের এক রহস্য ঘেরা ঘটনা, কারণ, এ রেখা যে কোথায় তা কেউই জানে না।

ইজরায়েলে ক্ষমতাশীল শ্রমিকদলের মুখপত্র স্পষ্টভাবে বলে যে, প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের ওয়াশিংটন আলোচনার অর্থ এই নয় যে রণাঙ্গণে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের অবসান হয়ে গেছে। আমাদের এই বাস্তব সত্যটি উপেক্ষা করা উচিত নয় যে, এখনও পর্যন্ত যুদ্ধ শেষ হয়নি।

প্রাক্তন ইহুদি মেজর জেনারেল হাইম হরজগ এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে বলেন, সামরিক কারণের চেয়ে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণেই আমাদের সুয়েজ খালের পূর্বতীরে ফিরে যাওয়া দরকার। মিশরের লক্ষ্য হল সুয়েজের পুবপাড় দখলে রেখে আমাদের সবসময় সামরিক দিক থেকে প্রস্তুত থাকতে বাধ্য করা। এর পরিণামে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নতি স্বীকারে বাধ্য হব।

মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘন বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সৈন্য পাঠাবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানান। কিন্তু যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার জন্য সোভিয়েত সৈন্য প্রেরিত হতে পারে এই সম্ভাবনায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্বে তার ক্ষেপণাস্ত্র-ঘাঁটিগুলিসহ সমস্ত ঘাঁটির হাজার হাজার সৈন্য, অজ্ঞাত সংখ্যক

বিমান বাহিনীর ইউনিটকে সম্ভাব্য যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ পাঠায়। ১৯৫২ খৃঃ কিউবা সংকটের পর এটাই হল সব চাইতে গুরুতর সতর্কতার নির্দেশ। যাদের সতর্ক থাকতে বলা হয়, তাদের মধ্যে ছিল উত্তর ক্যারোলিনার ফোর্ট ব্রাগ ঘাঁটির বিরাশিতম এয়ার-বোর্ণ ডিভিশন, য়ুরোপের ঘাঁটিগুলির 'কুইক রিঅ্যাকশন টিম' এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটিগুলির অন্যান্য সামরিক ইউনিট। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান পারমাণবিক প্রতিরোধ বাহিনী কৌশলগত বিমান কমাণ্ডও এর আওতায় পড়ে।

মার্কিন সেনাবাহিনীকে সতর্কীকরণ নতুন নয়। এরূপ সতর্কী-করণ ঘটেছিল, ১৯৫০ খৃঃ জর্ডানে সিরিয় সৈন্য অবতরণের সময়; ১৯৫৮ খৃঃ উত্তর কোরিয়ার মার্কিন গোয়েন্দা জাহাজ আটকের সময়; ১৯৫২ খৃঃ কিউবা সঙ্কটের সময় এবং ১৯৫৮ খৃঃ লেবানন সংকটকালে।

মস্কোতে মিঃ ব্রেজনেভ মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঙ্গারের মধ্যে মতৈক্যের পর এই পরিস্থিতি স্বাভাবিকভাবে বিশ্বরাজনীতিকে ঘোলাটে করে তোলে। সোভিয়েত নেতারা আভাস দিয়েছিলেন যে, কিসিঙ্গারের সঙ্গে একটি বিষয়ে মতৈক্য হয়েছিল তা হল, মস্কো ও ওয়াশিংটন ১৯৫৭ খৃঃ অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিধান সম্বলিত ১৯৫৭ খৃ: নভেম্বরের ২৪২ নম্বর প্রস্তাব বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দেবে।

নিরাপত্তা পারিষদে ২৫ অকটোবর রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনী গঠনের আহ্বান সম্বলিত একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে, এতে মার্কিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন বা স্বস্তি পরিষদের অপর তিনটি স্থায়ী সদস্য দেশের কারোরই সৈন্য থাকবে না। এই নয়া বাহিনী নিরাপত্তা পরিষদের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে থাকবে। মিশর ও সিরিয়া এই বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়।

প্রস্তাবে অবিলম্বে ও পুরোপুরি যুদ্ধ বিরতি মেনে চলার এবং

সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলি ১৯৫৩ খৃঃ ২২ অকটোবর গ্রীনিচ সময় ৪'৫০ মিঃ-এ যে যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যাওয়ার দাবী জানান হয়। রাষ্ট্রসংঘ সামরিক পর্যবেক্ষকদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও প্রস্তাবে অনুরোধ জানান হয় রাষ্ট্রসংঘ মহাসচিবকে।

মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত সৈন্য পাঠাবার হুমকি এবং বিশ্বব্যাপী মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে সতর্ক থাকার নির্দেশের প্রেক্ষিতে সৃষ্ট উত্তেজনা জরুরী বাহিনী গঠণের সিদ্ধান্তে প্রশমিত হয়।

এটাকে প্রেসিডেণ্ট সাদাতের জয় মনে করা অন্যায় হবে না। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ এনে প্রেসিডেণ্ট সাদাত তা কার্যকর করার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত রুশ ও মার্কিন সৈন্য পাঠাবার আহ্বান জানান। সাদাতের লক্ষ্য ছিল স্বস্তি পরিষদ একটি আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করুক—সেই উদ্দেশ্যে তার রুশ মার্কিন সৈন্য পাঠাবার আহ্বান। আমেরিকা সৈন্য পাঠাবে না জানায় এবং আশা প্রকাশ করে অন্য কোন শক্তি অনুরূপ কাজে বিরত থাকবে। সাদাতের তৎপরতায় সমর্থনের উদ্দেশ্যেই একতরফাভাবে হস্তক্ষেপের হুমকি।

মিশরে নিয়োজিত রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনীতে সর্ব মোট দু হাজার তিন শত পনের জন সৈন্য থাকবার কথা। সমগ্র বাহিনীটি পাঁচশত অষ্ট্রীয়, আটশ পঞ্চান্ন জন ফিনিশ, পাঁচশ সত্তর জন সুইডিশ এবং তিন শত নব্বই জন আইরিশ সৈন্য নিয়ে গঠিত।

মিশরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের মুখপত্র জেনারেল মুখতার কায়রোয় বলেন যে, ইজরায়েল ক্রমাগত যুদ্ধ বিরতি সীমা লঙ্ঘন করে চলেছে। চার থেকে সাত নভেম্বর—এই সময়ে প্রতিদিনই সুয়েজ খালের উপর দিয়ে ইজরায়েলের পর্যবেক্ষক বিমান উড়ে গেছে। আর ইজরায়েলী সেনাবাহিনী হালকা ট্যাংক, কামান ও সাঁজোয়া গাড়ীর সাহায্যে সামরিক কার্য কলাপ চালায়। জেনারেল মুখতার বলেন, ইজরায়েল কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা লঙ্ঘনের

খবর নিয়মিত ভাবেই রাষ্ট্রসংঘের জরুরী বাহিনীর প্রধান ই, সিলাসভুও-কে এবং কায়রোতে রাষ্ট্রসংঘের সদর দপ্তরে জানান হয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটি মারফত যে চুক্তিতে উপনীত হওয়া গেছে সেই চুক্তিও ইজরায়েল লঙ্ঘন করছে। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রতিনিধিরা আহতদের দেখার জন্য সুয়েজের দিকে যখন যাচ্ছিলেন তখন ইজরায়েলের টহলদার বাহিনী তাদের বাধা দেয়। ফলে তারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে না পেরে কায়রো ফিরে যেতে বাধ্য হন।

সিরিয়া সীমান্তের যুদ্ধ বিরতি সীমারেখাও ইজরায়েল বার বার প্ররোচনা সৃষ্টি করে। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র খবর দিয়েছেন যে, সিরীয় আরব প্রজাতন্ত্রের আকাশ সীমা কতকগুলি ইজরায়েলী বিমান লঙ্ঘন করে। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ কেন্দ্র থেকে এইসব বিমানের ওপর আক্রমণ চালান হয়। সিরিয়ার বিমান বিধ্বংসী কামানের গোলায় দুটি ফ্যাণ্টম জেট ধ্বংস হয়।

ইজরায়েলী গোলন্দাজ বাহিনী লেবাননের গ্রামগুলির ওপর নৃশংস ভাবে গোলাবর্ষণ করে। সেবা গ্রামে এই গোলাবর্ষণে অনেক অসামরিক মানুষ হতাহত হয়। ইজরায়েলী বিমানগুলি বেকা উপত্যকায় এবং সইদা শহরে লেবাননেব আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে। চারটি ইজরায়েলী ফ্যাণ্টম ভূমধ্যসাগরের ওপব উড্ডয়ণরত একটি লেবাননী বেসামরিক বিমানের ওপর হামলা চালায়।

সুয়েজ খালের পূর্বতীরে প্রথমে ইজরায়েলী গোলন্দাজ বাহিনী গোলাবর্ষণ করে এবং পরে ইজরায়েলী জঙ্গী বোমারু বিমানগুলি রকেট ও গুলিবর্ষণ করে রাষ্ট্রসংঘের একদল টহলদার ফিনিশ সৈন্যের গতিরোধ করে। রাষ্ট্রসংঘ পর্যবেক্ষকদের রিপোর্টে বলা হয় ইজ-রায়েলী গোলন্দাজ বাহিনী সুয়েজের উত্তর ও পূর্ব এলাকায় মিশরীয় অবস্থানের ওপর গোলাগুলি চালায়। অজস্রবার তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে।

মস্কোতে কিসিঙ্গার ও ব্রেজনেভ আলোচনার শেষে কিসিঙ্গার সোজা তেলআভিভ পৌঁছে গোল্ডামেয়ারকে জানান, যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার পরও ইজরায়েলী বাহিনী এগিয়ে গেলে ক্ষতি হবে না। কোসিগিন যখন কায়রো ছিলেন তখনই সিনাই-এ মিশরীয় বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে। তাঁর কায়রো অবস্থানের প্রথম রাতেই ইজরায়েলী বাহিনী সুয়েজ অতিক্রম করে জমি দখলের লড়াই শুরু করে। কিন্তু মিঃ কোসিগিনকে তা জানান হয়নি। প্রেসিডেন্ট সাদাত রণক্ষেত্রে মিশরীয়দের সাফল্যের কথাই শুনিয়েছিলেন সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রিকে। সুতরাং মিঃ কোসিগন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে ধীরে সুস্থেই আলোচনা চালিয়েছিলেন।

বিপর্যস্ত ইজরায়েলকে রক্ষা করে এবং সুয়েজের পশ্চিম তীরে ইজরায়েলী বাহিনীকে ঢুকিয়ে দিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেনরী কিসিঙ্গারের মধ্যপ্রাচ্য মিশন সক্রিয় হয়ে ওঠে! মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির ললিত বাণী নিয়ে তিনি ঘুরেছেন। সাতষট্টির যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে ছয় জুন মিশর ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়। প্রেসিডেন্ট সাদাত এবং ডঃ কিসিঙ্গারের মধ্যে আলোচনার পর তা পুনঃ স্থাপিত হয়েছে। তারপরই ডঃ কিসিঙ্গারের ছয় দফা শান্তি প্রস্তাব মেনে নেয় মিশর এবং ইজরায়েল। কিন্তু যুদ্ধের অন্যতম পক্ষ সিরিয়া এই চুক্তির প্রতি সমর্থন জানায় নি। ১৯৪৯ খৃঃ পর গত চব্বিশ বছরে এই প্রথম আরব ইজরায়েল সরাসরি চুক্তি হয় এগারই নভেম্বর সুয়েজ খাল ফ্রন্টে কায়রো থেকে ১০১ কিলোমিটার (তেষট্টি মাইল) দূরে কাঁটা তার ঘেরা রাষ্ট্রসংঘের 'কায়রো চেক পোস্টে'। ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ প্রধানমন্ত্রী গোল্ডামেয়ারের সামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল আহরন ইয়ারিভ ইজরায়েলের পক্ষে এবং মিশরীয় সেনাবাহিনীর চীফ অফ অপারেসনস্ ও সেকেণ্ড ইন কম্যাণ্ড মেজর জেনারেল আবদুল ঘানি জামান মিশরের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠান তদারক করেন রাষ্ট্রসংঘ বাহিনীর

কমাণ্ডার ফিনল্যাণ্ডের জেনারেল এনসিও সাইল্যাসভুও। এই বিশেষ দিনটিতেই ১৯১৮ খৃঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসান সূচনাকল্পে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল পঞ্চান্ন বছর আগে।

চুক্তির প্রথম শর্ত—উভয় পক্ষ যুদ্ধবিরতি মেনে চলবে—তা অবশ্য স্বস্তি পরিষদে গৃহীত যুদ্ধবিরতি চুক্তির পুনরাবৃত্তি। দ্বিতীয় শর্ত—২২ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি সীমানায় ফিরে যাওয়ার জন্য উভয় পক্ষ আলোচনা শুরু করবে। এও অবশ্য স্বস্তি পরিষদের নির্দেশেরই আনুষঙ্গিক ফল। কিন্তু ২২ অক্টোবরের সীমানা সম্পর্কে ইজরায়েল এবং মিশরের এক মত না হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। রাষ্ট্রসংঘ মধ্যস্থতাকে তারা নাও মানতে পারে। তৃতীয় শর্ত—অবরুদ্ধ সুয়েজ সহরে খাদ্য, পানীয় এবং ওষুধ পাঠাবার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রসংঘ প্রতিনিধিরা এই পথ নির্ধারণ করতে না পারায় উদ্যোগ নেয় আমেরিকা। ফলে আমেরিকার মর্যাদা বাড়ে এবং রাষ্ট্রসংঘের সম্মান যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়। চতুর্থ শর্ত—সুয়েজ খালের পুব পাড়ে (বিটার লেকের পাশে) অবরুদ্ধ মিশরীয় তৃতীয় বাহিনীর জন্য ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবার ব্যবস্থা করা। দায়িত্ব পালন করতে হবে রাষ্ট্রসংঘকে। পঞ্চম শর্ত--অবরুদ্ধ বাহিনীর কাছে ত্রাণ সামগ্রী পাঠাবার পরিকল্পনা। এটা চতুর্থ শর্তেরই অঙ্গ। ষষ্ঠ শর্ত—যথা সত্বর যুদ্ধবন্দী ও আহতদের বিনিময়ের ব্যবস্থা করা। নির্দিষ্ট ভাবে কোন সময় সীমা তারিখ উল্লেখ না থাকায় মনোমালিণ্যের সম্ভাবনা।

এই ২২ অক্টোবরের সীমারেখার সম্পর্কে মিশরের দাবী স্পষ্ট। অবশ্য ইজরায়েল তা মানতে রাজী নয়। এই চুক্তির সঙ্গে যদি ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধপূর্ব সীমারেখায় ফিরে যাওয়া সম্পর্কে আলোচনার নির্দেশ থাকত তবে একটি শান্তির সম্ভাবনা ছিল। ২২ অক্টোবরের সীমানায় ইজরায়েলকে ফিবে যেতে হবে এমন কোন প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে এ.ল, প্রেসিডেণ্ট নিক্সন তার বিরুদ্ধে ভেটো দেওয়ার হুমকি দিয়ে সমগ্র পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলেন।

এই স্বস্তি পরিষদের প্রস্তাবেই কিন্তু আছে ২২ অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় ফিরে যাওয়ার নির্দেশ। ইজরায়েল বা আমেরিকা কেউই গ্রাহ্য করে না রাষ্ট্রসংঘকে। ছয় দফা চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের শক্তি-হীনতারই প্রমাণ। অক্টোবরের যুদ্ধে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা মাত্র আছে এই চুক্তিতে, মূল সমস্যা সমাধানের কোন ব্যবস্থা নেই। যে কারণে মিশর বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কাউকেই চুক্তি সম্পর্কে আশান্বিত হতে দেখা যায়নি। কিসিঙ্গারের কর্ম চঞ্চলতার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস ছিল আরব জগতে গ্লানিময় মার্কিন মর্যাদা পুনরুদ্ধার।

ছয়দফা যুদ্ধবিরতি চুক্তি বাস্তবায়ণে বাধার সৃষ্টি হয় গুরুত্বপূর্ণ কায়রো-সুয়েজ সড়ক কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে এ প্রশ্নে মিশর ইজরায়েল অনৈক্যে। তাছাড়া সুয়েজ খালের কাছে ইজরায়েলী ও রাষ্ট্রসংঘ শান্তি রক্ষাবাহিনী সংঘর্ষের মুখোমুখি হয়। প্রধানমন্ত্রী মেয়ার বলেন ঐ রাস্তার নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রসংঘের কাছে সমর্পণে ইজরায়েল বাধ্য নয়। ইজরায়েলে জাতীয়তাবাদী পার্টিগুলির 'মিথিল' কোয়ালিশন এই চুক্তিস্বাক্ষরের জন্য সরকারের নিন্দা করে। এই বিরোধী গ্রুপের অভিযোগ হচ্ছে: চুক্তিতে তিনটি ঘাটতি রয়েছে: ১। এক সিরিয়ায় বন্দীদের ফেরৎ দেওয়ার কোন আশ্বাস নেই; ২। ২২ অক্টোবরের অবস্থানে ফেরার কথা রয়েছে, যার ফলে অবরুদ্ধ তৃতীয় বাহিনী মুক্ত হয়ে যাবে। ৩। লোহিত সাগরের মুখে আরব অবরোধ অপসারণের কোন কথা নেই। তাছাড়া কোয়ালিশন দাবী করে, সংসদীয় নির্বাচনের আগে সরকার কোন পদক্ষেপ নিতে পারবে না।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী গোল্ডমেয়ার নেসেতে বলেন যে, ইজরায়েল বাইশ অকটোবরের যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় ফিরবে না। এই সীমান্ত 'কাল্পনিক ও আজগুবী। তিনি তার পরিবর্তে দু পক্ষকে এবারের যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার আহ্বান জানান।

প্রেসিডেন্ট সাদাত বাবেল মাণ্ডেব প্রণালীতে নৌ অবরোধ সম্পর্কে আলোচনার জন্য—এডেন সফর করেন গোপনে। প্যালেস্টাইনের দশজন গেরিলা নেতা মস্কো যান! প্যালেস্টাইন প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন ইয়াসিন আরাফাত। যুদ্ধ পরবর্তী রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কৌশল স্থির করবার জন্য আঠারটি আরব রাষ্ট্রপ্রধানের শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি সুরু হয়ে যায়। আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার মন্ত্রী পরিষদ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতি আলোচনার জন্য জরুরী সম্মেলনে মিলিত হন। দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগালকে তেল সরবরাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য তেল উৎপাদনকারী আরব দেশগুলির প্রতি আহবান জানান হয়। কিয়েভে সোভিয়েত-কমিউনিস্ট. পার্টি প্রধান লিওনিদ ব্রেজনেভ বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে আরবদের সংগ্রামে আরব রাষ্ট্রগুলিতে সাহায্যদান অব্যাহত রাখবে।

কিন্তু ২২ অকটোবরের যুদ্ধবিরতি রেখায় ইজরায়েলী সৈন্য অপসারণে ইজরায়েলী অস্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য মিশর-ইজরায়েল আলোচনা মুলতুবী হয়ে যায় আঠারই নভেম্বর। সিরীয় ফ্রন্টে প্রচণ্ড গোলা বিনিময় চলতে থাকে।

ইজরায়েলী প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ান হুশিয়ার করে বলেন, অকটোবরে যুদ্ধ শেষ হয়নি, এবং কেবল সুরু হয়েছে। জনসাধারণকে নতুন যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবার তিনি আহ্বান জানান।

ছাব্বিশে নভেম্বর আরব রাষ্ট্র প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত হয়, অধিকৃত আরব এলাকাগুলি থেকে বিশেষ করে জেরুজালেম থেকে অবিলম্বে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার আর ছিন্নমূল প্যালেস্টাইনীদের জাতীয় অধিকার ও মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এ দুটি শর্তের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থাকে (পিএলও) প্যালেস্টাইনী জনগণের একমাত্র প্রতিনিধি সংস্থার স্বীকৃতি জানায়।

জর্ডানের বাদশাহ হোসেন বলেন, জেনেভা শান্তিসম্মেলনে পিএলও আমন্ত্রিত হলে, তিনি যোগ দেবেন না। ইজরায়েলী নেতারাও ইয়াসির আরাফাতের সঙ্গে আলোচনায় বসতে অস্বীকৃতি জানায়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন প্যালেস্টাইন প্রতিনিধিদের যোগদানের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে এই সিদ্ধান্তে অধিক গুরুত্ব দেয়।

এর মধ্যে জেনেভায় শান্তি সম্মেলনের আয়োজনের ব্যাপারে সোভিয়েত মার্কিন উদ্যোগ সক্রিয় ছিল। আরব এবং ইজরায়েলী নেতাদের বিভ্রান্তিকর মন্তব্য শান্তি সম্মেলনের সম্ভাব্যতায় অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে। প্রাক্তন ইজরায়েলী গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল হাইম হারজগ বলেন, "ডিসেম্বরে জেনেভায় ইজরায়েল এবং আরবদের মধ্যে যে শান্তি আলোচনা শুরু হচ্ছে তা ছয় মাস কি এক বছর কি আরও বেশী দিন চলতে পারে।"

জর্ডানের বাদশাহ হোসেন জেনেভা সম্মেলনে প্যালেস্টাইন গেরিলা প্রতিনিধিদের যোগদানের বিরুদ্ধতা করে, নিজেকেই একমাত্র প্রতিনিধি স্বীকৃতির ওপর জোর দিতে থাকেন। কিন্তু প্যালেস্টাইনীদের পক্ষে সেই দাবী মেনে নেওয়া অসম্ভব। আল-ফাতহ-র সহকারী নেতা আবু আয়াদ জেনেভা সম্মেলন সম্পর্কে বলেন, ইজরায়েল শান্তি মেনে নেবে না এবং ইজরায়েল ক্ষুব্ধ হয়, এমন কোন শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ নেই। আল ফাতাহ সমগ্র প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীতে অটল থাকবে। এ ধরণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হচ্ছে একটি অপরিহার্য নীতি। আমরা এ নীতি বিসর্জন দিতে পারি না। আল ফাতাহর রাজনৈতিক কার্যক্রম বর্তমানে বাদশাহ হোসেনের হাতে বিলোপ সাধনের বিপদ থেকে প্যালেস্টাইনীয় ভূখণ্ডকে রক্ষা করার লক্ষ্যে পরিচালিত। বাদশাহ হোসেন কুড়ি

বছর ধরে ইজরায়েলের রক্ষাকর্তা এবং আমাদের জনগণের নিপীড়ক মাত্র। প্যালেস্টাইনীয় ও জর্ডানী জনগণের সর্বাগ্রে হাশিমী শাসনের কবল থেকে পরিত্রাণ লাভই আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য।

জেরুজালেম পার্লামেন্টে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান ঘোষণা করেন সিরিয়া যদি ইতিমধ্যে ইজরায়েলী যুদ্ধবন্দীদের একটি তালিকা পেশ না করে, তাহলে ইজরায়েল জেনেভা সম্মেলনে যোগ দেবে না।

লা মঁদে পত্রিকায় এক সাক্ষাৎকারে বাদশাহ হোসেন বলেন যে, তিনি প্যালেস্টাইনীদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, ফেডারেটীভ রাষ্ট্র, কিংবা হাশিমী রাজ্যের (জর্ডান) সঙ্গে ইউনিয়ন গঠন—এই তিনের মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দিয়েছেন। ভবিষ্যতে মুক্তাঞ্চল শাসনের জন্য প্যালেস্টাইনীদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ব্যবস্থাটা কি ধরণের হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারটী তাদের ওপরই নির্ভরশীল। ইতিমধ্যে অধিকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করার দায়িত্ব তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

ঠিক এই সময় আল আহরাম সম্পাদক হেইকল একটি নিবন্ধে লেখেন আমাদের এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে, শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে যা কিছু বলা হোক না কেন, ইজরায়েলের সংগে আমাদের সংগ্রামের পথ অনেক অনেক দীর্ঘ। তিনি বলেন একটা স্বাধীন পারমাণবিক ছত্রছায়া ছাড়া মিশর কোন বলিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ভূমিকা পালন করতে পারে না। ষাটের দশকে প্রেসিডেন্ট নাসের আণবিক অস্ত্র তৈরির চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এমন কি কয়েকটি দেশ পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির ব্যাপারে চীনের সাহায্যও চেয়েছিল। এমন কি লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট গাদ্দাফীও এই অস্ত্র কেনার চেষ্টা করেছিলেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাতের সংগে শান্তি সম্মেলন সম্পর্কে আলোচনায় মিলিত হন ডঃ কিসিংগার। সেখান থেকে তিনি চলে যান সৌদি আরব। তাদের আলোচনা প্রসংগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে

প্রেসিডেণ্ট সাদাত জানান শান্তি সম্মেলনে সকলেই এক কক্ষে সমবেত হবে। ইজরায়েলও আসবে। কিন্তু যদি তাদের সংগে সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন করেন, বলব, না, সরাসরি আলোচনা আমাদের সংগে হবে না।

ডাঃ কিসিংগার সৌদি আরবে বাদশাহ ফয়জলকে জানান, জেরু-জালেম সহ অধিকৃত আরব অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলের ওপর চাপ সৃষ্টি করবে। তিনি সৌদি আরবকে যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহের অনুরোধ জানালে বাদশাহ ফয়জল জানান, শুধু মুখের কথায় তিনি সন্তুষ্ট নন। এ ব্যাপারে তিনি ওয়াশিংটনের সরকারী বিবৃতি চান।

অবশেষে দীর্ঘ জটিলতার পর, একুশে ডিসেম্বর জেনেভায় জেনেভা শান্তি প্রাসাদে পশ্চিম এশিয় শান্তি সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে মিশর, ইজরায়েল, জর্ডান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন। উদ্বোধন করতে গিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেন : "এই সম্মেলন সব চাইতে জটিল ও বিপজ্জনক একটি আন্ত-র্জাতিক সমস্যার মোকাবিলার পক্ষে এক বিরাট সুযোগ এবং সুযোগের সদ্ব্যবহার যদি না করা হয় তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে আবার এক বিপজ্জনক ও দারুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে।" সম্মেলনের অন্যতম উদ্বোক্তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো বলেন : "ইজরায়েলী সৈন্যরা দখলীকৃত আরব এলাকা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে কোন শান্তি আসবে না। শান্তি সম্মেলনে যে কোন সিদ্ধান্ত বা চুক্তিই হোক না কেন তাতে ১৯৫৫ খৃঃ যুদ্ধের পর দখলিকৃত আরব এলাকা থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহারের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে।" মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কিসিংগার বলেন : "শান্তি আসবে কিনা, আজ সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন—আমরা কী ভাবে সেই অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাব।" মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহমি বলেন : "এই সম্মেলন মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনের এক বিরাট

সুযোগ। কিন্তু ইজরায়েল যদি তার বর্তমান ধারণা ত্যাগ না করে এবং এই সুযোগ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়, তা হলে সেটাই হবে সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।" ইজরায়েলী পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবা ইবান বলেন: "ইজরায়েল এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণের জন্যে।"

সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে রোমের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বিমান বন্দরে আগুনে বোমার সাহায্যে একটি যাত্রীবাহী বিমান উড়িয়ে দেওয়ায় একুশ জন নিহত ও চল্লিশজন আহত হয়। তারা একটি লুফথানসা যাত্রীবাহী বিমান ছিনতাই করে। মোট চল্লিশজন নিহত হয়। প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থার একজন প্রতিনিধি রোম বিমান বন্দরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে প্যালেস্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনের কোনভাবে জড়িত থাকার কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে অস্বীকার করেন।

মনে রাখতে হবে জেনেভা শান্তি সম্মেলন বানচাল করবার এটি একটি ইজরায়েলী গোপন চক্রান্তেরই অঙ্গ।

যাই হোক জেনেভা সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সুয়েজ খাল বরাবর সৈন্য অপসারণের ব্যাপারে অবিলম্বে একটি বিশেষ সামরিক গ্রুপ কাজ শুরু করবে। এই সামরিক গ্রুপ গঠন ব্যাপারে মতৈক্য ঘটায়, সম্মেলনের প্রথম পর্যায় শেষ হয়ে যায় দ্বিতীয় দিনেই।

কায়রো সুয়েজ সড়কের ১০১ কিলোমিটার পয়েন্টে মিশরীয় সেনাবাহিনীর চীফ অফ দি জেনারেল স্টাফ আবদেল ঘানি গামাজি এবং ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর চীফ অব দি জেনারেল স্টাফ ডেভিড এলজার মিশর ও ইজরায়েল সেনাবাহিনী পৃথক করার চুক্তিতে সাক্ষর করেন আঠারই জানুআরি। চুক্তি অনুযায়ী ইজরায়েল সৈন্য সুয়েজখাল থেকে ৩৩ কিলোমিটার পূর্বে সরে যাবে। ইজরায়েলী ক্ষেপণাস্ত্র, সাঁজোয়া বহর এবং কামান মিটলা ও গিডি গিরিপথের পিছনে সরাতে হবে।

নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মিশর ও ইজরায়েল মেনে চলবে এবং যুদ্ধের হুমকি ও প্ররোচনা বন্ধ করবে।

বিরোধের সামগ্রিক নিস্পত্তির আগে মিশর সুয়েজ খাল খুলবে না, তবে তারা খাল পরিষ্কার ও প্রশস্ত করার কাজ চালাবে।

ইসতেহারে সৈন্য পৃথকীকরন সম্পর্কে মানচিত্র ও আছে। সুয়েজের পূর্ব তীরে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার পশ্চিমে মিশরীয় সেনা-অবস্থান সম্পর্কে নির্দেশ আছে। দুই দেশের বাহিনীর মাঝখানে থাকবে রাষ্ট্রসংঘ জরুরী বাহিনী। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের বাদ দিয়েই জরুরী বাহিনী গঠিত হবে। সুয়েজের পূর্বতীরে অবস্থিত মিশরীয় বাহিনী সীমিত অস্ত্র ও সৈন্য থাকবে। অনু-রূপ স্বল্প অস্ত্র থাকবে গিড্ডি মিটলা গিরিপথে অবস্থিত ইজরায়েলী বাহিনীর। উভয় পক্ষের নির্দিষ্ট এলাকায় তাদের বিমানবাহিনী তৎপরতা চালাতে পারে।

চুক্তিতে অবশ্য বলা হয়েছে, দুটি দেশই এটাকে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তি মনে করে না। তবে নিরাপত্তা পরিষদের ৩৩৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী সম্মেলনের কাঠামোর অধীনে চূড়ান্ত, ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ মনে করে।

মোশে দায়ান বলেন সুয়েজ খাল খনন করা হবে এবং এই অঞ্চ-লের অবস্থা স্বাভাবিক করা হবে, এই নীতির ভিত্তিতেই ইজরায়েল মিশরের সংগে সৈন্য পৃথক করার চুক্তিতে সাক্ষর করেছে!

ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ জেনারেল ডেভিড এলজার বলেন এক মাসের মধ্যে সৈন্য অপসারনের কাজ শেষ হবে।

এবং আঠারো জানুয়ারী সুয়েজের পশ্চিমতীর থেকে ইজরায়েলী সৈন্য, বাহিনী ও সামরিক সরঞ্জাম অপসারণ সুরু হয়।

যাওয়ার আগে ইজরায়েলী সৈন্যরা মিশরীয় সৈন্যদের উদ্দেশ্যে লিখে রেখে যায় "এস, আর যুদ্ধ নয়, আমরা পরস্পরকে ভালবাসি"।

অবরুদ্ধ তৃতীয় বাহিনীর সেনাবাহীর ফিরে যেতে থাকে।

ইজরায়েলী প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ার বলেন, মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে সৈন্য অপসারণ চুক্তির ফলে সুয়েজ খাল পুনরায় খুলে যাওয়া এবং সুয়েজ খাল দিয়ে ইজরায়েলী জাহাজ চলাচলের ওপর মিশরের নৌ-অবরোধের অবসান ঘটা উচিত।

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল ফাহমি বলেন, ইজরায়েল ভূখণ্ড ছেড়ে দিলে এবং প্যালেস্টাইনীদের জাতীয় অধিকার মেনে নিলে মিশর ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করবে।

এদিকে মিশরের প্রেসিডেন্ট সাদাত বলেন, জেনেভা শান্তি সম্মেলনে প্যালেস্টাইনী প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত মিশর এই সম্মেলন শুরু করতে অস্বীকৃতি জানাবে। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনীদের বাদ দিয়ে মিশর ইজরায়েলীদের সঙ্গে কোন রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দেবে না।

মনে রাখতে হবে, এই সৈন্যাপসারণ চুক্তি কেবল মাত্র মিশর ইজরায়েল ফ্রন্টেরই ব্যাপার সিরিয়া ইজরায়েল ফ্রন্টে চুক্তি হয় নি।

এই চুক্তির সংবাদ কায়রো তেল আভিভ ও ওয়াশিংটন থেকে এক যোগে প্রচারিত হলেও মস্কো ছিল সম্পূর্ণ নীরব। বরং মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ইসমাইল ফাহমির মস্কো সফর শেষে এক যুক্ত ইশতেহারে বলা হয়, বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রের অধিকৃত অঞ্চল ইজরায়েল ছেড়ে না দিলে এবং প্যালেস্টাইন জনগনের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার না করা পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসতে পারে না।

ফলাফল

অকটোবরের যুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীর সাফল্যের কয়েকটি কারণ :

আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার ও বিমান যুদ্ধে মিশর দক্ষতা ও বলিষ্ঠ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে ;

ইজরায়েলী হামলায় মত ধ্বংস না হয়ে মিশরের বিমানবাহিনী যথাযথ কর্তব্য পালন করে ;

ছয় বছর ধরে মিশরীয় বাহিনীর সামরিক শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তাদের আক্রমণ ক্ষমতা বেড়েছে ;

ইজরায়েলী বিমান হামলা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সিনাই এলাকায় মিশরীয় বাহিনীর অগ্রাভিযানে রাজনৈতিক অচলাবস্থার অবসান ঘটে। মিশরীয় জনগনের মনোবলও বেড়ে যায় নাটকীয়ভাবে। সামনের অসুবিধার কথা তখন তারা বিস্মৃত।

গত ছয় বছর ধরে চারটি বিষয় ছিল আরবদের আতঙ্কের কারণ। এবার মিশর তা দূর করতে পেরেছে :

প্রথমত, সর্বজ্ঞহিসাবে প্রচারিত ইজরায়েলী গোয়েন্দা বাহিনীর দুর্বলতার প্রকাশ ;

দ্বিতীয়তঃ সর্বশক্তিমান ইজরায়েলী বিমানবহর সিনাই-এ মিশরীয় বাহিনীর অগ্রাভিযান রোধে ব্যর্থ হয়। দুর্ধর্ষ ইজরায়েলী সাঁজোয়া বাহিনী মিশরীয় ট্যাঙ্ক বহরের চারশ ট্যাঙ্কের সুয়েজ খাল অতিক্রম বন্ধ করতে পারেনি।

তৃতীয়ত ইজরায়েল প্রচার করেছিল সুয়েজের পুব পাড়ে তৈরী করা বারলেভ লাইন অতিক্রম করে কোন ট্যাঙ্ক অগ্রসর হতে পারবে না। তা ব্যর্থ করে এগিয়ে যায় মিশরীয় ট্যাঙ্ক বহর।

চতুর্থ শিক্ষা হল, ইজরায়েলী প্রতিরোধ শক্তিতে ভঙ্গুর প্রমাণ হয়ে গেছে; সুতরাং সামরিক শক্তির ওপর নির্ভর করে সীমান্ত সুরক্ষিত রাখতে পারবে—ইজরায়েলের পক্ষে আর এই দাবী করা সম্ভব নয়!

কোন খেসারত না দিয়ে যে কোন সময় আরব রাষ্ট্রগুলির ওপর হামলা চালিয়ে সাফল্য অর্জন সম্ভব এই ইজরায়েলী সিদ্ধান্ত বাতিল হয়ে গেছে। তিয়াত্তরের জুলাইয়ে জেনারেল শেরণ পর্যন্ত বলেছিলেন, "ইজরায়েল একটি বৃহৎ শক্তি……এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা খার্তুম থেকে বাগদাদ এবং আলজেরিয়া পর্যন্ত অঞ্চল জয় করতে পারব।" অকটোবরের যুদ্ধে এই অহংকার চূর্ণ হয়ে গেছে।

আরব ঐক্য ইজরায়েলকে দুটি ফ্রণ্টে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছে।

তেলকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগে আশাতীত সাফল্য এসেছে।

আরব সোভিয়েত ঐক্যে ফাটল ধরাবার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক দুনিয়ায় ইজরায়েল নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ে। চব্বিশটি আফ্রিকান রাষ্ট্র ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে।

পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলিতে তেলের সরবরাহ হ্রাস, দামবৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ সব দেশ প্রকাশ্যে নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের ভিত্তিতে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের দাবী করে।

মার্কিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনা না করায় তারা ক্ষুব্ধ হয়।

বর্তমান যুদ্ধে—আরবদের বিরাট কূটনৈতিক বিজয় হয়েছে। আরবদের দীর্ঘ দিনের ধারণা ইজরায়েল নিজস্ব ক্ষমতায় নয়, বরং মার্কিন সমর্থনেই আরব ভূখণ্ড দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছে। গোল্ডামেয়ার সৈন্যদের সামনে এক সময় বলেন, মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ছাড়া তাদের আর কিছু করার নেই। কারণ বিমানযোগে

মার্কিন অস্ত্র পাঠাবার আগে ইজরায়েল পরাজয়ের সম্মুখীন হয়।

ইজরায়েলকে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলির তুলনায় শক্তিশালী করে তুলেও, এই অঞ্চলের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আনবার মার্কিন প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে।

ইজরায়েল যদি তার বেপরোয়া হটকারী নীতি অনুসরণ করে, তবে ভবিষ্যতে তাকে এজন্য বিরাট রাজনৈতিক খেসারত দিতে হবে।

এবারের যুদ্ধ আরব রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত করেছে। তেল উৎপাদনের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ তারাই নিয়ন্ত্রণ করবে। তেলের দাম ব্যারেল প্রতি দশ থেকে বার ডলার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়ন কার্যাবলী রূপায়ণ সম্ভব হবে।

তৈল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলি সঙ্গে তৈল ব্যবহারকারী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হওয়ায়, এই অঞ্চলে পশ্চিমী তৈল কোম্পানী-গুলির প্রভাব হ্রাস পাবে ব্যাপকভাবে।

অক্টোবরের যুদ্ধে উভয়পক্ষ এমন কয়েকটি অস্ত্র ব্যবহার করে এর আগে কোন যুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়নি। বিশ দিনের যুদ্ধে নতুন নতুন অস্ত্রের পরীক্ষা চলে। পাশ্চাত্য সংবাদপত্র থেকে জানা যায় উভয় পক্ষই নতুন ট্যাঙ্ক থেকে আরম্ভ করে ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে।

কৃত্রিম উপগ্রহ মাধ্যমে আমেরিকা রণাঙ্গনে যুদ্ধের অগ্রগতি-সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং ইজরায়েলী বাহিনী সেই তথ্যের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

আরবদের ব্যবহৃত নতুন অস্ত্রগুলির মধ্যে আছে, সোভিয়েত নির্মিত স্যাম—৬, ইলেকট্রনিক নিয়ন্ত্রিত ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, সুইংউইং এসইউ—২০ জঙ্গী বোমারু বিমান এবং যোল ইঞ্চি পুরু টি—৬২ ট্যাঙ্ক। সিরিয়ার কাছে যে এস-ইউ—২০ বিমান আছে তা নিয়ে এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ হয়নি।

স্যাম ছয়ের পাল্লা হল গাছের ওপর থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট

পর্যন্ত। নির্দিষ্ট ঘাঁটি না হলেও ব্যবহার করা যায়। তাছাড়া সহজ বহণযোগ্য হওয়ায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া সম্ভব। মিশরীয় বাহিনী এই ক্ষেপণাস্ত্র ভ্রাম্যমান ছত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। বিমান থেকে যে ধোঁয়া বেরোয়, তার তাপের গতিপথ অনুসরণ করে ক্ষেপণাস্ত্রটি বিমানে গিয়ে আঘাত করে। তাছাড়া এই ক্ষেপণাস্ত্রটির সাফল্য নির্ভর করে ইলেকট্রনিক গানফাইটার এইমিংডটে ধরা পড়া বিমান লক্ষ্য করে নিক্ষেপকারী কতটা নির্ভুল ভাবে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন্ মিশর ও সিরিয়াকে যে সব স্যাম ক্ষেপণাস্ত্র দিয়েছিল তারা সে সব সদ্ব্যবহার করে ইজরায়েলী বিমান বাহিনীর ব্যাপক ক্ষতি করে। স্যাম ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটিগুলি সুয়েজ খালের পশ্চিম-তীর বরাবর সুবিন্যস্ত ও গোপণভাবে বসান আছে। স্যাম ক্ষেপণাস্ত্র-গুলি জেট ইঞ্জিনের তাপের ইনফ্রা রেড সন্ধানী যন্ত্রের দ্বারা লক্ষ্য-স্থলে আঘাত করে।

যুদ্ধে ইজরায়েল কারমোরান নামক এক ধরণের বোমা ব্যবহার করে। এটি একটি বড় বোমা—যার ভিতরে থাকে অনেক ছোট বোমা। বড় বোমাটি শূন্যে ফাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোট বোমাগুলি ছড়িয়ে পড়ে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। মূলত সিনাই অঞ্চলে এই বোমা ব্যবহৃত হয়।

ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর বিশেষজ্ঞরা জানান মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধে ইজরায়েলীদের পক্ষ হয়ে আরবদের বিরুদ্ধে ইলেকট্রনিক যুদ্ধ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোয়েন্দা বিমান এস আর ৭১ এবং ফেরেট ধরণের কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবহার করে। ফেরেট ধরণের উপগ্রহ তিন মাইল উর্ধে পৃথিবীর কক্ষপথে নিক্ষিপ্ত হয়। উপগ্রহটি মিশরীয় রাডার তৎপরতা রেকর্ড করে, আরবদের ব্যবহৃত ক্ষেপণাস্ত্রের রাডার নিয়ন্ত্রণকারী দিক ও স্পন্দনের দৈর্ঘ ধরা পড়ে। মিশরীয় স্যাম ক্ষেপণাস্ত্রের পুরো ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়ার মত ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে দেয়।

যুদ্ধে ইজরায়েল যে সব অস্ত্র ব্যবহার করে, তার মধ্যে টেলিভিশন নিয়ন্ত্রিত বিমান থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ম্যাভেরিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং বিমান থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য নিয়ন্ত্রিত ওয়ালীংস বোমা উল্লেখযোগ্য।

ইজরায়েল যুদ্ধে যে সব নতুন মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করেছে তার মধ্যে ছিল হাল্কা ট্যাংক বিধ্বংসী রকেট এল এড ডবলিউ। এর ওজন মাত্র পাঁচ পাউণ্ড। রক আই বোমার মধ্যে থাকে শত শত ছোট আকারের বোমা। এগুলি ট্যাঙ্ক বহরের ওপর নিক্ষিপ্ত হয়। আর একটি মারাত্মক অস্ত্র হল টেলিভিশন ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ওয়ালে নামক এক হাজার পাউণ্ডের ক্ষেপণাস্ত্র। বোমারু বিমান থেকে গোলন্দাজ বাহিনী ও ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটির ওপর নিক্ষেপ করা যায়। এইসব অস্ত্রের পরীক্ষা ভিয়েতনামে ঘটেনি।

ইজরায়েল আগেকার ব্যবহৃত স্টাণ্ডার্ড আর্ম সুপারসনিক রকেটও ব্যবহার করে। যা রাডার কেন্দ্র ধ্বংস করতে পারে। রাডারের সংকেত ধরে রাডার স্টেশনে গিয়ে আঘাত করে। ইজরায়েল এমন একটি ট্যাংক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করেছে—যা ষোল ইঞ্চি পুরু রাশিয়ান টি—৬২ ট্যাঙ্ক ধ্বংস করেছে।

ফরাসী সামরিক সূত্রে প্রকাশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইজরায়েলকে যে কোন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা ভেদে সক্ষম দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত এক ধরণের বোমা সরবরাহ করে। মিশরের একটি রাডার কেন্দ্রে টেলিভিশন নিয়ন্ত্রিত বোমা ফেলার পর জানা যায় এই তথ্য। হ্যানয়ের ডুমার সেতু ধ্বংস করার জন্য ১৯২২ খৃঃ ১২ মে সর্বপ্রথম স্মার্ট বোমা ব্যবহৃত হয়। লোহিত নদীর ওপর এই সেতু রক্ষায় সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। টেলিভিশনের মত শব্দ ও আলোর তরঙ্গের সাহায্যে স্মার্ট বোমার গতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

যুদ্ধবিরতি চুক্তি কার্যকরী হওয়ার পরও সিরীয় ফ্রন্টে ইজরায়েলী বিমান হামলার উদ্দেশ্য ছিল স্যাম ৬ ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবিলা করার মত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সদ্য আনা জঙ্গী বোমারু বিমান ও ইলেকট্রনিক চালিত প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম পরীক্ষা করে দেখা।

যুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেণ্ট সাদাত ইজরায়েলকে সতর্ক করে বলেছিলেন, মিশরের নিজের তৈরি রকেট আছে। এগুলি যে কোন মুহূর্তে ইজরায়েলের কেন্দ্রস্থলে আঘাতে সক্ষম। মার্কিন গোয়েন্দা দপ্তর পরে স্বীকার করেন মিশরের কাছে প্রায় কুড়িটি সোভিয়েত নির্মিত গোলন্দাজ রকেট আছে। এইসব রকেট সোভিয়েতের ভারী গোলন্দাজ বাহিনীর অন্তর্গত। এগুলি বার মিটার দীর্ঘ। ওজন পাঁচ টন এবং গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় তিন হাজার মাইল। এই সব ক্ষেপণাস্ত্রর পাল্লা একশত নব্বই মাইলেরও বেশী। এগুলি খুব শক্তিশালী সাধারণ বোমা ব্যবহার করতে পারে।

সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলেছেন পশ্চিম এশিয়ায় ভবিষ্যতের যে কোন যুদ্ধ কারিগরি দক্ষতার পরীক্ষা ক্ষেত্রে পরিণত হবে। রাজনৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও মানবিক বিচার বোধ সামরিক বিচার বোধের কাছে হেরে যাচ্ছে। পশ্চিম এশিয়া পরিণত হবে সামরিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে।

বর্তমান যুদ্ধে সিরিয়ার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হয় বিপুল। ইজরায়েলী বোমাবর্ষণে সিরিয়ার বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর সম্ভাবনা প্রায় পুরোপুরি বিনষ্ট হয়ে গেছে। ফলে বিদ্যুৎ শক্তির জন্য সিরিয়াকে নির্ভর করতে হবে প্রতিবেশী আরব দেশগুলির ওপর। বিধ্বস্ত অর্থনীতি পুনর্গঠনে সময় লাগবে বেশ কয়েক বছর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিরিয়া যুদ্ধবিরতি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে অবশেষে। কিন্তু সৈন্যাপসারণ সম্পর্কে কোন চুক্তিতে আসেনি।

এবারের যুদ্ধে ইজরায়েলের অর্থনৈতিক বনিয়াদ প্রায় ধ্বসে পড়েছে। অস্ত্রশস্ত্র ও জ্বালানির জন্য দিতে হবে পাঁচশত পঞ্চাশ কোটি ডলার। তিয়াত্তরের সমগ্র ইজরায়েলী বাজেটের থেকে এই

অঙ্কটা বেশী। সমাধিক্ষেত্র থেকে পর্যটন-হোটেল সর্বত্র মারাত্মক ক্ষতির চিহ্ন। একমাত্র অক্টোবরেই ইজরায়েলের হীরা পালিশ শিল্পে ষাট লক্ষ ডলার এবং পর্যটন বাবদ কুড়ি লক্ষ ডলার ক্ষতি হয়। বিপুল পরিমাণ মার্কিন সাহায্য সত্ত্বেও অস্ত্রশস্ত্র ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের জন্য এই সমস্যা তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বল্প জনসংখ্যার জন্য ইজরায়েলে কোন রকম আতঙ্ক চিহ্ন দেখা না গেলেও, তীব্র মূল্যবৃদ্ধি, অতিরিক্ত করভার, জীবনধারণের মান হ্রাস এবং অর্থনৈতিক দুর্দশায় দেশটির চেহারা বেশ বিপর্যস্ত।

ইজরায়েলী অয়েল ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জানান, ইজরায়েলে তেলের স্টকের মেয়াদ মাত্র ছয় মাস। বিশ্বের সব থেকে উন্নত ধরণের তেল সরবরাহ ব্যবস্থা আছে ইজরায়েলে। আণ্ডার গ্রাউণ্ড পাইপের সাহায্যে বিভিন্ন তেল সরবরাহ কেন্দ্রগুলি সংযুক্ত। এই ব্যবস্থা চালু হয় ১৯২৭ খৃঃ ছয় দিনের যুদ্ধের পর। তখন বেসামরিক বসতি এলাকা থেকে জ্বালানি ট্যাঙ্কারগুলি স্থানান্তরিত করা হয়।

মার্কিন বাজেট ডাইরেক্টারের মতে, বর্তমান যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইজরায়েলকে ত্বড়িত সামরিক সাহায্যদানের অঙ্ক হবে পাঁচশ থেকে সাতশ মিলিঅন ডলার। মার্কিন প্রতিনিধিসভা ইজরায়েলের জন্য দুইশত কুড়ি কোটি ডলার মূল্যের জরুরী সামরিক সাহায্য বিল অনুমোদন করে।

ইজরায়েলের অর্থমন্ত্রী পিনহাস সাপির জানান যুদ্ধের প্রথম সাতদিনে ইজরায়েলের প্রায় এক হাজার তিনশত চৌদ্দ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তিনি জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদি সম্প্রদায় যুদ্ধের ব্যয়ভারের একটি বড় অংশ বহন করে। তারা এই যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত জিনিসপত্র পুনর্নির্মাণে প্রায় একশ কোটি ডলার দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। সরকার যুদ্ধ চালাবার খরচ বাবদ বাধ্যতামূলক করের সঙ্গে

ঋণ হিসাবে তেইশ কোটি আশি লক্ষ ডলার আদায় করেন। তাছাড়া সতের কোটি আশি লক্ষ ডলারের একটি প্রতিরক্ষা বাজেট তৈরী হয়। অবিলম্বে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, য়ুরোপ, দক্ষিণ আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডার ইহুদি সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান।

অক্টোবরের যুদ্ধের অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করবার জন্য বিগত বছরের দ্বিগুণ ১৯৭৪-৭৫ বাজেট ইজরায়েল সরকার অনুমোদন করেছেন। এর পরিমাণ হল ছত্রিশ মিলিঅন ইজরায়েলী পাউণ্ড (পঁচাশি হাজার ছয়শত মিলিঅন ডলার)। প্রতিরক্ষা বাজেটে যুদ্ধে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বিমান বাহিনী ও সাঁজোয়া বাহিনী পুনর্গঠনে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এটা ইজ-রায়েলের বৃহত্তম প্রতিরক্ষা বাজেট। প্রতিরক্ষা রপ্তানী ক্ষেত্রে গত বছর ব্যয় হয় ১.৫ বিলিঅন ডলার, বর্তমান বছর ব্যয় হবে দুই বিলিঅন ডলার।

কর খাতে ঋণবাবদ উপরোক্ত অর্থ সবটাই ইজরায়েলীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে, তাদের আয়করের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধনের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে তাদের লাভের নয় শতাংশ দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঋণবাবদ ইজরায়েলী সরকার যা নেবেন, তা পনের বছরে শতকরা তিন টাকা সুদে শোধ করবেন।

সরকারী পরিসংখ্যাণ অধিকর্তা মোশে সিকরন জানিয়েছেন খাদ্যদ্রব্য ও আসবাবপত্র মূল্য, বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ায় এক বছরের মধ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ছাব্বিশ ভাগ। পেট্রোলের দাম বেড়ে গেছে মাত্রাতিরিক্ত। মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক কমিটির হিসাব থেকে বর্তমান মূল্য দেওয়া হল। পুরোন দাম বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ হল:

পেট্রোল ৯৪ অকটেন—১'৭০ প্রতি লিটার (১.১৪ ইঃপাঃ) ৪৯'১
পেট্রোল ৮৩ ,, —১'৪০ ইঃপাঃ ,, (৯৪ অগোরা), ৪৫·৮
জ্বালানী তেল —৫২ অগোরা (৩৬ অগোরা), ৪৪'৪
কেরোসিন —৭০ অগোরা (৫০ অগোরা), ৪০
বিশেষ ভারী জ্বালানী তেল—২১০ ইঃপাঃ প্রতি টন (১০৫ ইঃপাঃ); ১০০

শিল্প উপযোগী জ্বালানী তেল—২২০ ইঃপাঃ (১১৫ ইঃপাঃ) ; ৯১'৩
রান্নার গ্যাস—১৮ ইঃপাঃ প্রতি ১২ কিঃ গ্রাঃ সিলিণ্ডার
(১২'১৫ ইঃপাঃ) ; ৫০

অর্থমন্ত্রী পিনহাস সাপিরের মন্তব্য থেকে জানা যাচ্ছে বছরে ব্যবহৃত আট মিলিয়ন তেল কিনতে ব্যয় হত ৮০ মিলিয়ন ডলার—এখন সেখানে দাম দিতে হবে ৮০০ মিলিয়ন ডলার ; দু লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন চিনি কিনতে প্রতি টনে আশি ডলারের পরিবর্তে দুইশত চল্লিশ ডলার খরচ পড়বে ; আমদানী করা খাদ্য দ্রব্যের টন প্রতি পঞ্চাশ ডলারের জায়গায় পড়বে একশত কুড়ি ডলার।

পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য থেকে সম্প্রতি দামের উর্ধগতি পাওয়া যাচ্ছে :

বিষয়	দাম বৃদ্ধির হার
বাড়ীভাড়া	৪২
আসবাবপত্র	৩০
খাদ্য	২৮
গৃহস্থালী দ্রব্য	২৪
শিক্ষা	২০
পোশাক	১৯
স্বাস্থ্য সম্পর্কিত	১৮
যানবাহন, ডাক	১৭

খাদ্যদ্রব্যের পুরোন ও নতুন দাম

বিষয়	পুরোন দাম	নতুন দাম
রুটি (স্ট্যাণ্ডার্ড) ৭৫০ গ্রাঃ	৩২ অগোরা	৫০ অগোরা
রুটি (সাদা) ৭৫০ গ্রাঃ	৩৫	৫৫
রোল প্রতিটি	৯	১৩
হাল্লা ৫০০ গ্রাঃ	৪০	৬০
দুধ, লিটার	৬৪	১ ইঃ পাঃ
রান্নার তেল ৫৮০ গ্রাঃ	৭১	১·০৫ ইঃপাঃ
চিনি, কিলো	১·১৪ ইঃ পাঃ	২ ইঃ পাঃ
চাল, কিলো	৩ ইঃ পাঃ	৩·৯০ ইঃ পাঃ
পোনা মাছ, কিলো	৩·৫০ ইঃ পাঃ	৫ ৬০ ইঃ পাঃ
মারগারিণ, ২০০ গ্রাঃ	৩২	৪৭
লেবেন ১৭০ গ্রাঃ	২০	৩০
লেবেনিয়া ১৭০ গ্রাঃ	২২	৩৫
ময়দা, কিলো	৬২-৬৬	১·২৫ ইঃ পাঃ
ডিম, প্রতিটি	১৬	২৬
মাখন ১০০ গ্রাঃ	৮০	১·২০ ইঃ পাঃ
সাদা চীজ, বেশী চর্বি,২৫০গ্রাঃ	৫০	৮০
সাদা চীজ, কম চর্বি ২৫০ গ্রাঃ	৪৪	৭৫

এবারের যুদ্ধ জেনারেল শারনের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। তিনি আজ একজন সমর নায়কই নন, পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধি। তার সামরিক সাফল্যের জন্য এবং বিপুল জনপ্রিয়তায় তিনি আজ অনেকেরই ঈর্ষার কেন্দ্র। সুয়েজ খালের পশ্চিম তীরে সাফল্যজনক অভিযানের পুরো কৃতিত্বই মেজর জেনারেল শারনের। এই ভদ্রলোক যুদ্ধবিরতিতে হতাশাগ্রস্ত। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশ তাকে মেনে নিতে হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর সংগে এক সাক্ষাৎকারে

জেনারেল শারন তার সংগে উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবের অভিযোগ এনেছেন। তিনি অপরোক্ষভাবে দক্ষিণ রণাঙ্গণের অধিনায়ক মেজর জেনারেল গোনেন, বাণিজ্যমন্ত্রী মেজর জেনারেল হাইম বারলেভ এবং আংশিক ভাবে চীফ অফ স্টাফ লেফটন্যাণ্ড জেনারেল ডেভিড এলাজারকেই অভিযুক্ত করেছেন।

পদ মর্যাদার দিক থেকে মেজর জেনারেল গোনেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত ছিলেন তাঁর অধস্তন অধিনায়ক। জেনারেল শারনের অন্যতম রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন রিজার্ভ বাহিনীর জেনারেল বারলেভ। বর্তমান যুদ্ধে জেনারেল বারলেভকেও ডাকা হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ এলাজার সেনাবাহিনীর অফিসারদের পক্ষপাতমূলক ও এক পেশে সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য ভৎর্সনা করেছেন। এই ভৎর্সনার লক্ষ্য অবশ্য জেনারেল শারন। জেনারেল বারলেভও একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, যা নিয়ে প্রচণ্ড ঝড় উঠেছে ইজরায়েলে।

লেবার পার্টির সভায় দাবী উঠেছে সেনানায়কদের মুখ বন্ধ করার জন্য। জেরুজালেমের একজন বিচারপতি সেনাবাহিনীর লোকদের সক্রিয় রাজনীতি অথবা নির্বাচন প্রার্থী হওয়াকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন। জেনারেল শারন এবং কায়রো সুয়েজ সড়কে মিশরীয়দের সংগে ইজরায়েলী প্রধান আলোচনাকারী জেনারেল আহারন যারিভ হলেন এর লক্ষ্য। অবশ্য এরা দুজনেই যথাসময়ে সেনাবাহিনী থেকে যথা সময়ে পদত্যাগ করলেও, যুদ্ধের সময় এদের তলব করা হয়।

কায়রো থেকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে পৌছে, একটা বিরাট দর কষাকষির সুযোগ হাতছাড়া করার জন্য শারন সরকারের কঠোর সমালোচনা করেছেন। সৈয়দ বন্দর থেকে সুয়েজ বন্দর পর্যন্ত কর্তৃত্বের অধিকার হারাল ইজরায়েল। পার্বত্য অঞ্চলে সুদৃঢ় অবস্থান থাকলে সিনাই এ মিশরীয় অনুপ্রবেশ বন্ধ করা যেত। তিনি

বলেছেন, 'মিশরীয়রা যা স্বপ্নেও ভাবেনি, সেই সুযোগ তারা পেয়ে গেল।……মিশরীয়দের কাছ থেকে আরও কিছু আদায় করতে আমাদের আরও দৃঢ় সংকল্প হওয়া উচিত ছিল। আমরা সিনাই-এর ওপর মিশরের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিয়ে এবং নিজেদের নিরাপত্তা সুনিনিশ্চিত করে একটা সার্বিক সমাধানের কাজ শুরু করতে পারতাম।' শারন সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় সরকার ও সামরিক নীতি সম্পর্কে যে তিক্ত মন্তব্য করেন, তা সামরিক কর্মকর্তাদের মনে ক্রোধের সঞ্চার করে।

ইজরায়েলে রাজনৈতিক জটিলতা যে কতখানি তীব্র হয়ে উঠেছে, তা বোঝা যায় জেনারেল শারনের মন্তব্যে : "আমরা আরবদের সংগে যুদ্ধ করেছি। এবার শুরু হবে ইহুদিদের সংগে লড়াই…।"

সেনাপসারণ চুক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন "…ভবিষ্যত যাতে এই ধরণের ভুল না হয় তা অবশ্যই আমাদের দেখতে হবে।"

অক্টোবরের যুদ্ধে মেজর জেনারেল গোনেন ছিলেন দক্ষিণ কমাণ্ডের অধ্যক্ষ। তার অধীনেই জেনারেল শারন ইয়োম কিজুর রণাঙ্গণে নেতৃত্ব দেন। শারন সুয়েজ খাল অতিক্রম করে মিশরীয় বাহিনীর ওপর পাল্টা আঘাত হানার কথা জানালে, গোনেন তাকে রিজার্ভ বাহিনীর সাহায্য না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেন। কিন্তু শারন তা অগ্রাহ্য করে, অভিযান চালিয়ে সুয়েজ খালের পশ্চিম পাড়ে বিস্তৃত অঞ্চল দখল করে মিশরীয় তৃতীয় বাহিনীর বিরাট অংশ অবরুদ্ধ করে ফেলেন।

গোনেন উর্ধতন কর্মকর্তার আদেশ অগ্রাহ্য করার জন্য শারনের নামে রিপোর্ট করে তার কোর্ট মার্শাল দাবী করেন।

কিন্তু প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর নির্দেশে শারনের কোর্ট মার্শাল হয়নি।

পরে জানা গেছে যুদ্ধের সময় রণাঙ্গণ থেকে শারণ লিকুদ নেতাদের অনুরোধ জানান, জেনারেল দায়ানের বিরুদ্ধে যেন কোন সমালোচনা না করা হয়।

আগেও একবার শারন চীফ অফ স্টাফের নির্দেশ অমান্য করে-ছিলেন। ১৯৫৬ খৃঃ যুদ্ধের সময় শারন ছিলেন একটি ছত্রী ইউনিটের কমাণ্ডার। আর চীফ অফ স্টাফ ছিলেন মোশে দায়ান। শারন গিরিপথের পূর্ব দিকে নাখাল অভিযানের অনুমতি চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। নির্দেশ অগ্রাহ্য করে শারণ ছত্রী সৈন্য নামিয়ে দেন। মিশরীয়দের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে ছত্রিশ জন ইজরায়েলী ছত্রী সৈন্য নিহত এবং এবং একশ কুড়ি জন আহত হয়।

মোশে দায়ানের 'সিনাই ডায়েরি'-তে এই ঘটনার উল্লেখ করা হলেও শারনের নামোল্লেখ নেই।

অক্টোবরের প্রাথমিক বিপর্যয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ানকে অভিযুক্ত করে ইজরায়েলে ব্যাপক প্রচার চলতে থাকে। যুদ্ধ পরিচালনা নিয়ে দায়ানের সমালোচনা করার জন্য বিচারমন্ত্রী ওয়াই শারিপো পদত্যাগে বাধ্য হন। তিনি অবশ্য ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা এবং শ্রমিক দলের প্রভাবশালী সদস্য। তিনি দায়ানের বিরুদ্ধে দায়িত্ব পালনে গাফিলতির অভিযোগ এনেছিলেন।

সৈন্য বাহিনীর প্রায় পাঁচ হাজার সেনাবাহিনীর লোক প্রতিরক্ষা-মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে প্রধানমন্ত্রী গোলডা মেয়ারের বাস ভবনের বাইরে বিক্ষোভ জানান। অক্টোবরের যুদ্ধে বিপর্যয়ের জন্য তারা দায়ানকে দায়ী করে। ক্ষমতাসীন শরিক দলের অন্যতম মাপামও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবী করে। নতুন মন্ত্রিসভায় দায়ান নেই।

এমন কি, একজন জেনারেল এককভাবে প্রধানমন্ত্রী গোলডা-মেয়ারের আফিসে গিয়ে প্রতিবাদ জানান।

ইজরায়েলে মোট ভোটার সংখ্যা বিশ লক্ষ। এর দু লক্ষ সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এবারের নির্বাচনে তারা ভোট দিয়েছে বিভিন্ন ক্যাম্পে বা সীমান্ত থেকে। ছোট্ট দেশের এই সামান্য নির্বা-চনের ফল বেরোতে সময় লাগে পাঁচ দিন। পয়লা জানুআরি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ফলাফল প্রকাশিত হয় ছয় জানুআরি।

ফলাফল প্রকাশে এই বিলম্বের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ভোটপত্রগুলি নিয়ে আসতে অনেক বিলম্ব ঘটে। তাছাড়া ইজরায়েলের নির্বাচন পদ্ধতিও বেশ জটিল। একটি কেন্দ্র থেকে একাধিক প্রার্থী নির্বাচিত হন। ভোটের হিসাব হয় আনুপাতিক ভিত্তিতে। যে দল বা জোট যত ভোট পাবে সেই অনুপাতে তারা আসন পাবে পার্লামেন্টে।

গত ছাব্বিশ বছর ধরে মাপাই বা লেবার পার্টি কখনও একা আবার কখনও কোয়ালিশন সরকার গঠন করে দেশ শাসন করছে। লেবার পার্টির কর্তা গোল্ডা মেয়ার। এদের সঙ্গে আছে আবদুল হেভোডা, রাফি। এদের অন্যতম শরিক বামপন্থী মাপাম।

বর্তমান নির্বাচনের আগে ইজরায়েলে লেবার পার্টি ও ন্যাশানাল রিলিজিয়াম পার্টির কোয়ালিশন সরকার ছিল। নেসেতে লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা ছিল সাতান্ন এবং ন্যাশানাল রিলিজিয়ান পার্টির ছিল এগার। বর্তমান নির্বাচনে লেবার পার্টির সদস্য সংখ্যা একান্ন এবং রিলিজিয়াম পার্টির দশ হয়েছে।

এবারে কয়েকটি বামপন্থী দলের জোট লিকুদ গোল্ডামেয়ারের জোটকে বেশ বিপদাপন্ন করে তোলে। লিকুদের সদস্য সংখ্যা একত্রিশ থেকে বেড়ে গিয়ে হয়েছে উনচল্লিশ।

দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশায় জনগণ শ্রমিক দলের ওপর বীতশ্রদ্ধ। দেশের তরুণরা এই দলের অতি বৃদ্ধ নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাহীন। অকটোবরে ইজরায়েলী বাহিনীর বিপর্যয়ে জনগণ গোল্ডামেয়ার সরকারের ওপর সম্পূর্ণ বিরূপ। রণক্ষেত্রের মত, নির্বাচনেও গোল্ডামেয়ার সরকার মুখরক্ষা করেছে কোনক্রমে।

গোল্ডামেয়ার সরকারের ওপর চটে থাকলেও, জনগণ খুবই চিন্তা করে ভোট দিয়েছে। সরকার বদল ঘটিয়ে নতুন দলের হাতে তারা দেশের কর্তৃত্ব ভার তুলে দেয়নি। তাছাড়া এবারের নির্বাচন আসরে

একদা সন্ত্রাসবাদী নায়ক মেনাহেম বেগিন বেশ গরম হাওয়া সৃষ্টি করেন।

সরকারী জোটে থাকলেও ন্যাশনাল রিলিজিয়াস পার্টি আরবদের কোন সুযোগ সুবিধা দিতে চায় না। বরং প্রচণ্ড বিরোধিতা করছে। জেনেভা শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার ব্যাপারে হয়ত, এদের প্রতিকূলতায় অদূর ভবিষ্যতে ইজরায়েলে আর একটি নির্বাচনের সম্ভাবনা।

ইজরায়েলে জনতার রায় পৌর নির্বাচনে কিন্তু সম্পূর্ণ শ্রমিক জোটের বিরুদ্ধে গেছে। শ্রমিক জোটকে লিকুদ প্রচণ্ড মার দিয়েছে। তেল আভিভ ও জেরুজালেমে সরকারী দল হয়েছে লিকুদ।

	ভোট	আসন লাভ	আসন লাভ
লেবার-নাপাম জোট	৬২১,১৮৩	৫১	৫৭
ন্যাশনাল রিলিজিয়াস	১৩০,৩৪৯	১০	১১
আগুদা-পোয়েলো আগুদা	৬০,০১২	৫	৬
নিউ কমিনিস্টস্ (রাক্‌খা)	৫৩,৩৫৩	৪	৩
ব্ল্যাক প্যানথারস্ (কোহেন)	১৩,৩৩২	—	১
লিকুদ	৪৭৩,৩০৯	৩৯	৩১
কোঅপ-অ্যাণ্ড ব্রাদারহুড (আরব)	৯,৯৪৯	—	১
জিউস ডিফেন্স লীগ	১২,৮১১	—	—
নির্দলীয় লিবারাল	৫৬,৫৬০	৪	৪
সোস্যাল ইকুয়ালিটি (শাকি)	১০,২০২	—	১
পপুলার মুভমেণ্ট (হাসিন)	১,১০১	—	—
বেদুইন অ্যাণ্ড ভিলেজার্স আরব	১৬,৪০৮	১	—
আভা	৪,৪৩৩	—	—
ইজরায়েল আরব লিস্ট	৩,২৬৯	—	—

প্যানথারস্ ব্লু-হোয়াইট(মালকা)	৫,৯৪৫	—	—
মোকেদ-মাকি	২২,১৪৭	১	১
প্রোগ. অ্যাণ্ড ডেভোলাপমেণ্ট	২২৬০৪	২	২
ইয়েমেনাইট লিস্ট	৩,১৯৫	—	—
রেভলিউশনারি সোস্যালিস্ট	১,২০১	—	—
সিটিজেন্স রাইটস্ (অ্যালোনি)	৩৫,০২৩	৩	—
মেরি (অভনেরি)	১০,৪৬৯	—	১

মোট ভোটার সংখ্যা ২,০৩৭,৪৭৮। ভোটদানের সংখ্যা ১,৬০১,০৯৮। বাতিল ব্যালট ৬৪,২৪৩।

ইজরায়েলে এবারই সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু সরকার গঠিত হয়েছে। গোল্ডামেয়ারের এই নতুন সরকারে তার নিজস্ব লেবার পার্টি (৫১) নির্দলীয় লিবারেল পার্টি (৪) এবং তিনজন আরব ডেপুটি আছে। প্রধানমন্ত্রী মেয়ার কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রেখেছেন। তাঁর আশা ন্যাশনাল রিলিজিয়াস পার্টি সরকারে যোগ দেবে। কিন্তু এই সংখ্যা-লঘু সরকার অক্টোবর যুদ্ধ উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে আলোচনা চালাতে পারবে কিনা সন্দেহ।

বর্তমানে ইজরায়েলে তিনটি রাজনৈতিক মতাদর্শের স্রোত বয়ে চলেছে আরবদের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে। এগুলি হল বুবারইজম, গুরিয়নইজম এবং ওয়াইজমানইজিম। দার্শনিক বুবারের মতাদর্শে বিশ্বাসীরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অবিচারের অবসানের ভিত্তিতে আরবদের সঙ্গে মিটমাটের পক্ষপাতী। বেনগুরিয়ানের মতাদর্শে বিশ্বাসীরা আরবদের একখণ্ড জমি দিতে চান না। ওয়াইজ-মান মনে করেন যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যার অনুরূপভাবেই ইজরায়েল সমস্যার মিটমাট হবে। এ জন্য সময় লাগবে অনেক। আরব/বিরোধী প্রচারে তিনি অনিচ্ছুক। বেন গুরিয়নের মতবাদই ইজরায়েলে সব থেকে বেশী সমাদৃত।

বাণিজ্যমন্ত্রী পিনহাস সাপির আরবদের অল্প জমি দখলে রাখা এবং পুরোন সীমান্তে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতি। গোল্ডামেয়ারের সমর্থন রয়েছে এদের ওপর। শিক্ষামন্ত্রী ইয়াগল অ্যালন পুরোন জেরুজালেম এবং জর্ডান সমভূমির গুরুত্বপূর্ণ সামরিক এলাকা দখলে রেখে অধিকৃত সমস্ত আরব অঞ্চল ছেড়ে দেওয়ার পক্ষপাতী। অ্যালনের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান নীল নদের পশ্চিম পাড় পর্যন্ত আধা উপনিবেশিক শাসন প্রবর্তন করতে চান। অধিকাংশ ইজরায়েলী নেতার অভিমত হল অধিকৃত অঞ্চলে বসবাসকারী আরবদের নাগরিকত্ব দান ছাড়া অধিকৃত অঞ্চল ইজরায়েলের দখলে রাখ।

বর্তমান যুদ্ধের প্রেক্ষিতে আফ্রিকার বহু রাষ্ট্র ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করেছে। এদের মধ্যে আছে: উগাণ্ডা, চাদ, কঙ্গো, নাইজেরিয়া মালি, বরুণ্ডি, টোগো, জাইরে, গিনি, আপার ভোল্টা, রুয়াণ্ডা, দাহোমে, কামেরুন, তানজানিয়া, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, নাইরোবি, ঘানা, সেনাগল, মালাগাছি, জাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, লাইবেরিয়া, আইভরি কোস্ট।

যুদ্ধের যাবতীয় ক্ষতিপূরণে মার্কিন সাহায্য আসছে ইজরায়েলে ব্যাপক ভাবে। মার্কিন কর্তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনে গোল্ডামেয়ার এবং মোশে দায়ানের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি আলোচনা হয়। ওয়াশিংটন থেকে ফিরে মোশে দায়ান বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আরবদের আরও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আধুনিক ধরণের অস্ত্র সরবরাহের অনুরোধে আমেরিকা যে ভাবে সাড়া দিয়েছে তাতে তারা খুশি। তিনি বলেন, সোভিয়েত অস্ত্রের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের থাকবে।

যুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি মিশরকে মোকাবিলার করবার জন্য বেশ কাহিল হতে হবে। অর্থনৈতিক সঙ্কট চূড়ান্তরূপ নেবে। চার শত কোটি পাউণ্ড বাজেটের পঞ্চাশ কোটি পাউণ্ড যুদ্ধ খাতে ব্যয় করতে

হয়েছে। এবারের যুদ্ধে বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দেবে। একশ বাইশ কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড আমদানীর বিনিময়ে রপ্তানী হবে মাত্র উনষাট কোটি ষাট লক্ষ পাউণ্ড।

মিশরের নবনিযুক্ত পরিকল্পনা মন্ত্রী ওসমান আহমদ ওসমান প্রেসিডেন্ট সাদাতের নির্দেশে সিনাই মরুভূমি উন্নয়ণে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা রচনা করেন। ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধের পর থেকে ইজরায়েল সিনাই দখল করে রেখেছে। ওসমান জানান যে সুয়েজখাল পরিষ্কার ও খুলে দেওয়া তার দফতরের প্রধান কাজ। ১৯৫৭ খৃঃ যুদ্ধের পর থেকেই সুয়েজখাল বন্ধ রয়েছে। এই পরিকল্পনায় সুয়েজ ইসমাইলিয়া বন্দর উন্নয়ন, প্রধান প্রধান সেচ প্রকল্প, খণিজ ও সম্পদ আহরণ এবং দশ লক্ষ মিশরবাসীর পুনর্বাসনের কথা বলা হয়েছে। সিনাই মরুভূমির চব্বিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা উন্নয়ন করা হবে।

মিশরের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মোহম্মদ আবদুল হাতেম বলেছেন এ বছরের শেষ দিকে সুয়েজখাল খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। মাইন, নিমজ্জিত জাহাজ উত্তোলন এবং খাল পরিষ্কারের জন্য সময় লাগবে মাত্র দুমাস। খালটি খোলা হবে তিনটি পর্যায়ে। প্রায় সাত বছর ধরে সুয়েজখাল বন্ধ রয়েছে। ইতিমধ্যে খালটি পরিষ্কার করে নৌ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

অক্টোবরের যুদ্ধের পর মিশরীয় বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ সামরিক কমাণ্ডারদের পরিবর্তন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ নিযুক্ত হয়েছেন জেনারেল মহম্মদ আবদেল ঘানি এল গামাজি। জেনারেল হাসান এল গুয়েরেডেলি চীফ অফ অপারেশনস্, জেনারেল ফুয়াদ আজিজ সেকেণ্ড আর্মির কমাণ্ডার এবং জেনারেল আমেদ বাদাকুই সৈয়দ আমেদ থার্ড আর্মির কমাণ্ডার নিযুক্ত হয়েছেন। নতুন চীফ জেনারেল গামাজি আগে চীফ অফ অপারেশন ছিলেন। তিনি মিশরীয় প্রতিনিধিদের নেতা

হিসাবে কিলোমিটার এক শত একে ইজরায়েলী জেনারেল ইয়ারিভের সঙ্গে আলোচনা চালান।

প্রেসিডেণ্ট সাদাত আরব জগতের প্রখ্যাত সাংবাদিক হাসনায়েন হেইকলকে আল আহরাম পত্রিকার সম্পাদক পদ থেকে সরিয়ে তার ব্যক্তিগত প্রেস উপদেষ্টার পদ দেন। কিন্তু মিঃ হেইকল তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। হেইকলের অপসারণের পর আল আহরামের প্যালেস্টাইন স্টাডি ইনষ্টিটিউটের প্রধান প্রেসিডেণ্ট নাসেরের জামাতা হাতেম সাদেক পদত্যাগ করেন। এই ঘটনার আগে হেইকল আল আহরামে আমেরিকার কঠোর সমালোচনা করেন। আরব তুনিয়ায় মিশরের প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করার মার্কিন প্রচেষ্টার অভিযোগ তুলে তিনি প্রেসিডেণ্ট সাদাতকেও আক্রমণ করেন। আমেরিকার লক্ষ্য সস্তায় তেল পাওয়া। সেজন্য আবু ধাবিকে দখলে চক্রান্ত করে। তিনি মিশর ইজরায়েল সৈন্যাপসারণ চুক্তির বিরোধিতা করেন। আবার এই চুক্তির ব্যাপার নিয়ে মিশরের সঙ্গে অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলি একমত হতে পারেনি।

হেইকলের নিবন্ধ বহুক্ষেত্রে আরব তুনিয়ার সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করে থাকে। হেইকলকে সরিয়ে আল আহরামের সম্পাদক করা হয়েছে সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও তথ্যমন্ত্রী আবতুল কাদের হাতেমকে। ম্যানেজিং এডিটর হয়েছেন কায়রোর আল-আখবার পত্রিকার প্রাক্তন মালিক আলী আমিন। নাসের আমেলে এর ভাই মুস্তাফা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সি-আই-এর পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির জন্য। তারপর নয় বছর আলা আমিন বিদেশে কাটান।

প্রেসিডেণ্ট সাদাত নিজস্ব অনুসৃত নীতি প্রচারের জন্য সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

এবারের যুদ্ধেও আরবদের বিরুদ্ধে ইজরায়েলী অর্থনৈতিক দমন-নীতি বেড়ে যায়। জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে ইজরায়েলী সৈন্যরা বহু হেক্টর জমির ফসল ও বনভূমি ধ্বংস করে। অধিকৃত আরব

অঞ্চলে ও ইজরায়েলের অভ্যন্তরে আরব জনগণের ওপর সম্প্রসারণ-মূলক কার্য কলাপ ও নির্যাতন চালায়। অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চারশতরও বেশী প্যালেস্টাইনী গ্রেপ্তার করা হয়। রাস্তায় বিভিন্ন চেকপোস্টে এদের নির্মমভাবে মারধোর করা হয়। আরবদের ঘর-বাড়ি উড়িয়ে দেয়। হানাদারদের মত হল এরা প্যালেস্টাইন মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে জড়িত। ইজরায়েল সৈন্যরা প্যালেস্টাইনীদের বাড়ীতে ঢুকে ভেঙে-চুরে আগুন ধরিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায়।

ইজরায়েলী সামরিক কর্তৃপক্ষ ত্রাসের রাজত্ব শুরু করে। গাজা এলাকার আরব মহল্লাতে বসবাস প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। সেখানে পাইকারী হারে আরবদের গ্রেপ্তার এবং যাযাবর আরব উপজাতিদের চলাচলের স্বাধীনতার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ হয়।

প্যালেস্টাইনী গেরিলা সংগঠনগুলির গুপ্তকার্যক্রমও ব্যাপকরূপ নিতে থাকে। তাদের হামলায় গ্যালিলি এলাকায় দুটি ইজরায়েলী সামরিক যান ধ্বংস এবং পনের জন সৈন্য হতাহত হয়। জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে নবুলাস শহরে হাতবোমা নিক্ষেপে আটজন আহত হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন নবুলাসের ইজরায়েলী গভর্নর।

জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে আরকাবা গ্রামের কাছে প্যালেস্টাইন গেরিলাদের মোকাবিলায় ইজরায়েলীরা বিমান, ভারী কামান ও ছত্রী সৈন্য নিয়োগ করে! ১৯৫০ খৃঃ গ্রীষ্মের পর এই প্রথম প্যালে-স্টাইনী বাহিনী জর্ডান নদীর পশ্চিমতীরে ইজরায়েলীদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

এবারের যুদ্ধে আরবরা তাৎপর্যপূর্ণভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে। সিরিয়বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য মরক্কো সিরিয়ায় সৈন্য পাঠায়। সুদান এবং উত্তর ইয়েমেনও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিশর ও সিরিয়াকে সাহায্য পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দেয়। ইরাক, লিবিয়া এবং লেবাননও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে মিশর ও সিরিয়াকে সাহায্যের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। কুয়ায়েতের সৈন্যবাহিনী সুয়েজখাল

এলাকায় যুদ্ধে অংশ নেয়। তাছাড়া কুয়ায়েত সিরিয়া এবং মিশরের হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসক এবং ওষুধপত্রের সরবরাহ পাঠায়। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় কুয়ায়েতের হাসপাতালে। এক সরকারী ঘোষণায় আলজেরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, তার সমস্ত সমর শক্তি বিন্যাসের ভার আরব ফ্রন্টের হাতে তুলে দেবে। ইরাক, জর্ডান, মরোক্কো, সৌদি আরব ও কুয়ায়েত সেনা-বাহিনী সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দেয়। ইরাকী সৈন্যরা গোলান মালভূমিতে যুদ্ধে অংশ নেয়। ইরাক বিমান ছাড়াও আঠার হাজার সৈন্য এবং একশত ট্যাঙ্ক পাঠায়।

পাঁচটি তেলসমৃদ্ধ আরব রাষ্ট্র ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিশরকে ষাট কোটি মার্কিন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই পাঁচটি দেশ হল সৌদি আরব, লিবিয়া, কুয়ায়েত, কোয়েতার এবং আবু ধাবি। কুয়ায়েত মিশর ও সিরিয়াকে দশ কোটি দিনার (প্রায় পঁয়ত্রিশ কোটি ডলার) অর্থনৈতিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করে।

আরবের তৈল রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ যারা ইজরায়েলকে সাহায্য করে তাদের ক্ষেত্রে তেল সরবরাহ বন্ধ করে। ছটি প্রধান তৈল উৎপাদনকারী দেশ ইরাক, ইরান, কুয়ায়েত, সৌদি আরব, আবু ধাবি ও কাতার অপরিশোধিত তেলের দাম শতকরা সত্তের ভাগ বাড়িয়ে দেয়।

কায়রোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে আরব অর্থনৈতিক পরিষদ বিদেশী ব্যাঙ্ক থেকে আরব পুঁজিপতি প্রত্যাহার করে তা আরব অর্থ প্রতি-ষ্ঠানগুলিতে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। এই বৈঠকে আফ্রিকার শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি আফ্রো-এশীয় ব্যাংক গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিবর্তিত পরিস্থিতি সত্বেও জর্ডান সরকার প্যালেস্টাইনী গেরিলাদের দেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দানে অস্বী-কৃতি জানায়। গেরিলারা জর্ডানে ফিরে যাওয়ার জন্য আবেদন

জানিয়েছিল। ১৯৫১ খৃঃ জর্ডান বাহিনী তাদের বিতাড়িত করে। বাদশাহ হোসেন ক্ষমা ঘোষণা করায় গেরিলা নেতা আবু দাউদ ও সালাহ রাফাত জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। জর্ডান নদীর পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসে বাদশাহ হোসেন নানান জটিলতার সৃষ্টি করেন। অক্টোবরের যুদ্ধের সময় জর্ডান ভূখণ্ডে ইরাকী সৈন্য প্রবেশের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানান। যুদ্ধে শেষদিকে সিরিয়া ফ্রণ্টে কিছু সাহায্যকারী সেনা পাঠালেও, জর্ডান ইজরায়েল সীমান্তে কোন ঘটনাই ঘটে নি। অথচ সাতষট্টির যুদ্ধের জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরের সব থেকে উর্বর অঞ্চল ইজরায়েল দখল করে নেয়। বাদশাহ হোসেনের ওপর ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার একটি চাপ জনগণের মধ্য থেকে প্রবল হয়ে ওঠে। তাদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্যই হোসেন একটি লোক দেখানো সেনা বাহিনী পাঠান সিরিয়ায়।

দক্ষিণ ইয়েমেন লোহিত সাগরে ইজরায়েলী জাহাজ চলাচল অবরোধে মিশরকে সহযোগতা করে। দক্ষিণ ইয়েমেনের প্রগতিশীল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইরান, ইজরায়েল, মার্কিন সেনাদের সঙ্গে সৌদি আরব বাহিনী, বিমানবাহিনীর সাহায্য পুষ্ট সব মিলিয়ে ত্রিশ হাজার সৈন্য দক্ষিণ ইয়েমেনের ছুটি দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলার দিকে সৌদি আরব সীমান্তে অবস্থান করতে থাকে।

ইতালি এবং সুইজারল্যাণ্ডের পত্রপত্রিকার উল্লেখ করা হয়, লিবিয়া আমেরিকার কাছে তেল বিক্রি করেছে। লিবিয়ার বেনগাজি বন্দর থেকে ষষ্ঠ নৌবহরের জন্য জ্বালানী সংগ্রহ করা হয়। লণ্ডনের টাইম পত্রিকায় জানুআরির চার তারিখে বলা হয় তৈল নিষেধাজ্ঞার পর আমেরিকা লিবিয়ার তেল পায়। আরব তৈলরপ্তানীকারক দেশগুলির সূত্র থেকে লিবিয়ার আল হায়াত জানায় প্রতিদিন আমেরিকায় প্রায় সাত লক্ষ ব্যারেল তেল গেছে। অক্টোবরের সতের থেকে ডিসেম্বরের একত্রিশ তারিখের মধ্যে রপ্তানি করা এই

তেলের ষাট থেকে নব্বই ভাগই হল লিবিয়ার তেল। তেল রপ্তানি-কারক আরব দেশগুলি এই তেল বিক্রি বন্ধের জন্য লিবিয়ার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

যুদ্ধের সময় সৌদি আরবের বাদশাহ ফয়জল লোক দেখানো একদল সৈন্য পাঠিয়েছিলেন সিরিয়ার সাহায্যে। জর্ডানের বাদশাহ হোসেনও সাত হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তার দেশের সঙ্গে ইজরায়েয়ের তিনশ মাইল ব্যাপী সীমান্তে খুবই চাতুর্যের সঙ্গে শান্তি বজায় রেখেছিলেন!

অকটোবরের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ বিরতির পর জার্ডানী সেনাবাহিনীর দেশপ্রেমিক অফিসারদের 'আন্দোলন' নামক গুপ্ত সংস্থা একটি বৈঠকে মিলিত হন। গোপন বৈঠকে যোগদানকারী অফিসাররা ইজরায়েলের বিরুদ্ধে জর্ডানের তৃতীয় ফ্রন্ট খোলার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের আলোকে আলাপ আলোচনা করেন। তারা পরে চার দফা দাবীপত্র পেশ করেন বাদশাহ হোসেন এবং সেনাবাহিীর হাই-কমাণ্ডের কাছে। তাদের দাবীপত্রে আটক অফিসারদের মুক্তিদান, ইজরায়েলের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ, জর্ডান-ইজরায়েলী সীমান্তে একটি পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্ট খোলা, এই ফ্রন্টে আরব পক্ষকে ব্যবহারের সুযোগদান ও জর্ডান ভূখণ্ডে প্রবেশের অনুমতিদানের সুপারিশ করা হয়।

তারপরই অবশ্য সেনাবাহিনীর বাইশজন অফিসারকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফেব্রুআরি মাসের প্রথম সপ্তাহে জর্ডানে সামরিক বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঘটে। সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট রাজধানী আম্মান থেকে পনের মাইল দূরে জারকায় বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ স্থায়ী ছিল তিনদিন। বাদশাহ হোসেন তখন ব্রিটেন সফররত। বিদ্রোহীরা রাজপ্রাসাদ, সেনাবাহিনীর সদর দপ্তর, বেতার কেন্দ্র অবরোধ করে রাখে। তারা জাঈদ আল রিফাই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে, সামরিক

সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানায়। জর্ডান সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ এবং বাদশাহ হোসের এক ভাইকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার, সৈন্যদের বেতনবৃদ্ধি, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী রকেট ও সোভিয়েত ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য দাবী করে। জর্ডান বাহিনীর চল্লিশতম ব্রিগেডের কমাণ্ডার মেজর জেনারেল খালেদ আল হেজাজ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন।

ওয়াশিংটন সফর বাতিল করে বাদশাহ হোসেন দেশে ফিরে আসেন। আভ্যন্তরীণ অশান্তি তাঁকে বিব্রত করে তোলে। সেইসঙ্গে আসে জর্ডান নদীর তীর থেকে সৈন্যাপসারণের ইজরায়েলী প্রস্তাব। কিন্তু হোসেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ, প্রস্তাবে ১৯৬৭ খৃঃ যুদ্ধের সময় ইজরায়েলের দখল করা নদীর পশ্চিম তীর থেকে সৈন্য সরাবার কথা নেই। জাতীয় পরিষদে ভাষণ দান কালে বাদশাহ হোসেন জানান, সকল প্যালেস্টাইনী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করতে তিনি প্রস্তুত। তাছাড়া জর্ডানী সেনাবাহিনীকে অস্ত্রে সুসজ্জিত করার একশত পঁচাত্তর কোটি ডলারের এক ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া হয়। কর্মসূচী অনুসারে চার বছরের মধ্যে সেনাবাহিনীকে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, যুদ্ধবিমান এবং রাডার স্টেশনসমূহ আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করা হবে।

অকটোবর যুদ্ধের পর থেকে জর্ডানের সমবখাতে সৌদি আরব বছরে এককোটি চল্লিশ লক্ষ দিনার সাহায্য দিয়ে আসছে। কিন্তু সামরিক বিদ্রোহের ব্যাপারে বাদশাহ ফয়জল মনে করেন যে, সেই সাহায্য যথাযথ ব্যবহৃত হচ্ছে না।

ব্রিটিশ পেট্রোলিআম এবং আমেরিকান গালফ অয়েল কোম্পানীর যৌথ মালিকাধীনে কুয়ায়েতের সর্ব বৃহৎ তেল কোম্পানী রাষ্ট্রীয়করণের সিদ্ধান্ত নেয় কুয়ায়েত সরকার। এই কোম্পানি দেশের মোট তেল উৎপাদনের শতকরা পঁচানব্বই ভাগই নিষ্কাষণ করে। অধিগ্রহণের শর্ত হিসাবে কোম্পানীর ষাট ভাগ শেয়ার কুয়ায়েত সরকার নেবেন। ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে চল্লিশকোটি

ডলারের মত। অধিগ্রহণের ব্যবস্থা চলবে ধাপে ধাপে। প্রতিবছর সরকার সাত ভাগ করে শেয়ার কিনে নেবেন।

যুদ্ধ বিরতির পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স আরব দুনিয়ায় অস্ত্র সরবরাহে আরোপিত নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। কারণ দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ অক্ষুণ্ণ রাখতে তাদের আরব তেল খুবই জরুরী হয়ে ওঠে। আর আরবদের অস্ত্রের প্রয়োজন আত্মরক্ষার জন্য। সুতরাং কমিউনিস্ট বিদ্বেষী আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের অপেক্ষা ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সাহায্য গ্রহণ নীতিগত বিবেচিত হয়।

কুয়ায়েতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শেখ সাদ আল আবদুল্লা কুয়ায়েত ও ফ্রান্সের মধ্যে এক অস্ত্র সরবরাহ চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। এই চুক্তিতে ষোলটি মিরেজ জেট বিক্রির কথা আছে। হেলিকপটার এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এই চুক্তির অন্তর্গত।

সৌদি আরবের সঙ্গেও ফ্রান্সের তেল বিনিময়ের ভিত্তিতে চুক্তি হয়েছে। ফরাসী মিরেজ জঙ্গী বিমান এবং এ-এম-এক্স-৩০ ট্যাঙ্ক আসছে সৌদি আরবে। সৌদি আরবে অস্ত্রনির্মাণ কারখানা এবং সৌদি আরবে সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আগামী কুড়ি বছরে ফ্রান্স সৌদি আরব থেকে আশি কোটি অপরিশোধিত তেল কিনবে তার পরিবর্তে এই সহায়তা।

আরব রাষ্ট্রগুলির এই অস্ত্রসজ্জিত হওয়ার ঘটনাতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পেণ্টাগণের ধারণা আরব দেশগুলি অদূর ভবিষ্যতে 'আরব বিমানবাহিনী' গড়ে তুলবে। এই বিমানবহরে থাকবে সর্বাধুনিক বিমান। সোভিয়েতের আধুনিকতম অস্ত্রশস্ত্র। ভবিষ্যতে আরব ইজরায়েল সংঘর্ষকালে মিশর বা অন্য আরব রাষ্ট্র এই বিমান বহরকে পাবে ধার হিসাবে।

সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে উভয়পক্ষের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে পাশ্চাত্য মহল থেকে নানারকম তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম দু সপ্তাহের যুদ্ধে ইজরায়েল পক্ষে ত্রিশ হাজার মানুষ হতাহত, তাদের নয়শত

ট্যাঙ্ক ও আড়াইশত বিমান ধ্বংস হয়। আরবদের ক্ষতি এর থেকে বেশী হলেও, জনসংখ্যা অনুপাতে ইজরায়েলের ক্ষতি মারাত্মক। অ্যাভিসল সাপ্তাহিকীর মতে আরব পক্ষে দুশত বাষট্টিটি বিমান এবং ছাব্বিশটি হেলিকপ্টার খোয়াযায়। আর ইজরায়েলের ক্ষতির পরিমাণ একশ কুড়িটি বিমান ও দুটি হেলিকপ্টার। সিরিয়ার নষ্ট একশ উনপঞ্চাশটি বিমানের বেশির ভাগই সোভিয়েত মিগ। মিশরের বিরানব্বইটি বিমান এবং কুড়িটি হেলিকপ্টার খোয়া যায়। ইজরায়েলের একশ পাঁচটি ম্যাকডোনেল স্কাই হক-৫২, সাতাশটি ম্যাকডোনেল এফ-৪ ফ্যাণ্টম বিমান, আটটি মিরেজ-১১১ এবং পাঁচটি সুপার-মিটারাস বিমান।

মার্কিন হিসাব মতে যুদ্ধে তিন হাজার ইজরায়েলী সৈন্য নিহত হয়। আহতের সংখ্যা দুই হাজার। ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয় নয় শত সত্তর, বিমান ধ্বংস হয় একশত পঞ্চাশটি। যুদ্ধে ইজরায়েলের ক্ষতির পরিমাণ আরও বেশী। বরং বলা যেতে পারে সাতষট্টি সালের তুলনায় মিশরের ক্ষতির পরিমাণ সামান্যই।

ইজরায়েল আট হাজারেরও বেশী মিশরীয় যুদ্ধবন্দীর কথা ঘোষণা করে। কিন্তু ইজরায়েলী ফ্রন্ট লাইনের পিছনে মাত্র সত্তর জন মিশরীয় সৈন্য নামিয়ে দেওয়া হয়। এই সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হল ইজরায়েল ঘেরাও করা বেসামরিক নাগরিকদের বন্দী করে যুদ্ধ বন্দী হিসাবে দেখিয়েছে।

অক্টোবরের যুদ্ধে চৌদ্দ দিনের ক্ষয়ক্ষতির এই হিসাবটি প্রকাশ করে টাইম পত্রিকা ঃ

	হতাহত	বিমান	ট্যাঙ্ক আরমারড কার
মিশর	৭,০০০	১৮২	৭৪০
সিরিয়া	৭,৩০০	১৬৫	৮৬০
ইরাক	৩৮০	২১	১২৫

	হতাহত	বিমান	ট্যাঙ্ক আরমারড কার
জর্ডান	৪০	—	—
মরক্কো	৪৯০	—	—
ইজরায়েল	৩৯০০	১২০	৮১০

মিশরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে জানান, পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধে বিশ হাজার মানুষ নিহত হয়। আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সূত্রে জানা যায় ইজরায়েলী সেনাবাহিনী সাতহাজার চারশত ছিয়ানব্বই জন মিশরীয়, তিনশত সাতাত্তর জন সিরীয়, সতের জন ইরাকী এবং ছয় জন মরক্কো সৈন্য বন্দী করে। মিশরের একশত এগার জন ইজরায়েলী যুদ্ধ বন্দীর তালিকা দেয়। সিরিয়া কোন যুদ্ধবন্দীর তালিকা দেয় নি।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান যুদ্ধে তিনটি দেশের সৈন্য ও সমরশক্তির বিবরণ নিম্নরূপ :—

ইজরায়েল—সৈন্য ৯৪৫০০। নারী পুরুষ নিয়ে ইজরায়েলী সেনাবাহিনী গঠিত। প্রয়োজনবোধ সৈন্য সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৫ হাজার বাড়ান সম্ভব। দশটি সাঁজোয়া বাহিনী, নয়টি যান্ত্রিক বাহিনী, নয়টি পদাতিক বাহিনী, পাঁচটি আধা সামরিক বাহিনী ও তিনটি গোলন্দাজ বাহিনী ইজরায়েলী সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত।

অস্ত্রশক্তি—১৭০০ মাঝারি ওজনের ট্যাঙ্কের মধ্যে ৪০০ এম—৪৮ ট্যাঙ্ক আছে। তাতে ১০৫ এম এম কামান আছে। ২৫০ বেন-গুরিয়ন (বৃটিশ সেঞ্চুরি ট্যাঙ্কের সঙ্গে ১০৫—এম এম ফরাসী কামান যুক্ত।

৬০০ সেঞ্চুরিয়ান, ২০০ শেরম্যান ও সুপার শেরম্যান ট্যাঙ্ক আছে। ৫৫০ কিলোমিটার পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী হচ্ছে তবে এখনও ব্যবহৃত হয় নি।

নৌবাহিনী—৫ হাজার নৌসেনা আছে। তিনটি সাবমেরিন (আরও তিনটি অর্ডার দেওয়া আছে) একটি ডেস্ট্রয়ার, গেব্রিয়েল

ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ১৩টি দ্রুতগামী টহলদারি নৌকা ও নয়টি টর্পেডো নৌকা ইজরায়েলী সমরশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

মিশরের সমরশক্তি—সৈন্য সংখ্যা ২ লক্ষ ৬০ হাজার। দুটি সাঁজোয়া ডিভিসন, তিনটি যান্ত্রিক ডিভিসন, দুটি পৃথক সাঁজোয়া বাহিনী, দুটি পৃথক পদাতিক বাহিনী, বিমানে প্রেরনের জন্য একটি পদাতিক বাহিনী, একটি আধা সামরিক বাহিনী, ছয়টি গোলন্দাজ বাহিনী, ও ২৬টি কমাণ্ডো ব্যাটেলিয়ন মিশরীয় সামরিক শক্তির অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া আছে ৩০টি ভারী ট্যাঙ্ক, ১৮৫০টি মাঝারি ট্যাঙ্ক, ও ৭৫টি হালকা ট্যাঙ্ক।

নৌশক্তি—১৫ হাজার নাবিক আছে। সোভিয়েত নির্মিত ১২টি সাবমেরিন, ৫টি ডেস্ট্রয়ার (৪টি সোভিয়েত নির্মিত) ৪টি প্রহরা জাহাজ, ১৩ সাবমেরিন বিধ্বংসী জাহাজ একটি করভেট ও ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ওসা ও কোমার শ্রেণীর টহলদারী নৌকা মিশরের নৌশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

সিরিয়ার অস্ত্রশক্তি—সিরিয়ার দুটি সাঁজোয়া ডিভিশন, একটি সাঁজোয়া বাহিনী তিনটি পদাতিক ডিভিশন ও একটি যান্ত্রিক বাহিনী আছে। তাছাড়া আছে সমতল থেকে শূন্যে নিক্ষেপ করার জন্য এস এ-২ এবং এস এ-৩ ক্ষেপণাস্ত্র। সোভিয়েত নির্মিত অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর পরিমাণে আছে।

সোভিয়েত নির্মিত তিনটি মাইন সুইপার, ফরাসী নির্মিত ২টি সাবমেরিন ধ্বংসী জাহাজ, ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত ওসা ও কোমার শ্রেণীর ৬টি দ্রুতগামী টহলদারী নৌকা ও এক ডজন হাল্কা ধরণের টর্পেডো নৌকাও সিরিয়ার নৌশক্তির অন্তর্ভুক্ত।

সৌদি আরবের মোট সৈন্যসংখ্যা ৪২ হাজার।

লিবিয়া সৈন্যসংখ্যা ২৫,০০০। ট্যাঙ্ক ২২১। জঙ্গী বিমান ২২।

জর্ডান সৈন্যসংখ্যা ৯০ হাজার। ট্যাঙ্ক ৩৪৪। জঙ্গী বিমান ২২।

ইরাক সৈন্যসংখ্যা ১০১,৮০০। ট্যাঙ্ক—৯২৫। জঙ্গী বিমান—১৮৯।

তিন ॥ তেলের রাজনীতি

"আরবরা যদি তেল সম্পদকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের পরই য়ুরোপ বিশেষ করে পশ্চিম য়ুরোপ এর প্রথম শিকার হবে। ইজরায়েল অন্যায় ও জোরপূর্বক আরব এলাকা দখল করে রেখেছে। ইজরায়েলের এই আগ্রাসী মনোভাবে সমর্থন দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের মত বৃহৎ শক্তি। তাই, দরকার হলে এই বিরোধ নিষ্পত্তি করতে আরবরা তাদের তেলকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবে।"—লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট মোয়ামের গাদ্দাফী।

তিয়াত্তরের অকটোবরে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত প্রচণ্ড আঘাত পায় আরবদেশগুলির তেল সরবরাহ নিষেধাজ্ঞায়। বার্ষিক প্রায় নব্বই কোটি তেল উৎপাদনকারী দশটি আরব দেশ (সৌদি আরব, কুয়ায়েত, কাতার, বাহেরিন, লিবিয়া, আলজেরিয়া, আবু ধাবি, ইরাক, সিরিয়া) ইজরায়েলকে সমর্থনকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হল্যাণ্ডকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে। ১৯৫৭ খৃঃ অধিকৃত আরব অঞ্চল ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত মাসিক পাঁচ শতাংশ তেল উৎপাদন হ্রাসের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী আরব তেল উৎপাদন কমে যায় ত্রিশ শতাংশ। ফলে তেলআভিভের পৃষ্ঠ-পোষকরা পনের কোটি টনেরও বেশী তেল ঘাটতি মেটানোর জরুরী প্রয়োজনীয়তার সম্মুখীন হয়।

সৌদি আরব পাশ্চাত্য তেল কোম্পানীগুলিকে জানিয়ে দেয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবারের যুদ্ধে ইজরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করলে তেলের উৎপাদন শতকরা দশ ভাগ কমিয়ে দেবে। তাছাড়া পরে প্রতি মাসে আরো পাঁচ ভাগ কমাতে হবে। আবু ধাবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে। তারা জানিয়ে দেয়, দরকার হলে ইজরায়েলকে সাহায্য দানকারী সবকটি দেশে আবু ধাবি তেল

সরবরাহ বন্ধ করবে। আমেরিকা ও পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশগুলি আবুধাবি থেকে তেল আমদানী করে শতকরা পনের থেকে পঁচিশ ভাগ। আবু ধাবির তেলমন্ত্রী জানান, ইজরায়েল অধিকৃত আরব ভূমি ছেড়ে না দেওয়া পর্যন্ত আবু ধাবি তেল রপ্তানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন যুদ্ধ বিরতিই যথেষ্ট নয়। যুদ্ধবিরতি কোন নিশ্চয়তা আনে না। আবুধাবি, কাতার, আলজেরিয়া এবং কুয়ায়েত নেদারল্যাণ্ডকে তেল সরবরাহ বন্ধ করে। কাতারের বার্ষিক তেল উৎপাদনের এক তৃতীয়াংশ তেল হল্যাণ্ডে রপ্তানী করা হয়। ইজরায়েলের মিত্র দেশগুলিতে আরবদের তেল পুনঃ রপ্তানী বন্ধের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হয়।

আরব তেল বিশেষজ্ঞদের ধারণা আরব বিশ্বে বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ সৌদি আরব কয়েক মাস নয়, বছরের পর বছর ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল সরবরাহ বন্ধ রাখতে পারে। একজন তেল কর্মকর্তা বলেছেন ফয়জলের দীর্ঘ দিনের বন্ধু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত তাকে অনেক কিছুর বিনিময়েই গ্রহণ করতে হয়েছে। কিন্তু একবার তিনি যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হওয়া পর্যন্ত তিনি আর সিদ্ধান্ত বদলাবেন না।

বাদশাহ ফয়জল বারবার বলেছেন মককা ও মদিনার পর মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্র নগরী জেরুজালেম কোন অবস্থাতেই ইহুদিদের কর্তৃত্বে থাকতে পারে না। চাই জেরুজালেমকে ঐতিহ্য-মণ্ডিত আরব শহর হিসাবে স্বীকৃতি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং হল্যাণ্ড ছাড়াও কানাডা, বাহামা, ত্রিনিদাদ, নেদারল্যাণ্ড, এনটিলিস, পোর্টেরিকো, গুয়াম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সৌদি আরবের তেল বন্ধ হয়ে যায়। সৌদি আরব জাপানকে জানিয়ে দেয় আরব দেশগুলি থেকে তেল সরবরাহ পেতে হলে জাপানকে অবশ্যই ইজরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। কায়রোয় সৌদি আরবের মন্ত্রী ইয়েমানি বলেন, যুদ্ধে তেল

অস্ত্রের কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৭ খৃঃ শত্রুবাহিনী যে সব ভূমি দখল করেছে, তা থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা এই অস্ত্র ব্যবহার করব, এটাই আমাদের পরিকল্পনা।

দৈনিক দশ লক্ষ ব্যারেলেরও বেশী তেল উৎপাদনকারী সৌদি আরব এবং কুয়ায়েত মিশর ইজরায়েল যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও তাদের মূল দাবীতে অটল থাকার সংকল্প ঘোষণা করে। সৌদি আরব থেকে বলা হয়, সৌদি আরবের দাবীর রদবদল ঘটেনি। অধিকৃত আরব অঞ্চল ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার এবং প্যালেস্টাইনী জনগণের ন্যায্য অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে।

আরব রাষ্ট্রগুলির তেল দপ্তরের মন্ত্রিরা মিলিত হয়ে ছটি আরব রাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেলের দাম শতকরা সতেরভাগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে পাশ্চাত্যের তেল কোম্পানীগুলিকে তেলের জন্য আরবদের তিনভাগের দুভাগ দাম বেশী দিতে হবে। ইরাক অকটোবরের শেষে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম বাড়িয়ে ৭'১১৩ ডলার করে। তেল উৎপাদনকারী ছয়টি উপসাগরীয় রাষ্ট্রও তাদের তেলের দাম শতকরা সতের ভাগ বাড়ায়। দেশগুলি হল—ইরান, ইরাক, কুয়ায়েত, কাতার, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমীর শাসিত রাষ্ট্রগোষ্ঠী। ডলারের মূল্যমান হ্রাসের প্রেক্ষিতে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্যই এবারের এই মূল্যবৃদ্ধি।

অপরিশোধিত তেলের দাম ৫'১১ ডলার থেকে ১১৬০ ডলার স্থির হয়। ফলে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি তাদের প্রতি ব্যারেল তেল থেকে সাত ডলার রাজস্ব লাভ করবে। পারস্য উপসাগরীয় ছয়টি দেশ অকমিউনিস্ট বিশ্বের মোট উৎপাদিত তেলের শতকরা তেতাল্লিশ ভাগেরও বেশী উৎপাদন করে। অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ার ফলে সৌদি আরবের তেল রপ্তানী বাবদ আয় বছরে সাতশ কোটি ডলার থেকে বেড়ে দুই হাজার কোটি ডলার দাঁড়াবে। ইরান সরকারও পাঁচটি পাশ্চাত্য তেল কোম্পানির সঙ্গে সাক্ষরিত চুক্তির

অধীনে তেল বিক্রয় বাবদ আয় প্রায় সাড়ে তিনগুণ বাড়িয়ে দেয়। এই সব চুক্তিতে তেলের রেকর্ড পরিমাণ দাম নির্ধারিত হয়।

আরব তেল বয়কটএবং প্রয়োজনীয় পণ্য রপ্তানী বন্ধের জন্য মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ন্যাটো ও কমনমার্কেটভুক্ত দেশগুলিকে নিয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা চালায়। অন্যান্য অঞ্চল থেকে তেল আমদানী করে ঘাটতি পূরণের চেষ্টা চলে। উন্নতিকামী দেশগুলিতে কৃত্রিমভাবে তেল সংকট সৃষ্টি করেছে তেল বিক্রেতা একচেটিয়া কোম্পানিগুলি অতিরিক্ত মুনাফার জন্য।

তারা আরও বেশী ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছে। তেল সরবরাহে কৃত্রিম বাধা সৃষ্টি করে তারা দাম বাড়িয়ে চলেছে। যেমন, ১৯৫৩ খৃঃ শেষ তিন মাসেই এক্স্সন কর্পোরেশন তেলের ব্যবসায়ের মুনাফা বাড়ায় উনষাট শতাংশ।

কিন্তু জেনেভায় তেল রপ্তানীকারী দেশগুলির সংস্থার (ওপেক) অধিবেশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তেলের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অপরিমিত মুনাফা কমিয়ে রয়ালটির পরিমাণ বাড়াতে হবে এবং তৈল-জাত দ্রব্যের দাম বাড়ান চলবে না।

গোলমালের মধ্যে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তেলজাত দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে নেয়। এবং অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে মুনাফা হ্রাসের যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল, তা দূর করে লাভের অংক ঠিকই রাখে। অন্যদিকে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের ভয় দেখাতে থাকে।

তেলের দাম বাড়িয়ে তেল উৎপাদনকারী এগারটি দেশ (ওপেক) এবছর পঁচাশি কোটি ডলার আয় করবে। ১৯৫৫ খৃঃ এই আয়ের পরিমাণ হবে একশ কোটি ডলার এবং ১৯৫৬ খৃঃ একশ একাত্তর কোটি ডলার।

উন্নতিশীল দেশগুলিকে ১৯৫৩ খৃঃ তুলনায় তেল আমদানীর জন্য ব্যয় প্রায় নয় কোটি সত্তর লক্ষ ডলার বাড়াতে হবে। অর্থাৎ এইসব

দেশের ঋণের ভাগ আবও বাড়বে। অনুমান করা হচ্ছে তেল আমদানীর ক্ষেত্রে ১৯৩৩ খৃঃ তুলনায় প্রায় সত্তর শতাংশ পুঁজির দরকার। অন্যান্য সবকিছু অপরিবর্তিত থাকলেও, একমাত্র তেলের দর বৃদ্ধির জন্যই ১৯৩৩ খৃঃ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে উন্নত দেশগুলির ঘাঁটতির পরিমাণ হবে চার লক্ষ দশ হাজার কোটি ডলার। আর উন্নতিকামী দেশগুলির ঘাটতি দ্বিগুণ হয়ে দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার কোটি ডলার দাঁড়াবে।

পশ্চিম য়ুরোপ একছর তেলের জন্য ব্যয় করবে পঞ্চাশ হাজার মিলিঅন ডলার। ১৯৩১ খৃঃ ব্যয় হয়েছিল এগার হাজার মিলিঅন ডলার। জাপানকে ব্যয় করতে হবে সতের হাজার মিলিঅন ডলার।

মার্কিন তেল বিশেষজ্ঞদের মতে উন্নতিশীল দেশগুলির তেল আমদানীব ব্যয় ১৯৩৪ খৃঃ বেড়ে যাবে ১৯৩৩ খৃঃ তুলনায় অনেক বেশী। বর্তমান বছরে এজন্য ব্যয় হবে ১৪৯০ কোটি ডলার। কিন্তু একছব ব্যয় ছিল তেল আমদানি বাবদ পাঁচশত কুড়ি কোটি ডলার। অবশ্য এই হিসাব ধরা হয়েছে ব্যারেল প্রতি আট ডলার হিসাবে এবং দেশগুলির মোটামুটি চাহিদার হিসাবে। ১৯৩৪ খৃঃ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তেল আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি পাবে চারশত কোটি ডলার, লাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ানে তিনশত পঞ্চাশ কোটি ডলার এবং আফ্রিকায় (দক্ষিণ আফ্রিকা বাদে) একশত কোটি ডলার।

কয়েকটি দেশে তেল আমদানী ব্যয় :

(ডলার হিসাবে)

	১৯৩৩	১৯৩৪
ভারত	৪১ কোটি ৫০ লক্ষ	১৪০ কোটি
বাঙলাদেশ	৩ কোটি ৫০ লক্ষ	৯ কোটি ৫০ লক্ষ
পাকিস্তান	৮ কোটি ৫০ লক্ষ	২৬ কোটি
শ্রীলংকা	৫ কোটি	৭৪ কোটি
ফিলিপিন	২৬ কোটি ৫০ লক্ষ	৪৪ কোটি

	১৯৩৩খৃঃ	১৯৩৪ খৃঃ
কোরিয়া	৩২ কোটি ৫০ লক্ষ	১১০ কোটি
থাইল্যাণ্ড	১৮ কোটি	৫১ কোটি
কেনিয়া	৪ কোটি	১১ কোটি ৫০ লক্ষ
ঘানা	২ কোটি ৫০ লক্ষ	৭ কোটি
মরক্কো	৮ কোটি	২১ কোটি ৫০ লক্ষ
ব্রেজিল	৫৪ কোটি	১৪০ কোটি
উরুগুয়ে	৬ কোটি	১৬ কোটি
আর্জেনটিনা	৪ কোটি	৮ কোটি
তুরস্ক	২১ কোটি	৫৬ কোটি

কয়েক বছর যাবৎ তেলের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্যারিসের লা মঁন্দে পত্রিকার হিসাবে জানা যায়, ১৯৪২ খৃঃ তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২,৫৯৭ মিলিঅন টন। ১৯৪৫ খৃঃ সম্ভবত এই উৎপাদনের পরিমাণ হবে ৫,২৬০ মিলিঅন টন। তেল উৎপাদনে আরব দেশগুলির স্থান তৃতীয় হলেও, বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ অপরি-শোধিত তেলের ব্যবসা চালায় এরাই। ১৯৪২ খৃঃ এদের তেল উৎপাদনের পরিমাণ ছিল নয়শত বার মিলিঅন টন। সব থেকে বেশী উৎপাদন করে সৌদি আরব তিনশত মিলিঅন টন, তারপরই স্থান ইরানের দুইশত চল্লিশ মিলিঅন টন। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের প্রধান ক্রেতা পশ্চিম য়ুরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান। পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ১৯৪৩ খৃঃ মজুত তেলের পরিমাণ ছিল ছিয়াত্তর হাজার আটশ মিলিঅন টন। এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজাব মিলিঅন টন আছে মধ্য প্রাচ্যে।

সোভিয়েত তৈল সম্পদ আগামী বহু বছরের আভ্যন্তরীন ব্যবহার ও রপ্তানীর পক্ষে যথেষ্টরও বেশী। জ্বালানীর দিক থেকেও সম্পূর্ণ স্বনির্ভর। চল্লিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইল হল তেল এলাকা। সারা বিশ্বে তেল উৎপাদন এলাকার শতকরা চল্লিশ ভাগ। ১৯৪০-

৪২ খৃঃ কয়লা উৎপাদন হয়েছে বছরে ষোল কোটি ষাট লক্ষ মেট্রিক টন থেকে পঁয়ষট্টি কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মেট্রিক টন। এই সময়ে তৈল উৎপাদন হল তিন কোটি দশ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে উনচল্লিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ মেট্রিক টন। তিয়াত্তর সালে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল চার হাজার দুইশত চল্লিশ লক্ষ টন। বর্তমান বছরে তেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অতিরিক্ত তিন কোটি টন। সারা দেশে মোট উৎপন্ন তেলের পরিমাণ হবে পয়তাল্লিশ কোটি টন। উৎপাদনের একটি বৃহৎ অংশ আসে পশ্চিম সাইবেরিয়ার দ্রুত সম্প্রসারণশীল তৈল ক্ষেত্র থেকে। পূর্বদিকে শাখালিন দ্বীপে, বাইলোরাশিয়ায়, মধ্য এশিয়ায়, য়ুরোপীয় অঞ্চলে এবং উরাল পর্বতের দক্ষিণে রয়েছে তেলের বিপুল ভাণ্ডার। সামোতলোর সঞ্চয় ভাণ্ডারে আছে কোটি কোটি টন তেল। এসব তৈলক্ষেত্র থেকে দশ কোটি টন তেল উৎপাদনে সময় লেগেছে প্রায় সাত বৎসর। পরের দশ কোটি টন তেল উৎপাদনে সময় লাগবে মাত্র আঠার মাস। ষাটটিরও বেশী তেলের সঞ্চয়ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত তৈলাঞ্চল থেকে ১৯৪০ খৃঃ মধ্যে বছরে ত্রিশ কোটি টন তেল আহরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। পূর্ব সাইবেরিয়া ও কারস্কের উপকূল অঞ্চল, লাপতেভ, চুকোৎস্ক সাগরেও তেল পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তাতারিয়ায়, কাস্পিয়ানের পূর্বতীরে, কোসি প্রজাতন্ত্রে তেল উৎপাদন বাড়ছে। জ্বালানী ব্যবহারের পরিমাণ বছরে দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও মজুত সম্পদে এখন দুশ বছর স্বচ্ছন্দে চলবে।

তেল উৎপাদনে লাটিন আমেরিকান দেশগুলির ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। এখানে ১৯৪১ খৃঃ দুইশত একষট্টি মিলিয়ন টন এবং ১৯৪২ খৃঃ দুইশত উনপঞ্চাশ মিলিয়ন টন তেল উৎপন্ন হয়। সব থেকে বেশী উৎপাদক ও রপ্তানীকারক দেশ হল ভেনেজুয়েলা—দুইশত মিলি-য়ন টন। এ হল লাটিন আমেরিকায় উৎপাদিত তেলের সত্তর ভাগ এবং বিশ্বের সমগ্র উৎপাদনের ৬·৫ ভাগ। তারপরই হল মেক্সিকো—

ছাব্বিশ মিলিঅন টন এবং আর্জেনটিনা তেইশ মিলিঅন টন। লাটিন-আমেরিকার তেল প্রধানত রপ্তানী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

আফ্রিকায়ও তেল অনুসন্ধান ও উৎপাদন ক্রমশই বাড়ছে। এই মহাদেশে মজুত তেলের পরিমাণ একত্রিশ হাজার মিলিঅন টনেরও বেশী। বেশীর ভাগ তেল নিষ্কাশন হয় নাইজেরিয়ায়। ১৯৪২ খৃঃ এই দেশটি একশত মিলিঅন টন তেল উৎপাদন করে বিশ্বের দশটি বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে স্থান করে নেয়।

পশ্চিম য়ুরোপের শক্তির প্রধান উৎস তেল হলেও সব থেকে কম পরিমাণ তেল মজুত আছে এই এলাকায়। ১৯৪২ খৃঃ মজুত তেলের পরিমাণ ছিল মাত্র ষোল মিলিঅন টন। অবশ্য পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি সম্প্রতি উত্তর সাগরে আবিষ্কৃত তৈল সম্পদের ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এখানে অনুমিত তেলের পরিমাণ প্রায় বারশত পঞ্চাশ মিলিঅন টন। নরওয়ের একেবারে উত্তরে একোফিস্ক তেলক্ষেত্র এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রায় আড়াই শত মিলিঅন টন তেল আছে। স্কটল্যাণ্ডের একশত আটাত্তর কিলোমিটার পূর্বে ফরটিস্ তৈলক্ষেত্রে মজুত তেলের আনুমাণিক পরিমাণ হল আড়াই শত মিলিঅন টন। শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপের একশত ষাট কিলোমিটার দূরে ব্রেণ্ট অঞ্চলে দেড়শত মিলিঅন টন তেল পাওয়ার সম্ভাবনা। সবশেষে করমোরেণ্ট অঞ্চলে বিরাট তেলের ভাণ্ডারের সন্ধান য়ুরোপীয় দেশগুলিকে আশান্বিত করে তুলেছে।

কিন্তু উত্তর সাগরের তেল ভাণ্ডার য়ুরোপীয় তেলের চাহিদার মাত্র সামান্য চাহিদাংশ মেটাবে মাত্র। কারণ, ১৯৪২ খৃঃ পশ্চিম য়ুরোপ তেল আমদানী করে ছয়শত বাহাত্তর মিলিঅন টন। সব থেকে বেশী পরিমাণ তেল আমদানী করে ইতালি (১১৯·৫ মি.), ফ্রান্স (১১৮·২ মি.), ব্রিটেন (১০৭৩ মি.) এবং পশ্চিম জার্মানী (১০২·৬ মি.)।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় বৃহত্তম তেলের উৎপাদক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

১৯৪২ খৃঃ তেল উৎপাদন করে পাঁচশত মিলিঅন টন। এই সঙ্গে আবার বৃহত্তম আমদানীকারকের ভূমিকাও তার। ১৯৪২ খৃঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানী করে দুইশত ত্রিশ মিলিঅন টন। তারপরই স্থান জাপানের। তার আমদানীর পরিমাণ দুইশত মিলিঅন টন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূগর্ভে চল্লিশ হাজার কোটি ব্যারেল জ্বালানি তেল সঞ্চিত আছে। বর্তমানে চাহিদার হিসাবে এই তেল আগামী ষাট বছরের জন্য যথেষ্ট। নতুন আবিষ্কৃত তেলের পরিমাণ সম্ভবত দশগুণ। বর্তমান দরে সেই তেল উত্তোলন লাভজনক নয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের তৈলসম্পদ বিপুল এবং উৎপাদনও ক্রমশ বাড়তির দিকে। দেশের উত্তরের প্রদেশ হেইলুঙচুয়াঙে বিরাট তেল-ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে দৈনিক এক মিলিঅন টন তেল উৎপাদিত হচ্ছে। দশ হাজার বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে আছে তৈলক্ষেত্র। পাঁচ মিলিঅন টন তেল উৎপাদনের লক্ষ্য নিয়ে দেশ জুড়ে চলেছে অনুসন্ধান। বর্তমানে জাপান, ফিলিপিন ও হংকঙে তেল সরবরাহ করা হচ্ছে। জাপানে সরবরাহ করা তেলের পরিমাণ হল এক মিলিঅন টন। থাইল্যাণ্ড ও আরও কয়েকটি রাষ্ট্রে তেল রপ্তানীর সম্ভাবনা প্রবল।

১৯৪২ খৃঃ বিশ্বে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন

দেশ/অঞ্চল	মিলিঅন টন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৫৩২
কানাডা	৮৭.৫
ক্যারিবিয়ান	১৮৫.২
পশ্চিম এশিয়া	৯০১.৭
১। সৌদি আরব	৩০০
২। ইরাণ	২৪০
৩। কুয়ায়েত	১৫২

দেশ/অঞ্চল	মিলিঅন টন
৪। ইরাক	৬৭
৫। আবু ধাবি	৫০°৪
৬। কুয়ায়েত (নিরপেক্ষ অঞ্চল)	৩০°৩
৭। কোয়েতার	২৩
৮। ওমান	১৩
৯। দুবাই	৭°৫
আফ্রিকা	২৭৩°৫
১। লিবিয়া	১০৫°০
২। নাইজেরিয়া	৮৯°৫
৩। আলজেরিয়া	৫০
৪। মিশর	১১
পশ্চিম য়ুরোপ	১৬
সোভিয়েত ইউনিয়ন	৩৯৪
চীন	২৯°৬
ইন্দোনেশিয়া	৫৪
অস্ট্রেলিয়া	১৫
ব্রুনি	৯°২
ভারত	৭°৩

সমগ্র পৃথিবীতে যত তেল ভূগর্ভে মজুত আছে, তার শতকরা সত্তরভাগ আছে পশ্চিম এবং পারস্য উপসাগরে। পশ্চিম এশিয়ায় মজুত তেলের পরিমাণ ১২৫০০০ কোটি পিপে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি পৃথিবীর জমা তেল সম্পদের ষাট শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। এদের মধ্যে ইরাণ ছাড়া আর সবই আরব রাষ্ট্র। পাঁচবছর আগে এরা সম্মিলিতভাবে তেল বিক্রি থেকে চারশত কোটি চল্লিশ লক্ষ ডলার আয় করে। এখন এদের বার্ষিক আয়ের পরিমাণ দশ হাজার কোটি ডলার। ১৯৪০ খৃঃ এই অঙ্ক চল্লিশ হাজার কোটি

ডলার পৌঁছাবার সম্ভাবনা। হিসাব ঠিক থাকলে কেবল সৌদি আরবের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিলের পরিমাণ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত তহবিলের থেকে বেশী হবে। ১৯৪৫ খৃঃ আরব রাষ্ট্রগুলির তেল আয়ের অর্ধেক ব্যয় হলেও, সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে সরকারীভাবে যে পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ও সোনা সঞ্চিত আছে তার সমান হয়ে দাঁড়াবে। পাঁচটি প্রধান তেল উৎপাদনকারী আরব রাষ্ট্রের মজুত সোনা ও বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ (১৯৪৩ খৃঃ মাঝামাঝি মিলিঅন ডলার হিসাবে):

	মোট	সোনা	বৈদেশিক মুদ্রা
আলজেরিয়া	৪৫৩	২৩১	২২২
ইরাক	১,০৭৬	২৭৩	৯০৩
কুয়ায়েত	৫৫৫	১১৪	৩৪১
লিবিয়া	২,৭১০	১০৩	২,৬০৭
সৌদি আরব	৩,১১০	১৪৫	২,৯৬৫
মোট	৭,৯০৪	৭৬৬	৭,১৩৮

য়ুরোপ ও আমেরিকার ব্যাঙ্কে মজুত আরবদের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ডলারের মুদ্রা মূল্যহ্রাসে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। কুয়ায়েত, ইরাণ তেল বিক্রির টাকার বিরাট অঙ্ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোদ্যোগে বিনিয়োগ করে থাকে। আমেরিকার জেনারেল মোটরসের বিরাট শেয়ার হল সৌদি আরবের। যার ফলে ঐ কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সদস্য হলেন সৌদি আরবের দুই রাজকুমার। কলম্বিয়া ব্রডকাসটিং কোম্পানির শতকরা ত্রিশভাগ শেয়ার, এম জি এম (মেট্রো) ও ওয়াশিংটন স্টার নিউজের মালিক হলেন আবু ধাবির শেখ। আমেরিকায় কয়েকটি বড় বড়

হোটেল আছে কুয়ায়েত ইনভেসমেন্টের। আমেরিকায় তৈল শোধনাগার ও তেল বিক্রির ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করেছে ইরাণ। সুতরাং এই চারটি দেশ বিদেশের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তাদের টাকা উঠিয়ে নিয়ে ব্রিটেন ও আমেরিকাকে যে আর্থিক সংকটে ফেলবে না সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তিয়াত্তরের তেল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরব দেশগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিলে, এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু তার বাস্তবায়ন ছিল অসম্ভব।

পশ্চিম এশিয়ার তেল ভাগ বাটোয়ারায় প্রথম বিশ্বদ্ধের পর ইংরেজ ও মার্কিন শক্তির মধ্যে অনেক পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৮-১৯ খৃঃ মধ্যে ব্রিটেনের ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ, আমেরিকার ২৭ ভাগ এবং ফ্রান্সের ১০ ভাগ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকার হয় ৫০ ভাগ, ব্রিটেনের হয় দশভাগ। ফ্রান্সের ভাগে কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

তেল সাম্রাজ্যে 'সাত ভগ্নী'—তেলের সাতটি একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান (ইনটারন্যাশনাল অয়েল কনসোরটিয়াম) এই নামেই পরিচিত। পাঁচটি মার্কিন, একটি ব্রিটিশ ও একটি অ্যাংলো ডাচ কোম্পানি নিয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক পেট্রোলিআম কার্টেল। ব্রিটিশ পেট্রো-লিআম পশ্চিম এশিয়ায় যত তেল নিষ্কাশিত হয়, এর ভাগে পড়ত তার এক চতুর্থাংশেরও বেশি। রকফেলারের তিনটি কোম্পানি ব্রিটিশ পেট্রোলিআমকে ধরে ফেলে এখন তাকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। গাল্‌ফ অয়েল এবং টেক্সাকো নামে আরও দুটি মার্কিন কোম্পানি এবং ব্রিটেন-ডাচ রয়াল ডাচ শেল। এই শেষোক্ত কোম্পানিটি দীর্ঘকালের উপনিবেশিক নাম-ডাকের ফলে সবচেয়ে সুপরিচিত। এই কোম্পানিগুলি সবাই মিলে সাতষট্টির যুদ্ধের আগে প্রায় চল্লিশ কোটি টন তেল নিষ্কাশন করে। আরব দেশগুলিতে মার্কিন

আধিপত্যের প্রমাণ আবু ধাবির শেখরাজ্যে, বাহেরিন ও কুয়ায়েতে মার্কিন কোম্পানিগুলি নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার অধিকারী; সৌদি আরবে কয়েক দশক অসীম ক্ষমতা ভোগ করছে। লিবিয়ার চল্লিশটি বিদেশী কোম্পানির বাইশটি হল মার্কিন।

সৌদি আরব, কুয়ায়েত এবং ইরাক—এই তিনটি দেশ হল তেলের রাজাদের সমৃদ্ধির উৎস। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের সঙ্গেও এই তেলের রাজাদের স্বার্থ জড়িত। বিশেষ করে ভারত মহাসাগর ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী যে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ওপর দিয়ে তেলের পাইন লাইন গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে এমন কোন দেশ নেই বললেই চলে, তেলের ট্রাস্টগুলি যাকে কোন না কোন ভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করেছে।

পশ্চিমী একচেটিয়া পুঁজিপতিরা আরব থেকে বিপুল পরিমাণ মুনাফা অর্জন করে দেশে পাঠায়। এরা তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির প্রাকৃতিক সম্পদ শোষণ করছিল এবং তার পরিবর্তে নামমাত্র রয়েলটি ও কর দিত। মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন অঞ্চলে তেলের মুনাফা পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত ওঠে। একচেটিয়া পুঁজিপতিরা তেল ক্ষেত্রের মালিক-দের যে পরিমাণ কর দেয়, তার চেয়ে অনেক বেশী কর দেয় তাদের নিজ নিজ সরকারকে। তেল কোম্পানিগুলি তেল উৎপাদন, নিষ্কাশন, পরিবহণ, বাণিজ্য, এমন কি তেল শিল্পে একচেটিয়া প্রভুত্ব বিস্তার করে রেখেছে। তেল কোম্পানিগুলির লাভ ছিল সাড়ে নয় হাজার মিলিঅন ডলার।

তেল কোম্পানিগুলি যে মুনাফা অর্জন করে তার একটা অংশ গোপনই থেকে যায়। তেল বিক্রি থেকে 'সাত-ভগ্নী' যে মুনাফা করে তার পরিমাণ দুশত কোটি ডলারে কম নয়। গত পাঁচ বছরে এই মুনাফার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে এক হাজার কোটি ডলার। মার্কিন পুঁজিপতিরা, চলতি জ্বালানী সংকটের সুযোগে

মুনাফা লোটে ও তেলের দর বাড়ায়। তেল কোম্পানিগুলি ১৯৫২: তুলনায় ষাট শতাংশ বেশী মুনাফা অর্জন করেছে। এরা সাত ডলার হারে তেল কিনে পনের ডলার হারে বিক্রি করে।

সাতটি তেল কোম্পানি ১৯৫৬ খৃঃ আরব অঞ্চলের মোট তৈল নিষ্কাশনের আশি ভাগের অংশীদার ছিল। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কোম্পানির নিয়ন্ত্রণও বিভিন্ন রকম। লিবিয়ার পঁচানব্বই ভাগ আমেরিকা, আলজেরিয়ার আশি ভাগ ফরাসী, ইরাকে সাতচল্লিশ ভাগ ব্রিটেন, উনত্রিশ ভাগ ফরাসী এবং চব্বিশ ভাগ ছিল আমেরিকান কোম্পানিগুলির। এই সমস্ত কোম্পানির তেল নিষ্কাশণের পরিমাণ এত বেশী ছিল যে, অন্যান্য কোম্পানিগুলির পক্ষে এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বর্তমানে এশিয়া ও আফ্রিকার তৈলক্ষেত্রগুলি থেকে তেল আহরণ-কারী পৃথিবীর বৃহত্তম তৈল সংঘগুলির মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং হল্যাণ্ড। পুঁজিবাদী দুনিয়ার বৃহত্তম শিল্প করপোরেশন স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানি এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্প কর্পোরেশন রয়েল ডাচ-শেলের (এই করপোরেশনের ষাট শতাংশ শেয়ার ডাচদের)।

মার্কিন প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের তৈলসম্পদ সোৎসাহে ব্যবহার করা ছাড়াও, ১৯৫০ খৃঃ থেকে ১৯৫২ খৃঃ মধ্যে বিদেশে তাদের তেলের উৎপাদন দশ কোটি টন থেকে বাড়িয়ে পঁচাশি কোটি টন করে। এই সব প্রতিষ্ঠান দেশের তুলনায় বিদেশে ১·৬ গুণ বেশী তেল আহরণ করেছে। একই সময়ের মধ্যে রয়েল ডাচ শেল বিদেশে তার উৎপাদন ছয় কোটি কুড়ি লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে একুশ কোটি ষাট লক্ষ টন করেছে।

১৯৫২ খৃঃ মার্কিন ও ডাচ নিয়ন্ত্রিত তৈল অর্থনীতির সূচক

[দশ লক্ষ টন হিসবে]

	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	হল্যাণ্ড
তেল ব্যবহারের পরিমাণ *	৮৪০	৫০
জাতীয় উৎপাদন	৫৩২	২
বিদেশে আয়ত্তাধীন উৎপাদন		
মোট	৮৫০	২১৬
আরব দেশগুলিতে	৫১০	৪৪
আমদানী করা তেল ও তৈলজাত পদার্থ		
মোট **	২২০	৫১
আরব দেশগুলি থেকে	৪০	৪০

* জাহাজ ও .সামরিক প্রয়োজন মেটানোসহ অপরিশোধিত তেলের হিসাব।

** নিট আমদানী।

মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে তেল রপ্তানীর একটি হিসাব (মিলিঅন টন হিসাবে) :

	মোট পরিমাণ	
ব্রিটেন	৪৪	৪৯
আমেরিকা	১৫	১৩
ইতালি	৫৭	৫৮
জাপান	৪৮	৫৪
ফ্রান্স	৪৮	৫২
পশ্চিম জার্মানী	৪৪	৫০
হল্যাণ্ড	১৯	২৫

পশ্চিম এশিয়ার তেলের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় পশ্চিম য়ুরোপীয়, জাপান ও ভারত অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল। পশ্চিম

য়ুরোপের অকমিউনিস্ট দেশগুলির তেলের মোট চাহিদার শতকরা নয় ভাগ জোগায় ইরাক এবং চব্বিশ ভাগ জোগায় লিবিয়া। তেল পরিবহন করে এবং কেনে প্রধানতঃ পশ্চিমী কোম্পানিগুলি। জাহাজও তাদের। বর্তমানে আমেরিকা নিজের প্রয়োজনের মাত্র তিন শতাংশ তেল আমদানী করে আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে। আরব তেলের শতকরা পঁচাশি ভাগ যায় জাপানে। কিন্তু সামরিক দিক থেকে আমেরিকা আরব তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। কারণ পশ্চিম য়ুরোপ থেকে দক্ষিণ ভিয়েতনাম পর্যন্ত তার বিস্তৃত ঘাঁটি ও সেনাবাহিনীর জন্য ব্যবহৃত হয় আরব তেল।

পশ্চিম য়ুরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান বর্তমানে পৃথিবীর দৈনিক তেল উৎপাদনের শতকরা আশিভাগ ব্যবহার করে। মার্কিন অর্থনীতি আরব তেলের মুনাফার ওপর নির্ভরশীল। আমেরিকার একচেটিয়াপতিরা এখানে অর্থবিনিয়োগ করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। বিদেশে মার্কিন বিনিয়োগের শতকরা মাত্র তিন ভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্যে। কিন্তু লাভ নিয়ে যায় শতকরা পনের ভাগ। বছরে মার্কিন কোম্পানিগুলি এক হাজার পাঁচ শত ৫টি ডলার থেকে দুহাজার ডলার পর্যন্ত নিয়ে যায় স্বদেশে। উনচল্লিশটি মার্কিন তেল কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণ ছিল ৬,৫৮০ কোটি ডলার এবং মোট মুনাফা করে ৪৬০ কোটি ডলার।

মধ্যপ্রাচ্য থেকে ব্রিটেন ও আমেরিকায় মোট তেল আমদানীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে উনপঞ্চাশ এবং তের মিলিঅন টন। আমেরিকার মোট তেল আমদানী পরিমাণের মধ্যে শতকরা কুড়ি ভাগই হল আরবীয় তেল। ব্রিটেন বৎসরে প্রায় সত্তর ভাগ অপরিশোধিত তেল আমদানী করে থাকে। পশ্চিম য়ুরোপের দৈনিক প্রয়োজনের শতকরা পয়ষট্টি ভাগ তেলই আসে আরব রাষ্ট্রগুলি থেকে।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় তেলের চাহিদা ছিল একশত পঁচাশি

কোটি টন। ১৯৫০ খৃঃ হবে তিনশ পনের কোটি টন এবং ১৯৫৫ খৃঃ হবে চারশ কোটি টন। বর্তমাসে যে হারে তেল ব্যবহার হচ্ছে তা স্বাভাবিক থাকলে বর্তমান শতকের শেষে তেলের উৎপাদন করতে হবে দুহাজার কোটি টন। এখন পর্যন্ত জানা গেছে অ-সমাজতান্ত্রিক দেশে তৈল সম্পদের মোট পরিমাণ সাতাত্তর শত কোটি টন। তেলের আরও নতুন সঞ্চয়-ক্ষেত্র আবিস্কৃত হলেও, একথা সত্য তৈল সম্পদ অসীম নয়।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির ব্যবহারও বাড়ছে। বর্তমান শতকের প্রথমে শক্তির ব্যবহার বেড়ে যায় তিন গুণ। পরের তিনটি দশকে আরও তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। যে সব জিনিস দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সস্তা হল তেল। কয়লা শক্তির ব্যবহারে নিদারুণ ভাবে অপাঙ্‌তেয় হয়ে পড়ে। ১৯২৯ খৃঃ থেকে ১৯৫০ খৃঃ মধ্যে কয়লার ব্যবহার আশি শতাংশ থেকে হ্রাস করে পঁয়ত্রিশ শতাংশ হয়। পশ্চিম য়ুরোপ শক্তির চাহিদার ষাট শতাংশই মেটায় তেল থেকে ; গ্যাস মেটায় নয় শতাংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হল যথাক্রমে পঞ্চাশ পঁত্রিশ শতাংশ। জাপানে শক্তির ব্যবহারে সত্তর শতাংশই হল তেল।

আমেরিকার শক্তি ব্যবহারের শতকরা চল্লিশভাগেরও বেশী আসে তেল থেকে। ১৯৫০ খৃঃ শতকরা পাঁচ ভাগ তেল বিদেশে রপ্তানী করা হয়। কিন্তু ১৯৫১ খৃঃ মধ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগই ভেনেজুয়েলা থেকে আমদানী করা হয়। অনুমান করা হচ্ছে ১৯৫৫ খৃঃ মধ্যে বিদেশ থেকে আমেরিকার তেল আমদানী পরিমাণ হবে দ্বিগুণ। আমেরিকা লিবিয়া, সৌদি আরব, কুয়ায়েত ও আবু ধাবি থেকে ১৯.৭ মিলিঅন তেল আমদানী করলেও, তাকে তেলের জন্য সম্পূর্ণভাবে সৌদি আরবের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।

বিদেশে যত পেট্রোলিয়াম ও অপরিশোধিত তেল রপ্তানী হয়, তার মধ্যে পশ্চিম এশিয়ার অংশ ছিল ৬৩৫ মিলিঅন টন।

আফ্রিকার (লিবিয়া, আলজেরিয়া ও নাইজেরিয়া) ২৮০ মিলিঅন টন। যে পরিমাণ তেল বিশ্বে ব্যবহৃত হয়েছে তার ঠিক দ্বিগুণ পরিমাণ তেল দরকার পড়বে। সে বছরে পশ্চিম এশিয়া রপ্তানী করবে ১৯০০ মিলিঅন টন এবং আফ্রিকা ৪৬৫ মিলিঅন টন।

আমেরিকার দৈনিক বার মিলিঅন টন সমুদ্রপথে আমদানী করতে হবে। এজন্য সত্তর হাজার টনের এক হাজারের ও বেশী ট্যাঙ্কারের দরকার পড়বে।

তেল কোম্পানীগুলির বিপুল মুনাফার কারণ কী? দুটি কথা এ প্রসংগে মনে রাখতে হবে। প্রথমত মধ্যপ্রাচ্যের তৈলক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেতন খুবই কম। দ্বিতীয়ত, মধ্যপ্রাচ্যে এরা তৈল-শোধনাগার তৈরি করে না, তেল শোধন করা হয় অন্যত্র। আর তৈলজাত দ্রব্য অপেক্ষা অপরিশোধিত তেলের দাম অনেক কম। এমন কি সবচেয়ে নীরেস গ্যাসোলিনের দামও অপরিশোধিত তেলের দামের দ্বিগুণ। দামী তেল বা রাসায়নিক দ্রব্যের দাম তো অবশ্যই বহুগুণে বেশী।

তৈল সম্পদশালী আরব রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক দুরাবস্থা কল্পনাতীত। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি তাদের এই শিল্পের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব বা লভ্যাংশের জন্য তৎপর করে তোলে। নিজেদের স্বাধীনতা সুদৃঢ় করে তরুণ আরব রাষ্ট্রগুলি তেলের ট্রাস্ট সমূহের ওপর নতুন আঘাত হেনেছে। নতুন নতুন স্বাধীন জাতীয় তৈল কোম্পানি গঠিত হয়েছে, হচ্ছে। কোন কোন দেশে স্থাপিত হচ্ছে তৈল শোধনাগার। এই শোধনাগার নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। আলজেরিয়ার তৈল ক্ষেত্রের ব্যাপক রাষ্ট্রীয়-করণ ঘটেছে। কুয়ায়েতও ধীরে ধীরে এই পথে অগ্রসর হচ্ছে। তিয়াত্তরের সেপ্টেম্বরে লিবিয়া সরকার ছয়টি মার্কিন তেলকোম্পানির শতকরা একান্নভাগ শেয়ার নিয়ে নেয়। ইরাণ ও সৌদি আরব মার্কিন ও ব্রিটিশ কোম্পানির শতকরা পঁচিশ ভাগ শেয়ার নিয়ে নেয়

তিয়াত্তরের প্রথমেই। ইরাক সরকার বাহাত্তর সালে উত্তর ইরাকের তেল কোম্পানিগুলি জাতীয়করণ করেন। তিয়াত্তরের অক্টোবরে দক্ষিণ ইরাকের ডাচ, ব্রিটিশ, ফরাসী ও মার্কিন অংশীদারের সমন্বয়ে গঠিত বসরা পেটরোলিআমের দুই মার্কিন অংশীদারের অংশমাত্র জাতীয়করণ হয়।

আরব রাষ্ট্রগুলি ওপেক (অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিআম এক্সপোটিং কান্টি্স্) সৃষ্টি করে লভ্যাংশের মালিকানা অংশ দাবী করে। এই সংস্থায় আছে দশটি সদস্য রাষ্ট্র: আবু ধাবি, আলজেরিয়া, বাহেরিন, মিশর, ইরাক, কোয়েতার, কুয়ায়েত, লিবিয়া, সৌদি আরব এবং সিরিয়া। ১৯৫০ খৃঃ পর শতকরা কুড়ি ভাগ লভ্যাংশ তারা লাভ করে। তারপর বিভিন্ন রাষ্ট্রে নানারকম আন্দোলনের ফলে এই পরিমাণ বাড়িয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ করা হয়। ১৯৫২ খৃঃ প্রধান তেল কোম্পানিগুলি আটান্ন ভাগ অংশ দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তেলের দামের ওপর আরব রাষ্ট্রগুলির নিয়ন্ত্রণ জোরদার হয়েছে এবং উচ্চতর হারে রয়েলটি পাচ্ছে। ১৯৫২ খৃঃ আরব রাষ্ট্রগুলি যেখানে পেয়েছিল ১,১৬০ মিলিঅন ডলার, ১৯৫৫ খৃঃ পায় ২,২৫২ মিলিঅন ডলার। ওপেক সদস্যভুক্ত দেশগুলি ১৯৫৬ খৃঃ চুয়াত্তর কোটি টন তেল আহরণ করে, যা পশ্চিম য়ুরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের চাহিদার আশি শতাংশ মেটায়।

সাতষট্টির যুদ্ধের সময় দশটি আরব রাষ্ট্র (সৌদিআরব, ইরাক, কুয়ায়েত, লিবিয়া, আলজেরিয়া, আবু ধাবি, কাতার, বাহেরিণ, সিরিয়া, লেবানন) বাগদাদে মিলিত হয়ে ঘোষণা করে, যে সব রাষ্ট্র ইজরায়েলকে সাহায্য করবে, তাদের তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হবে। তারা বিদেশী তেল কোম্পানীগুলিকে সতর্ক করে, যে এই নির্দেশের অমান্যকারীকে সম্পূর্ণ বয়কট করা হবে।

আরব রাষ্ট্রগুলি তেল বন্ধ করে দেওয়ায় একটি ভয়ঙ্কর অবস্থার

সৃষ্টি হয়। পশ্চিম য়ুরোপে সংরক্ষিত তেল মাত্র দু'চার মাসের প্রয়োজন মেটাতে পারত। ইজরায়েলী আক্রমণের পর তেল নিষ্কাশন এবং রপ্তানী পরিমাণ কমে গিয়ে সর্বনিম্ন শতকরা ত্রিশভাগ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাতে পারে না। নিউইয়র্ক টাইমস পশ্চিম য়ুরোপকে অদূর-ভবিষ্যতে তেল সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। ব্রিটেনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। তাছাড়া সুয়েজখাল বন্ধ হওয়ায় উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাওয়ার জন্য যে অতিরিক্ত জাহাজের প্রয়োজন পড়ে, মোকাবিলা করাও অসম্ভব ছিল পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির পক্ষে।

তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলি এক চরম অর্থ-নৈতিক সংকট ও ভয়াবহ সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এর মধ্যেই উন্নয়নশীল দেশগুলিতে দেখা দিয়েছে ব্যাপক শিল্পসংকট। তেলের দামবৃদ্ধি ও নিষেধাজ্ঞায় জাপান, ব্রিটেন, হল্যাণ্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ইতালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি আরো কয়েকটি দেশের কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। শ্রমিক ছাঁটাই বেড়েছে, সেই সঙ্গে বেড়ে গেছে বেকার সংখ্যা। পুঁজিবাদী দুনিয়া তেলবৃদ্ধির জন্য সাময়িক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, শিল্পদ্রব্য ও খাদ্যের দাম বাড়িয়ে পুষিয়ে নিচ্ছে। এক তীব্র অর্থনৈতিক শোষণে উন্নয়নশীল দেশগুলি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপারে টালবাহনা ও শর্ত আরোপ করবে। তার ইংগিত পাওয়া যায় ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যর আলেক ডগলাস হিউমের আফ্রিকা সফরকালীন বক্তৃতায়। তিনি বলেন, তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না।

তেল সংকট মোকাবিলায় ব্রিটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে সরকার তেলের চাহিদা

কমাবার সিদ্ধান্ত নেন। ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের দুশত ফ্লাইট, য়ুরোপীয় ডিভিশনের চৌদ্দশত ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়।

পশ্চিম জার্মান সরকার গাড়ীর গতি হ্রাস করে এবং রবিবার গাড়ী চালান বন্ধ করে, মাসে শতকরা তিন ভাগ তেল বাঁচিয়ে এই তেল শিল্পেও জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। মোট বেকার সংখ্যা দাঁড়ায় দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার। এটা দেশেব মোট শ্রমশক্তির এক দশমাংশ।

ইতালি মন্ত্রিসভা ছুটির দিনে গাড়ী চালাবার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেন। সড়ক ও সরকারী ভবনে আলো কমিয়ে দেওয়া হয়। এমন কি বিজ্ঞাপনে পর্যন্ত আলোকসজ্জা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। সুইজারল্যাণ্ড সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় বিমান চলাচল কমিয়ে দেন। গ্রীসেও গাড়ীর গতি হ্রাস ঘটে। পর্তুগালে জ্বালানী ও পেট্রোলের অপব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়।

হল্যাণ্ডে আরব তেল সরবরাহে বিধিনিষেধ আরোপে বহু দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ হল্যাণ্ডের রটারডাম বন্দর হচ্ছে বিভিন্ন দেশে মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র। হল্যাণ্ডের কয়েকটি প্রধান তেলকোম্পানি পেট্রো কেমিক্যাল শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে তেলের সরবরাহ গড়ে পনের ভাগ কমিয়ে দেয়। কয়েকটি তেল কোম্পানির উৎপাদনও দশভাগ কমে যায়। রবিবার গাড়ী চালান নিষিদ্ধ করা হয়।

আরব তেল নিষেধাজ্ঞায় জাপানের গোটা অর্থনীতি ভেঙে পড়ার সম্মুখীন হয়। জাপানের বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তরের সূত্রে জানা যায় আরবদের তেল উৎপাদন হ্রাস করায় জাপানকে পুরো অর্থনীতি ঢেলে সাজাতে হতে পারে। এই সংকট মোকাবিলার জন্য অবশেষে জাপান সরকার মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবটি যথাশীঘ্র কার্যকর করার আহ্বান জানান। এবং এই বলে ইজরায়েলকে সতর্ক করে দেয় যে, ইহুদি রাষ্ট্র যদি এই প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করে তবে টোকিও সরকার ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয় পুনর্বিবেচনা করবে। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে জাপানের মনোভাব ব্যাখ্যার জন্য জাপানের উপপ্রধানমন্ত্রী মিঃ টাকোমিফি আরব দেশগুলি ভ্রমণ করেন। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান-কারী ইহুদীরা জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দেয়। ইহুদি পুঁজিপতিরা সিদ্ধান্ত নেন জাপানী পণ্য বর্জনের। উল্লেখ-যোগ্য যে বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ঋণদানকারীদের ওপর ইহুদি পুঁজিপতিদের প্রভাবই বেশী। জাপান ও মিশর সরকারের মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুসারে মিশর তিন'শ কোটি ইয়েন সাহায্য পাবে। সুয়েজখাল উন্নয়নে চৌদ্দ কোটি ডলার ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাপানের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়েছিল।

জাপানী শিল্পের শতকরা পঁচাত্তর ভাগই আমদানী করা তেলের ওপর নির্ভরশীল। বর্তমান সংকট থেকে উদ্ধারের জন্য একান্নটি সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত জাপান পেট্রোলিআম ডেভলপমেণ্ট কর্পোরেশন বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে তেল অনুসন্ধান চালাচ্ছে। এরা অবশ্য মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিমা তেল কোম্পানীর অধীন অঞ্চলে কাজ করছে না। দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং থাইল্যাণ্ড উপসাগরে অনুসন্ধানে বিপুল তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। জাপানীরা অবশ্য তাদের ওই তেল ব্যবসায়ে মার্কিন সংস্থাগুলিকে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। জাপানী কোম্পানীগুলি বর্তমানে আলাস্কা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, কলম্বিয়া, হনডুরাস, ইরান, ইরিয়ান, জাভা (ইন্দোনেশিয়ান নিউ গিনি), পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, থাইল্যাণ্ড, কাতার এবং জায়েরিতে কর্মরত।

তেল সংকট কাটিয়ে ওঠার জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকার এক বিবৃতিতে জানান অধিকৃত আরব অঞ্চল থেকে ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত।

ন্যাটো জোটভুক্ত চারটি দেশ (স্পেন, ইতালি, গ্রীস ও তুরস্ক)

ইজরায়েলগামী মার্কিন বিমানকে তাদের এলাকায় জ্বালানী গ্রহণ ও বিমান অবতরণ করতে দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তেল সংকট মোকাবিলা। কেবলমাত্র পর্তুগাল ও পশ্চিম জার্মানী মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপে সমর্থন জানায়। কিন্তু পরে তেল সংকটের প্রেক্ষিতে, পশ্চিম জার্মান সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হন, যুধ্যমান একটি পক্ষের কাছে পশ্চিম জার্মান ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে অস্ত্র সরবরাহ চলতে দেওয়া যায় না।

উপসাগরীয় রাষ্ট্র বাহেরিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ার করে দেয় যে, এক সপ্তাহের মধ্যে ইজরায়েলকে সবরকম সাহায্য প্রদান বন্ধ না করলে বাহেরিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার নৌ ডক ব্যবহারের সমস্ত সুযোগ বঞ্চিত করবে। ইজরায়েলে অস্ত্র সরবরাহ ব্যাপারে ব্রিটেনও তার সাইপ্রাসের বিমান ঘাঁটি যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহার করতে দেয়নি।

ফরাসী প্রধানমন্ত্রী পিয়ের মেসমার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়ে দেশ, ফ্রান্স তেলের ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করবে না। বরং তেল উৎপাদনকারী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে পৃথক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

তেল পরিস্থিতি নিয়ে মার্কিন সরকারকে বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের মত অনেকেই মার্কিন সরকারের ইজরায়েলী তোষণনীতির প্রকাশ্য সমালোচনা না করলেও, নিজেদের শিল্প ও সভ্যতা রক্ষার জন্য স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণের ইঙ্গিত দেয়। য়ুরোপীয় সাধারণ বাজারের নয়টি সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা ১৯৫২ খৃঃ থেকে ইজরায়েল যেসব আরব ভূখণ্ড দখল করে আছে সেগুলি ছেড়ে দেওয়ার জন্য ইজরায়েলের প্রতি আহ্বান জানান। চূড়ান্ত শান্তির জন্য তাদের প্রস্তাবে ছিল ঃ

১। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ভূমিদখল বন্ধ করতে হবে ;

২। ইজরায়েল অবশ্যই ১৯৫২ খৃঃ দখল করা অঞ্চল ছেড়ে দেবে ;

৩। এই অঞ্চলে প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার মর্যাদা এবং নিরাপত্তা ও সুনির্দিষ্ট সীমান্তের মধ্যে তাদের বসবাসের অধিকার রক্ষা করতে হবে;

৪। সুষ্ঠু ও স্থায়ী শান্তির জন্য প্যালেস্টাইনীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে স্বীকৃতি জানাতে হবে।

—মার্কিন প্রভাবাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠী তেলসংকটে একান্ত অসহায় অবস্থায় যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সে বিষয়ে কোন প্রশ্নই থাকতে পারে না।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন এক কোটি পঁচাত্তর লক্ষ ব্যারেল (এক ব্যারেল একশ উনষাট লিটারের সমান) তেল ব্যবহার করে। এর মধ্যে প্রতিদিন আমদানী করতে হয় পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর লক্ষ ব্যারেল। বেশির ভাগ তেল আসে ভেনেজুয়েলা, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে। মোট আমদানির আট থেকে দশ শতাংশ যোগায় মধ্যপ্রাচ্য। প্রতিমাসে কানাডা তিন কোটি পিঁপে অপরিশোধিত তেল ও অনুরূপ পরিমাণ শোধিত তেল যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করে। কানাডার বিদ্যুৎমন্ত্রী মিঃ ডোলাল্ড ম্যাকডোনাল্ড বলেন, কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে তেল রপ্তানী বন্ধ করবে; যদি আরবরা কানাডায় তেল সরবরাহ অব্যাহত রাখে। কানাডা যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরিত অপরিশোধিত তেলের ওপর শতকরা সাতাশ ভাগ রপ্তানীশুল্ক আরোপ করায় প্রতি ব্যারেল তেলের দাম চল্লিশ সেণ্ট বেড়ে গিয়ে ১'৯০ মার্কিন ডলারে পৌঁছায়।

মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানিগুলির বিপুল মুনাফায় আঘাত পড়ার মধ্যেই রয়েছে মার্কিন শক্তিসংকটের রহস্য। কি সস্তায় যে তারা মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আহরণ করে তার সামান্য নিদর্শন তুলে ধরেছে পেট্রোলিয়াম টাইমস্ পত্রিকা। সৌদি আরবে একটন তেল আহরণ করতে যত ইস্পাত লাগে, তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল আহরণে ব্যবহৃত ইস্পাতের দশ শতাংশ মাত্র।

তৈল নিষেধাজ্ঞার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তেল ও অন্যান্য ভোগ্য-পণ্যের দাম বেড়ে যায়। অর্থনীতির মন্দা দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। শেয়ারের দাম পড়ে যায় শতকরা নয় থেকে উনিশ ভাগ। আভ্যন্তরীণ বাজারে তেলজাত সব জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। পেট্রোলের দাম বাড়ে সব থেকে বেশী। নভেম্বর মাস থেকেই অর্থনৈতিক উৎপাদন শতকরা কুড়ি ভাগ হ্রাস পায়। নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও নিউইংল্যাণ্ডে কয়েকটি প্লাস্টিক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে তেল ঘাটতির জন্য। সেপ্টেম্বর মাস থেকে নতুন মডেলের গাড়ী বিক্রি হ্রাস পায় শতকরা এগার ভাগ। বিমান ও প্রমোদতরী উৎপাদনও কমে যায়। ইস্পাতশিল্পে শতকরা পনের ভাগ তেল সরবরাহ হ্রাস পায়। ফলে ইস্পাত উৎপাদন ব্যাহত হয়। তেলের দাম বৃদ্ধির জন্য চলতি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক বাণিজ্যে তিন-শত থেকে পাঁচশত কোটি ডলার ঘাটতি হবে। চলতি বছর পেট্রোল আমদানির জন্য আসল খরচ দশ হাজার ডলার ব্যয়ের সম্ভাবনা।

জ্বালানী সংকট মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারীভাবে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হোয়াইট হাউসের উত্তাপ আটষট্টি ডিগ্রী ফারেনহিট নামিয়ে আনা হয়। এমনকি হোয়াইট হাউসের বাইরে ফ্লাড লাইট রাত্রি দশটার পর নিভিয়ে দেওয়া হতে থাকে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান জ্বালানী ব্যয় কমিয়ে দেয়। আলোকিত বিজ্ঞাপনের হারও কমে যায়।

চুয়াত্তরের প্রথম তিন মাসে শতকরা সতের ভাগেরও বেশী তেল ঘাটতির সম্ভাবনা। হিটিংঅয়েল শতকরা পনের, বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক ভবনে শতকরা পঁচিশ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে শতকরা দশভাগ তেল সরবরাহ কমে গেছে। গ্যাসোলিন সরবরাহ কমে গেছে শতকরা দশভাগ। বিমানসংস্থায় জ্বালানী তেল প্রথমে শতকরা পাঁচ, পরে পনের ভাগ কমে যায়। ওয়াশিংটনে বাস চলাচলে তেল সরবরাহ কমে যায় শতকরা পঁচিশ ভাগ। ক্লিভল্যাণ্ড, মেমফিস

ও অন্যান্য স্থানে বাস চলাচল বন্ধ হয়। ওয়াশিংটনের গ্যাসলাইট কোম্পানি দুইশত আটষট্টিটি বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যিক সংস্থায় প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহ কমিয়ে দেয়। আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ব্যাহত হয়। দৈনিক চারশরও বেশী ফ্লাইট বাতিল হয়ে যায়। লণ্ডন, জুরিখ, ফ্রাংকফুর্টে ফ্লাইট কমে গেছে। জ্বালানী সংকটের কারণে বেকার সংখ্যা শতকরা ৪.৯ ভাগ বেড়ে যায়।

বিকল্প জ্বালানী উদ্ভাবন এবং শক্তির অভাব পূরণের জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে মার্কিন সরকার একশ কোটি ডলার ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

আমেরিকার বিভিন্ন তেল সংরক্ষণাগার থেকে ভূমধ্যসাগরে নোঙর করা ষষ্ঠ নৌবহরে তেল পাঠাতে থাকে। ষষ্ঠ নৌবহরের এইসব ইউনিট সাধারণত মধ্যপ্রাচ্যের শোধনাগারসহ বড় বড় কোম্পানী থেকে জ্বালানী সংগ্রহ করে থাকে।

সিঙ্গাপুর সরকার মার্কিন রণতরী এবং ফিলিপিন সরকার মার্কিন ঘাঁটিতে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

টাইম পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়, বিশ্বে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সংকটজনক অবস্থাকে বিপজ্জনক করে তোলে আরব তেল হ্রাস। পদস্থ মার্কিন সামরিক অধিনায়কেরা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন মার্কিন বাহিনীর আক্রমণ প্রস্তুতি বজায় রাখার জন্য। জেট প্রশিক্ষণ-দানকারীদের আটভাগের একভাগ ফ্লাইট কমিয়ে দেওয়া হয়। এ আমেরিকার পক্ষে বিপর্যয়কারী ঘটনা। সম্পূর্ণ আরব তেলের ওপর নির্ভরশীল সপ্তম নৌবহর, ষষ্ঠ নৌবহর, পশ্চিম য়ুরোপের মার্কিন সশস্ত্র বাহিনীকে সক্রিয় রাখতে খাস মার্কিন মুল্লুক থেকে তেল পাঠান ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

প্রাচ্য দেশগুলি ১৯৭২ খৃঃ একশত ষাট কোটি টন তেল ব্যবহার করে। তার মধ্যে আমদানী করা তেলের পরিমাণ হল নব্বই কোটি

টন অর্থাৎ ছাপান্ন শতাংশ। তেল সংকটে তাদের জীবনধারা ও সামরিক কার্যকলাপ স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ কিসিংগার বলেন আরব রাষ্ট্রগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তেল অস্ত্র ব্যবহার অব্যাহত রাখলে পাল্টাব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদি তাদের এ চাপ অযৌক্তিকভাবে ও অনির্দিষ্টকাল অব্যাহত থাকে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অনিচ্ছাসত্বেও এই পথ নিতে হবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ফোর্ড বলেন, আরবরা যদি আমেরিকায় তেল পাঠান বন্ধ করে, তাহলে আমেরিকাও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেবে। এমন কি মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্লেসিংগার হুমকি দেন, তেলের জন্য আমেরিকা শক্তিপ্রয়োগ করবে।

শক্তিপ্রয়োগের এই সম্ভাবনাকে একেবারে ফাঁকা বুলি হিসাবে হিসাবে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ পশ্চিম জার্মানীর স্টার্ন পত্রিকা থেকে জানা যায়, কালিফোর্ণিয়ার মোজাভ মরুভূমিতে নয় হাজার মার্কিন সৈন্যকে মরুভূমির যুদ্ধ ট্রেনিং শুরু হয়ে যায়।

সৌদি আরবের তেলমন্ত্রী ইয়েমানি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন আরবদের তেল সংকটের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র য়ুরোপ কিংবা জাপান পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সৌদি আরব তেল উৎপাদন শতকরা আশিভাগ কমিয়ে দেবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যাপারে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সৌদি আরব তেলখনিগুলি বিস্ফোরকের সাহায্যে উড়িয়ে দেবে। কুয়ায়েতও তেলের খনিতে মাইন পুঁতে রাখে এবং তেলের পাইপ উড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পারস্য উপসাগরের সাতটি আরব শেখ রাজ্যের সমন্বয়ে গঠিত সংযুক্ত আরব আমিররাও তেলখনি উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

মার্কিন প্রতিনিধি সভায় পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিশনের এক রিপোর্টে বলা হয় আরব দেশগুলিতে মার্কিন খাদ্যশস্য সরবরাহের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে তা হবে যুক্তরাষ্ট্রে আরবদের তেল রপ্তানী

বন্ধ করে দেওয়ার এক নিস্ফল জবাব মাত্র। রিপোর্টে বলা হয়, আরবরা তাদের অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণ খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন বিশ্ববাজারের অন্যান্য উৎস থেকে মেটাতে পারে। অথচ অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র তার তুলনামূলকভাবে বিপুল পরিমাণ পেট্রোলের প্রয়োজন অন্যান্য উৎস থেকে আমদানী করে মেটাতে পারে না। চলতি বছর ছাড়া আরবরা আর কখনও তাদের মোট আমদানী করা খাদ্যের দশ শতাংশের বেশী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রয় করে নি।

জেনেভা শান্তি সম্মেলনে ঐক্যমত হওয়ার পরও আরব তেল নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকায় মিঃ কিসিংগার বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে মার্কিন প্রচেষ্টার প্রেক্ষিতে তেল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার না হলে, এতে মার্কিন কূটনৈতিক মনোভাবের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আরবদের তেল নিষোধাজ্ঞা অব্যাহত থাকলে ওয়াশিংটন এটাকে ব্লাকমেইল হিসাবে গণ্য করবে।

প্রেসিডেণ্ট নিকসনের আহ্বানে ওয়াশিংটনে বিশ্বের তেরটি শিল্পোন্নত বা প্রধান তেল ব্যবহারকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইতালি, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, হল্যাণ্ড, জাপান, কানাডা-র পররাষ্ট্রমন্ত্রিরা এক বৈঠকে মিলিত হন। মিঃ কিসিঙ্গার জ্বালানীর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা, তেল উৎপাদক আরব দেশ ও তেল আমদানীকাবক দেশগুলির সম্মেলন আয়োজনের জন্য একটি যোগাযোগ কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। ফ্রান্স বাদে আটটি য়ুরোপীয় দেশ প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাইকেল জোবার্ট বলেন, তেল সংকটের বিষয়টি রাষ্ট্রসংঘ পর্যায়ে আলোচনা হওয়া উচিত। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দেন, আরবদের বিরুদ্ধে কোন জোটের মধ্যে ফ্রান্স থাকবে না।

ওয়াশিংটন সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল মার্কিন সামরিক, অর্থনৈতিক এবং শিল্প ক্ষমতার অধীনে এক নতুন বিশ্ব রাজনৈতিক জোট গড়ে তোলা। যে কারণে সম্মেলনটি পরিণত হয় একটি রাজনৈতিক

সমাবেশে। যাই হোক না কেন, সম্মেলনে ঐক্যমত সম্ভব হয়নি। মার্কিন শাসানি অগ্রাহ্য করে, ফ্রান্স, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানী, ইতালি, জাপান—তেল সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা চালাতে থাকে। 'ক্ষুদে য়ুরোপে' মার্কিন প্রভুত্ব হ্রাস পেয়েছে।

বলা যায় নিকসনের এই সম্মেলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

তারই কয়েকদিন বাদেই নিকসন আরব দেশগুলিকে হুঁশিয়ার করে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ওপর তেল নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখা হলে মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতাও অনিবার্য-ভাবে মন্থর হয়ে যাবে।

ঠিক এই সময়েই, মিশর, সিরিয়া, সৌদি আরব, আলজেরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা একটি 'মিনি' শীর্ষ সম্মেলন থেকে ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে তেল সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকবে। তাছাড়া অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সমস্ত ইজরায়েলী সৈন্য প্রত্যাহার ও প্যালেস্টাইনীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাদের দাবী অপরিবর্তিত থাকবে।

ব্রিটিশ সরকার তেল সরবরাহে ঘাটতির জন্য আরবদের দায়ী না করে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলিকে অভিযুক্ত করেন। সরকারী সূত্রে বলা হয়, তেল কোম্পানিগুলি ব্রিটেনের তেল না পাঠিয়ে অন্য কোথাও তেল পাঠাচ্ছে। আরবরা ব্রিটেনকে বন্ধু দেশ হিসাবে স্বীকৃতি জানিয়ে তেল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু ব্রিটেনে সরবরাহ করা তেল সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠান হয়েছে। এমনকি ব্রিটিশ বন্দর অভিমুখী জাহাজকে অন্যত্র যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়। ফলে ব্রিটেনের শিল্প ও অর্থনীতিতে জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এমন কি ইরাণের শাহ অভিযোগ করেন, আরবদের বিধিনিষেধ সত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আগের থেকে বেশি তেল পায়। আরব রাষ্ট্র থেকে যে সব বন্ধু দেশে তেল পাঠান হয়, সমুদ্রপথে তাদের গতি

পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় না। বিভিন্ন তেল কোম্পানি চোরাই পথে যুক্তরাষ্ট্রকে তেল পাচার করে।

সৌদি আরবদের বাদশাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি বিকল্প সরকার গঠনের মার্কিন চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে গেছে। সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলের তেলসমৃদ্ধ অঞ্চলটি ইরানের শাহের তত্ত্বাবধানে মার্কিনীরা শাসন করবে। লোহিত সাগর তীরবর্তী হিজাজ অঞ্চলের শাসক হবেন বাদশাহ হোসেন। আর বাকি অংশ দেওয়া হবে সৌদি আরব রাজপবিবারের কোন বিক্ষুব্ধ যুবরাজকে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের তেল শিল্পখনি ও তেলশিল্প উদ্ধারের জন্য বিমানবাহী সৈন্য পাঠালেও, তা হটকারী ব্যাপার হত। কারণ ব্রিটেন ও ফ্রান্স অসহযোগিতা করত এবং সুয়েজ অভিযানের মত করুণ পরিণতিই ঘটত। সৌদি আরবের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলেও, সৌদি আরবের পরিস্থিতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকুল হত না। বরং সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়ে উঠত অনিবার্য।

আরব রাষ্ট্রগুলির তেল নিষেধাজ্ঞার অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধীরে তাদের জাতীয় সম্পদকে আত্মনিয়ন্ত্রনাধীনে নিয়ে আসা। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কুয়ায়েতের ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম এবং মার্কিন গালফ অয়েলের শেয়ার ক্রয়ের মধ্য দিয়ে। তাছাড়া লিবিয়া তিনটি মার্কিন কোম্পানি রাষ্ট্রায়ত্ত করে নিয়েছে। এখন' দেখা যাবে সৌদি আরব মার্কিন নিয়ন্ত্রিত আরামকো-র ক্ষেত্রে কি সিদ্ধান্ত নেয়।

তেল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিয়ে আবব রাষ্ট্রগুলির মত পার্থক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত দুমাসের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যাহার গৃহীত হয় ত্রিপোলিতে। মিশর ও সৌদি আরব ছিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিশালী সমর্থক।

আট ॥ শান্তির ফুল ফুটবে ?

যাওয়ার আগে ওরা লিখে রেখে গেল, 'আর যুদ্ধ নয়, এস আমরা পরস্পরকে ভালবাসি।'

ওদের পিছনে পড়ে থাকল ধ্বংসের স্তূপ। ঘরবাড়ী ধ্বসে পড়েছে কামানের গোলায়, বোমার আঘাতে। কায়রো সুয়েজ সড়ক, যা সুয়েজখালের সঙ্গে কায়রোর যোগাযোগের প্রধান পথ, তা সম্পূর্ণ যানবাহনের অনুপযোগী। রেলপথ ভেঙে চুরমার।

সুয়েজের পশ্চিম তীর ছাড়ার সময় ইজরায়েলী সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত-ভাবে মাইন ছড়িয়ে রেখে গেছে। ইজরায়েলীরা যে সব মাইন খুঁজে পায়নি, তারা তা উদ্ধার না করেই পূর্ব পাড়ে সরে যায়। এখানে ইজরায়েলীরা প্রায় সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইন বসায়। তাছাড়া কায়রো একশ এক কিলোমিটার থেকে পিছু হটার সময় এই এলাকায় মিশরীয়রা যেসব মাইন পুঁতে রাখে, তার মোকাবিলাও করতে হবে মিশরীয়দের। যে সব গোলা বিস্ফোরিত হয়নি সেগুলিও মরুভূমির চোরাবালিতে সুয়েজখালে পড়ে রয়েছে।

মাইন অনুসন্ধানকারী যন্ত্রের সাহায্যে ধাতু নির্মিত মাইন খুঁজে পেলেও, ধাতু নির্মিত নয় এমন মাইন খুঁজে পাওয়া হবে কঠিন।

সুয়েজখাল বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। আটকে আছে জাহাজ, নৌকো। মাটি জমে খাল যানবাহনের সম্পূর্ণ অনুপযোগী। যদি ঐ খাল খুলতে হয় তবে প্রয়োজন হবে কোটি কোটি ডলারের। তাছাড়া আধুনিক বৃহৎ ট্যাঙ্কারগুলির যাতায়াত উপযোগী করতে খালকে আরও বড় করতে হবে।

মিশর সরকার পরিকল্পনা অনুযায়ী ছয় মাস বাদেই খাল চালু করতে আগ্রহী। এক মিলিঅন জনসংখ্যা সমৃদ্ধ সুয়েজ শহরকে শিল্পনগরীর রূপ দেওয়া হবে। সুয়েজ শহরকে অপর পারের সঙ্গে

ভূগর্ভ পথে যুক্ত করা হবে। এরকম পরিকল্পনা আছে সৈয়দবন্দর ও ইসমাইলিয়াতে। বিধ্বস্ত মিশর পুনর্গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে কায়রো আসেন সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী আঁদ্রে গ্রোমিকো।

কিন্তু সুয়েজখাল কি খুলবে শেষ পর্যন্ত? ন্যাটো থেকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত নৌবাহিনীর উপস্থিতি সম্পর্কে। পেন্টাগণও ইতিমধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছে এ সম্পর্কে। খাল মুক্ত হলে মার্কিন জাহাজ কোম্পানিগুলির আয় কমে যাবে। ইজরায়েলী স্বার্থ ক্ষুন্ন হবে। একচেটিয়া তেল কোম্পানিগুলির অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের পথে আঘাত পড়বে।

এ অবস্থায় মধ্যপ্রাচ্য শান্তি দ্বারের অর্গল কে মুক্ত করবে? আর কেইবা হবে শান্তি প্রহরী?

আরব দুনিয়ার প্রভাবশালী সাংবাদিক মোহাম্মদ হাসনায়ের হেইকল বলেছেন 'শান্তি দূর। অনেক দূরে। শান্তির পথ অনেক দূর। এমন কি শান্তির পথের শুরুই বহুদূর!'

নিঃসন্দেহে বলা যায়, আঠারই জানুয়ারি মিশর ও ইজরায়েলের মধ্যে সাক্ষরিত চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী ঘটনা! প্রেসিডেণ্ট নিকসন এই চুক্তিকে মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাৎপর্যময় ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রিটেন বলেছে শান্তি স্থাপন উল্লেখযোগ্য সাফল্য। আর জাপানের মতে সহাবস্থান ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

শিল্পোন্নত এইসব দেশ এর বেশি আর কি বা বলতে পারে। তাদের স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে এর বেশী আর কিছু বলবার নেই। কারণ তেলের মারে ওদের কলকারখানা প্রায় বন্ধ। শ্রমিক অশান্তি ক্রম-বর্ধমান। অর্থনৈতিক দুর্দিন আগতপ্রায়। সুতরাং যে কোন রকম একটা শান্তি স্থাপনের ব্যবস্থা হলেই ওদের তেল পাওয়ার পথ সুরাহা হবে।

চুক্তি সাক্ষরের পর যে আরব রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে সমস্যা তারা কিন্তু

মুখ বন্ধ করে। মিশরের প্রেসিডেণ্ট সাদাত যুগান্তকারী ঘটনা বললেও, সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট আসাদ বলেন, 'এই চুক্তির বিরোধী নই। আবার একে সমর্থন করবার মত কিছু নেই।' মার্কিন তাঁবেদার জর্ডান স্বাগত জানালেও, পিএলও এই চুক্তিকে সমর্থন জানাতে পারে নি।

যুদ্ধের প্রথম থেকেই আরব ঐক্যে একটা ভাঙনের সুর বাজছিল ক্ষীণ সুরে। লিবিয়া মিশরের যুদ্ধ ঘোষণাকে সমর্থন জানালেও, তার রণনীতির সমালোচনা করে। মার্কিন-সোভিয়েত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব লিবিয়া, ইরাক সিরিয়া মেনে নেয়নি। অনেক আরব রাষ্ট্রই এই হঠাৎ যুদ্ধ বিরতিতে বিস্মিত হয়। মিশর যুদ্ধবিরতি মানলেও বাইশ অক্টোবর যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণের পর ইজরায়েল সুয়েজ খালের পশ্চিম পাড় দখল করে এবং তৃতীয় বাহিনীকে অবরুদ্ধ করে। নভেম্বরে আলজেরিয়ার শীর্ষ সম্মেলনে লিবিয়া ও সিরিয়া যোগ দেয় নি। জেনেভা সম্মেলনের ফলশ্রুতি সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলি আদৌ আশাবাদী ছিল না।

আঠারই জানুয়ারিব চুক্তির পিছনে ইজরায়েলেব রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল—তা জানার প্রয়োজন রয়েছে।

ইজরায়েলের ক্রমপ্রসারমাণ অর্থনীতির জন্য জনবল দরকার। তাদের কলকারখানায় আরবরা কাজ করলে তাদেরই স্বার্থরক্ষা পাবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, যত বিরাট আরব এলাকা তাদের দখলে আসুক না কেন, তাতে ইজরায়েলে শান্তি ও নিরাপত্তা আরও দূরে সরে যাচ্ছে। ইহুদিদের ওপর আরবদের ঘৃণা বিদ্বেষ বাড়ছে। শত্রুতা প্রবল হয়ে উঠছে। আভ্যন্তরীণ দলাদলি প্রচণ্ড-রূপ নিচ্ছে। সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা অবসর নিয়েই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। কাদা ছোড়াছুড়ি করছেন নিজেরাই। নিজের গা বাঁচাবার জন্য আপাতত কিছুকাল শান্তির দরকার।

আমেরিকা বেকায়দায় পড়ে মধ্যপ্রাচ্যে দুধারি অস্ত্র প্রয়োগ করে। বল প্রয়োগের হুমকির সঙ্গে সঙ্গে মিশরকে তেলের পাইপ লাইন করে দেওয়ার টোপ ফেলে। অর্থাৎ সমগ্র আরব জগত থেকে সামরিক শক্তি ও শিল্পোন্নত মিশরকে বিচ্ছিন্ন করা।

মার্কিন অস্ত্রে ইজরায়েলের আত্মরক্ষা যে অসম্ভব তা জানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আরব দেশগুলির অভ্যন্তরে বিভেদ সৃষ্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালায়। সাম্রাজ্যবাদীরা একচেটিয়া পুঁজি বিরোধী তেল ফ্রন্টে ভাঙন ধরিয়ে ইজরায়েলী আগ্রাসনের পথকে সুগম করার সুযোগ খোঁজে।

জর্ডান ও ইজরায়েলকে ব্যবহার করেছে আগের মতই আরব দুনিয়াকে বিভক্ত করতে। প্যালেস্টাইনীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারকে চাপ দেওয়ার প্রয়াস চালায়।

মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েল আমেরিকার তৈল স্বার্থের পাহারাদার। তার ভূমিকাকে আমেরিকা কখনই দুর্বল হতে দেবে না। ইজরায়েল ও জর্ডানের মাঝখানে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র হলে। ইজরায়েল জর্ডান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরই গুরুতর অসুবিধা হবে।

আবার প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে মিশর ও সৌদি আরবেরই সুবিধা। কারণ ইজরায়েলের ভবিষ্যৎ আগ্রাসনের আঘাত পড়বে এই নবগঠিত রাষ্ট্রের ওপর। সৌদি আরব বদশাহ হোসেনকে পছন্দ করে না। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলে বাদশাহ হোসেনের ক্ষমতা খর্ব হবে।

আরবরা য়ুরোপ ও আমেরিকার মধ্যে বিরোধিতার সৃষ্টি করেছে। ফ্রান্সকে সুবিধা দেওয়ায় আমেরিকা ক্ষুব্ধ। য়ুরোপীয় সাধারণ বাজার এবং আটলান্টিক জোট আজ সংকটের মুখোমুখী।

মিশর, সৌদি আরব, সিরিয়া, কুয়ায়েতে সামরিক অভ্যুত্থান ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালাবার চেষ্টা করে বিভিন্ন মাধ্যমে।

বেশীর ভাগ আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গিয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ইজরায়েলকে সমর্থন করে যাবে। কারণ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর দপ্তর ও শিল্পপতিদের জোটে ইহুদি পুঁজির ভূমিকা বিরাট। তাছাড়া মার্কিন সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন নিয়ন্ত্রিণ করে ইহুদি পুঁজি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তা ও সমর্থনপুষ্ট আরব দেশগুলির সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য ব্যতীত সৈন্যাপসারণ চুক্তি সম্পাদন অসম্ভব ছিল।

মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে মার্কিন নীতির কোন পরিবর্তন হয়নি। আভ্যন্তরীণ সংকট মোকাবিলা, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারী থেকে আত্মরক্ষার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে কোনরকম শান্তি চাপাবার চেষ্টা করেছে মাত্র।

যতদিন ইজরায়েল আরব ভূখণ্ড দখল করে থাকবে, ততদিন সংঘর্ষ ঘটবেই। ফলে, মধ্যপ্রাচ্যে ঘটবে ব্যাপক ধ্বংসলীলা। কোন চুক্তিই শান্তি আনতে পারবেন না, যদি না ইজরায়েল বাহিনী আরব ভূখণ্ড থেকে প্রত্যাহার করা হয় এবং প্যালেস্টাইন আরবদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃতির জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অকটোবরের যুদ্ধের পর যেসব চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তার মধ্যে কোথাও প্রধান সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত নেই। এমনকি সৈন্যা-পসারণের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের সার্বিক পদ্ধতির কোন ইঙ্গিতও নেই। সিরিয়ার ভূখণ্ড দখলে রেখে মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। অথচ গোলান উপত্যকার ইহুদি উপনিবেশকারীদের সামনে প্রধানমন্ত্রী মেয়ার বলেন, গোলান অঞ্চল ইজরায়েলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এই চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ইজরায়েল মনে করতে পারে সে পরোক্ষভাবে আরব স্বীকৃতি পেয়েছে। সে এবার সীমান্ত নিরাপদ রাখার গ্যারান্টি দাবী করতে পারে। গোল্ডামেয়ার এবং মোশে

দায়ান দুজনই সুয়েজ খাল খুলে দেওয়া এবং ইজরায়েলী জাহাজ চলাচলের কথা বলেছেন।

তেলের আঘাতে আহত ইজরায়েলের মদতদানকারী দেশগুলির পক্ষ থেকেও একটি চাপ এসেছিল। তা না হলে যুদ্ধবাজ ইজরায়েল হাত থেকে অস্ত্র নামিয়ে টেবিলে বসত না শান্তির জন্য। আপাত অবশ্য তাই দেখা গেছে। তা না করলে পশ্চিমী দেশগুলির সমর্থন হারাত ইজরায়েল।

সুয়েজ খালের পশ্চিম পাড়ে ইজরায়েলের সরবরাহ লাইন খুব বেশী শক্তিশালী ছিল না। মিশরীয় বাহিনীর পুনরাক্রমণ তা ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল।

ইজরায়েলের স্বার্থ রক্ষায় মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কূটনীতির যাদুকর (?) কিসিঙ্গার যখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে শান্তি মিশন নিয়ে ছুটাছুটি করছিলেন, তখন মিশরের ব্যক্তিত্বশালী রাজনৈতিক ভাষ্যকর মোহাম্মদ হাসনায়েন হেইকল আল আহরামে এক নিবন্ধে আশংকা প্রকাশ করেন যে, মধ্যপ্রাচ্য সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা এই অঞ্চলের স্থায়ী ও সন্তোষজনক সমাধানের উপযোগী নয়। এটা যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িক খেলা। মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে কোন অগ্রগতি হলে, তা হবে একটা মার্কিন সমাধান, যা হবে ইজরায়েলী সমাধানের নামান্তর।

প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের চারদফা, নিরাপত্তা পরিষদের রুশ মার্কিন প্রস্তাব, ডাঃ কিসিঙ্গারের ছয় দফা, সৈন্যাপসারণ চুক্তি কোথাও প্যালেস্টাইন সমস্যার উল্লেখ নেই। অথচ ইজরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্যালেস্টাইন সমস্যাকে কেন্দ্র করেই চারবার যুদ্ধ হল। সে কারণে প্যালেস্টাইনীরা যুদ্ধবিরতি অস্বীকার করেছে। তারা পিতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্প ঘোষণা করেছে। প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধান ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আসতে পারে না।

ইজরায়েল ছেড়ে দিতে পারে এমন অধিকৃত আরব ভূখণ্ডে প্যালেস্টাইনী জাতীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে প্যালেস্টাইনী জাতীয়তাবাদীদের তিনটি নেতৃস্থানীয় গ্রুপ একমত হয়। এ পর্যন্ত কয়েকজন প্যালেস্টাইনী নেতা আপত্তি তুলেছিলেন যে ইজরায়েল ও জর্ডানের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র রাষ্ট্র গঠন করলে ইজরায়েলের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হবে। আলফাতাহ, পপুলার ফ্রন্ট ফর দি লিবারেশন অফ প্যালেস্টাইন এবং সিরিয়া প্রভাবিত আল সাইকা এ ব্যাপারে এক অভিন্ন পরিকল্পনায় ঐক্যমত হয়েছেন।

প্যালেস্টাইনীরাই মধ্যপ্রাচ্যে সব থেকে বেশি হারিয়েছে। কোন আপোষ নিষ্পত্তি মানেই হল পরাজয়কে মেনে নেওয়া। খুব বেশী পেলেও ১৯৫৮ খৃ: আগেকার প্যালেস্টাইনের মাত্র এক পঞ্চ-মাংশেই তারা সার্বভৌমত্ব ফিরে পেতে পারে।

পি এল ও নেতারা অনিচ্ছাসত্বেও এই রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে মেনে নিয়েছেন, প্রয়োজনের তাগিদে। নায়েম হাওয়াতমেহ বলেছেন যে, এই এলাকাগুলি যাতে হারাতে না হয়, সেইজন্যই প্যালেস্টাইনী রাষ্ট্রগঠনের বর্তমানে প্রস্তাবটি আমাদের মেনে নেওয়া উচিত। পি এল ও নেতাদের রাষ্ট্রগঠনের স্বীকৃতির অন্তরালে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দিক রয়েছে। ছোট ভূখণ্ড হলেও, সাবভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির গুরুত্ব রয়েছে। তা অবশ্যই প্যালেস্টাইনীদের দীর্ঘ সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে সহায়ক হবে। অবশ্য তারা প্রকাশ্যে কিছুকাল দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কথা বলবেন না।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে যেসব প্যালেস্টাইন উদ্বাস্তু অসহায় জীবনযাপন করছে—তাদের একমাত্র স্বপ্ন হল নিজেদের ভিটেমাটি ফিরে পাবে। তাদের কাছে জটিল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের

দাম নেই। তাই প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা ও জনগণ বিরাট দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও বিভ্রান্তির সম্মুখীন :

আজ আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ হওয়াই সব থেকে বেশী দরকার।

আরব ঐক্যের ভাঙন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামকে দুর্বল করার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুহৃদ রয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলির সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভিন্নতার দরুণ, পরস্পরের মধ্যে মতভেদকে ভুলে থাকা কর্তব্য ; ইজরায়েলী আগ্রাসনের ফলাফল দূরীকরণ এবং প্যালেস্টাইন আরবদের ন্যায্য অধিকারের জন্য সংগ্রামে অংশীদার হওয়া। কাবণ প্যালেস্টাইন আরবরা হল আরব জাতি গোষ্ঠিরই অংশ। এই অভিন্ন লক্ষ্য থেকে আরব রাষ্ট্রগুলিকে সরিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী আবেগের উন্মেষ ঘটাতে মধ্যপ্রাচ্যে চলেছে অন্তহীন সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত। আরব রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিবাদে লাভবান হয় ইজরায়েলী আগ্রাসীরা এবং মাকিন নয়া-উপনিবেশবাদ। আর এই বিবাদে আরব ঐক্যে ঘূণ ধরে।

প্যালেস্টাইনীদের পিতৃভূমি এবং জেরুজালেম যে ইজরায়েল আলোচনার মধ্য দিয়ে ফিরিয়ে দেবে, এমন আশা দুরাশামাত্র। এই চুক্তি যে, বাইশ অকটোবর বা অতীতে নিরাপত্তা পরিষদ গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি ইজরায়েলী অবজ্ঞার মতই হবে না, এমন কথা কে বলতে পারে! তাছাড়া সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট পরিষ্কার বলেছেন ইজরায়েল রাষ্ট্রের বৈধতা তারা অস্বীকার করেন। সিরিয়া ইজরায়েল সীমান্তে এখনও তীব্র সংঘর্ষ চলছে।

আরব রাষ্ট্রগুলি যখন ঐক্যবদ্ধ হবে, তখন প্যালেস্টাইন মুক্তি সংগঠনগুলিকে নিতে হবে ঐক্যবদ্ধ কর্মপন্থা। প্যালেস্টাইন আজ পরিণত হয়েছে বৃহৎশক্তিতে। প্যালেস্টাইন মুক্তিসংস্থাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে বিশ্বের একশত আটটি রাষ্ট্র। প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গঠিত হলেই স্বীকৃতি জানাবে বিরাশিটি দেশ।

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সমূহে প্যালেস্টাইন আরব জনগণের বৈধ অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও ইজরায়েল এবং আরব প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তা কার্যকরী হতে দেবে না।

মধ্যপ্রাচ্য জটিল সমস্যার সমাধান শান্তির পথে হোক এ কামনা সকলেরই। কিন্তু যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্রে এবং স্বার্থে, যার জন্য তেলআভিভকে কোটি কোটি টাকার মারণাস্ত্রে সাজান হয়েছে বছরের পর বছর ধরে, যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের শব দেহের ওপর, সোনালী ফসলের ক্ষেতের ওপর গড়ে উঠেছে তেল ব্যবসায়ীদের দুর্গ—সেখানে শান্তি আসা কি সহজ! অন্ততপক্ষে যুদ্ধ জীইয়ে রাখা যেখানে স্বার্থের অনুকূল, সেখানে মানববিদ্বেষী যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে যুদ্ধ দিয়েই।

সুতরাং শান্তি পথ অনেক দূর।